মোজাফ্‌ফরনামা

নবাব আলিবর্দি খান থেকে

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

করম আলি খান

ফারসি থেকে অনুবাদ

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া





মোজাফ্‌ফরনামা

মোজাফ্ফরনামা

নবাব আলিবর্দি খান থেকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

করম আলি খান

ও

আজাদ-আল-হোসায়নির 'নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি'

ফারসি থেকে অনুবাদ, সম্পাদনা ও টীকা

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া



[কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ও স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত 'বেঙ্গল নওয়াবস' থেকে]

প্রথমা প্রকাশন

প্রথমা প্রকাশন

মোজাফ্‌ফরনামা : নবাব আলিবর্দি খান থেকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

দ্বিতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, মে ২০১৭
প্রথম (পরিমার্জিত) প্রথমা সংস্করণ : আশ্বিন ১৪২২, অক্টোবর ২০১৫
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদের নামলিপি : কাইয়ুম চৌধুরী
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অশোক কর্মকার
[প্রচ্ছদ পরিচিতি : নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (বাঁয়ে) ও নবাব আলিবর্দি খান]
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০
প্রথম প্রকাশ : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Muzaffarnama
by Karam Ali Khan
Translated from the original Farsi and edited by
Abul Kalam Muhammad Zakariah.
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180078-81
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 350 only

ISBN 978 984 90254 8 1

প্রথমা সংস্করণের ভূমিকা

করম আলি খানের *মোজাফ্ফরনামা* ও আজাদ-আল-হোসায়নির *নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি* দুটো রচনা একই মলাটে বেরিয়েছিল বাংলা একাডেমি থেকে। বইটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। এখন এর একটি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করছে প্রথমা প্রকাশন।

আজাদ-আল-হোসায়নির *নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি* রচনাটি অতি ক্ষুদ্র কলেবরের। একটি বই হওয়ার মতো নয়। বাংলা একাডেমি সংস্করণে এটি গ্রন্থের শেষে যুক্ত ছিল। প্রথমা সংস্করণের শেষেও রচনাটি রইল। কিন্তু বইয়ের প্রচ্ছদে থাকল শুধুই *মোজাফ্ফরনামা*।

বইটিতে একই নামের একাধিক বানান ছাপা হয়েছিল। কিছু অসংগতিও ছিল। তা সংশোধন করার চেষ্টা করা হলো এই সংস্করণে। ভাষায় কিছু সম্পাদনা ও বানানে সমতা বিধানেরও চেষ্টা করা হয়েছে।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

মাশফিক স্মৃতি
১৬ লেক সার্কাস, উত্তর ধানমন্ডি
কলাবাগান, ঢাকা ১২০৫

সূচিপত্র

সংকেত তালিকা

তারিখ-ফা — ইউসুফ আলি খান রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গি* গ্রন্থের মূল ফারসি পাঠ। সম্পাদক: ড. আবদুস সোবহান, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

তারিখ-ই — ইউসুফ আলি খান রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গি* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ড. আবদুস সোবহান। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

তারিখ-ই-বঙ্গালা — মুনশি সলিমউল্লাহ্ রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালার* মূল ফারসি পাঠ। সম্পাদক: ড. সৈয়দ ইমাম-উদ-দীন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মোজাফ্ফর — ফারসি ভাষায় করম আলি খান রচিত *মোজাফ্ফরনামা*। স্যার যদুনাথ সরকার অনূদিত (ইংরেজিতে) ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত *বেঙ্গল নওয়াবস* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

য. না. — ফারসি ভাষায় ইউসুফ আলি খান রচিত *আহওয়াল-ই-মহাবত জঙ্গি*, ফারসি ভাষায় করম আলি খান রচিত *মোজাফ্ফরনামা* ও আজাদ-আল-হোসায়নি রচিত *নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি* গ্রন্থত্রয়। স্যার যদুনাথ সরকার অনূদিত (ইংরেজি) ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত *বেঙ্গল নওয়াবস* গ্রন্থ।

রিয়াজ-ই — ফারসি ভাষায় গোলাম হোসেন সলিম রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন আবদুস সালাম।

রিয়াজ-বা — ফারসি ভাষায় গোলাম হোসেন সলিম রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন আকবর উদ্দীন (বাংলার ইতিহাস), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিয়ার-ফা — ফারসি ভাষায় সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি রচিত

	সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন (১৭৮০)। সম্পাদক : হাকিম আবদুল মজিদ (১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।
সিয়ার-ই	ফারসি ভাষায় সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি রচিত *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মঁসিয় রেমোঁ, হাজি মোস্তফা ছদ্মনামে, ১৭৮৯।
সিয়ার-বা	ফারসি ভাষায় সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি রচিত *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ড. আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
এইচ. বি. দ্বিতীয় খণ্ড	*হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভলিউম টু*। সম্পাদক : স্যার যদুনাথ সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মোজাফ্‌ফরনামা

করম আলি খান

অনুবাদকের ভূমিকা

গ্রন্থকার করম আলি খানের জীবনী

করম আলি খানের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর নিজের সম্পর্কে দেওয়া বর্ণনা ছাড়া অন্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বিক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে গ্রন্থকার ও তাঁর পরিবার সম্বন্ধে জানা যায় যে, আলিবর্দি খান যখন নবাব সুজা-উদ-দীনের অধীনে পাটনায় তাঁর নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর পিতা ও মাতা দিল্লি থেকে ১৭৩৪-৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পাটনায় আসেন। সেখান থেকেই তাঁরা মুর্শিদাবাদে যান। আলিবর্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহমদ ছিলেন তখন নবাব সুজা-উদ-দীনের তিন উপদেষ্টার একজন। তাঁরই অনুরোধে নবাব সুজা খান এ গ্রন্থের লেখক করম আলি খানের পিতাকে মাসিক দুই শ টাকা নগদ বেতনে বর্ধমান চাকলার সংবাদলিপিকরের চাকরি দেন। ইংরেজ কোম্পানি বাঙলার তদানীন্তন নায়েব-ই-নাজিম ও দিওয়ান সৈয়দ রেজা খানকে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে চাকরিচ্যুত করার আগ পর্যন্ত করম আলি খানের পিতা এই চাকরিতে বহাল ছিলেন। এ ছাড়া তিনি নবাব আলিবর্দির অধীনে করেছিলেন আরও কয়েকটি খণ্ডকালীন অথচ উল্লেখযোগ্য চাকরি। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রথম উড়িষ্যা অভিযানের আগে আলিবর্দি তাঁর অশ্বগুলোকে চিহ্নিত বা গণনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন তাঁকে। পরবর্তীকালে আলিবর্দি তাঁকে আরও অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল নবাবের নবনিযুক্ত ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত বাহিনী পরিদর্শন (review) করা এবং তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে নবাবকে অবহিত করা (য. না., পৃ. ৪৬)। বস্তুত আলোচ্য পুস্তকের অনেক জায়গায় গ্রন্থকারের পিতার কথা থাকলেও কোথাও তাঁর নামের উল্লেখ নেই। অন্য কোনো সূত্র থেকেও তাঁর নাম জানা যায়নি।

দিল্লি থেকে পাটনা হয়ে মুর্শিদাবাদে আগমনের পর গ্রন্থকারের পিতা ও মাতা মুর্শিদাবাদেই বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর আলিবর্দি খানের বাসভবনে গ্রন্থকারের জন্ম হয়। স্বয়ং নবাব সুজা-উদ-দীন খান নবজাতকের নাম রাখেন করম আলি খান।

১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যা অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আলিবর্দি খান তাঁর মাতার দিক থেকে নিকট বা দূরসম্পর্কীয় যত আত্মীয় ছিলেন, তাঁদের সবাইকে যথোপযুক্ত মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন (য. না., পৃ. ২৬)। গ্রন্থকার তখন পাঁচ বছরের বালক মাত্র। তাঁকেও মাসিক ৫০ টাকা হারে ভাতা দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়, তা তিনি ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈয়দ রেজা খানকে বরখাস্ত করার সময় পর্যন্ত) ভোগ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একই সঙ্গে মির মোহাম্মদ জাফর খানের পুত্র সাদাকত মোহাম্মদ খান (মিরন) এবং গোলাম হোসেন আরজ বেগির দুই পুত্র খোরম আলি ও সাদেক আলিকেও যথোপযুক্ত মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তবে পরের তিনজনকে মাসিক কত টাকা করে ভাতা দেওয়া হতো, তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আলিবর্দির উদ্যোগে গ্রন্থকারের পিতা-মাতাকে দিল্লি থেকে আনয়ন, মুর্শিদাবাদে আলিবর্দি খানের গৃহে তাঁদের অবস্থান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহমদের অনুরোধে গ্রন্থকারের পিতাকে নবাবের চাকরি প্রদান, আলিবর্দি খানের বাসভবনে গ্রন্থকারের জন্ম এবং স্বয়ং নবাব তাঁর নাম রাখার মতো ঘটনা ইত্যাদি দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, গ্রন্থকারের মাতা বা পিতা ছিলেন আলিবর্দি খানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তবে সামাজিক মর্যাদা বিচারে তাঁরা যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা তেমন একটা ছিল বলে ধারণা করা যায় না।

১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১২ বছর বয়সে গ্রন্থকারকে নবাব আলিবর্দি ঘোড়াঘাটের ফৌজদার পদে নিয়োগ দেন। চাকরিস্থলে মাঝেমধ্যে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলেও ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই পদে তিনি বহাল থাকেন। আলিবর্দির জীবনের একেবারে শেষ দিকে (খুব সম্ভব ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে। গ্রন্থকারের বয়স তখনো ২০ বছর পূর্ণ হয়নি) গ্রন্থকারের জীবনে যে ঘটনা ঘটে, তা ছিল খুবই চমকপ্রদ। তিনি তখনো ঘোড়াঘাটের ফৌজদার। কিন্তু নবাব আলিবর্দির অনুমতি না নিয়েই তিনি পূর্ণিয়ায় চলে যান এবং সেখানকার ফৌজদার নবাবের জামাতা সৈয়দ আহমদ সওলত জঙের অধীনে রাঙামাটির শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করেন।

এ ঘটনার বিবরণ আলিবর্দির কাছে সরকারিভাবে পেশ করে করম আলি খানকে ঘোড়াঘাটের ফৌজদারের পদ থেকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

আলিবর্দি তাতে বাধা দিয়ে বলেন, 'আমি জানি, সওলত জঙের সঙ্গে তার বনিবনা হবে না। অনতিবিলম্বেই সে আমার কাছে ফিরে আসবে। তবু তার জীবিকা নির্বাহের উপায়ের কথা আমি চিন্তা না করে পারি না। অতএব [মাত্র] কিছুদিনের জন্য তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা সংগত হবে না। কারণ, আমার চরিত্রের অকপটতার ওপর সে নির্ভর করে থাকবে (পরিচ্ছেদ ১৪)।'

গ্রন্থকার সম্পর্কে এরপর উল্লেখ দেখা যায় ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পূর্ণিয়া দখল-পরবর্তী কাল থেকে।

তখনো তিনি পূর্ণিয়াতেই ছিলেন। খুব সম্ভব চাকরিরত ছিলেন শওকত জঙের অধীনেই। ঘোড়াঘাটের ফৌজদারির পদে তখনো তিনি বহাল। সে সময় অন্যান্যের সঙ্গে সিরাজ তাঁকেও বন্দী করেন। মোট উনিশ দিন কারাগারে ছিলেন তিনি। খুব সম্ভব গ্রন্থকারের মাতার প্রভাবে নবাবের মাতা ও কন্যার সুপারিশে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁকে মুক্তি দেন। সে সময়ের ঘটনা সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, 'ভ্রমণের জন্য রাজা মোহনলালের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যেমন—নৌকা ইত্যাদি নিয়ে আমি নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদে যাত্রা করি। সিরাজের ভয়ে আমি কিছুদিন অবস্থান করি রাজমহলে। "হরকরারা" আবার আমার কাছে আসে, আমাকে তারা আমার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং আমার পিতার কাছ থেকে নিয়ে যায় একটি "রসিদ"। এই অপরাধে ঘোড়াঘাটের ফৌজদারির পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সে জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হয় নবাবের নিজস্ব দিওয়ানখানার দারোগা রওশন আলি খানকে (য. না., পৃ. ৭০)।' গ্রন্থকারের পদচ্যুতির কারণ খুব পরিষ্কার নয়। এরপর তিনি পাটনাতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে এখনো (১৯৫২ খ্রি.) তাঁর বংশধরেরা আছেন বলে স্যার যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন (য. না., পৃ. ১০)।

এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল খুব সম্ভব ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন বাঙলার নায়েব নাজিম ও দিওয়ান সৈয়দ রেজা খান মোফাফ্ফর জঙের পদচ্যুতির পরের বছর। গ্রন্থকারের পিতা তখন জীবিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। কারণ, গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই তাঁর পিতাকে প্রয়াত হিসেবেই দেখানো হয়েছে। এ থেকেই মনে হয়, খুব সম্ভব ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের পর এবং ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের আগে কোনো এক সময় তাঁর পিতা মারা গিয়েছিলেন।

গ্রন্থকার ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের পর আর কত দিন বেঁচে ছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বছর। ফলে তাঁর মৃত্যুকে অকালমৃত্যুই বলা যায়।

এটি ছাড়া তিনি আর কোনো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কি না, সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাঙলায় নবাবি আমলের ইতিহাস

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার (মৃত্যু ১৭৫৭ খ্রি.) রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কে সাধারণত বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নবাবি আমল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ সময় নবাব মুর্শিদ কুলি খান নামে অধিক পরিচিত নবাব জাফর খান (১৭০৩-১৫ খ্রি. পর্যন্ত দিওয়ান এবং ১৭১৭-২৭ খ্রি. পর্যন্ত সুবাদার), তাঁর জামাতা নবাব সুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান (১৭২৭-৩৯ খ্রি.), তাঁর পুত্র নবাব আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০ খ্রি.), নবাব আলিবর্দি খান মহাবত জং (১৭৪০-৫৬ খ্রি.) ও তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রি.)—এই পাঁচজন সুবাদার বাঙলায় রাজত্ব করেন। সরকারিভাবে তাঁরা দিল্লির তদানীন্তন দুর্বল মোগল সম্রাটদের অধীন হলেও ছিলেন অনেকটা স্বাধীন নৃপতির মতোই।

এ সময়ের প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন মুর্শিদ কুলি খান, যিনি অধিক পরিচিত নবাব জাফর খান নামে। তাঁর অতি দক্ষ প্রশাসনের কারণে অভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ন ছিল। মারাঠাসহ বাইরের অন্য কোনো শক্তি এ সময় এখানে কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। নবাবের জামাতা নবাব সুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খাঁ ওরফে সুজা-উদ-দৌলা ও তাঁর পুত্র নবাব আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খানের রাজত্বকালেও দেশে শান্তি ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও শান্তিপ্রিয় মানুষ।

সে সময় আলিবর্দি খান নামে বেশি পরিচিত মির্জা মোহাম্মদ আলি ছিলেন বিহার প্রদেশের নায়েব সুবাদার। তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করেছিলেন নবাব সুজা-উদ-দীন। তিনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি মোহাম্মদসহ তাঁদের পুরো পরিবার নবাব সুজা খানের অনুগ্রহে লালিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিদানে তাঁরা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে সরল প্রকৃতির নবাব সরফরাজ খানকে হত্যা করে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং নিহত নবাবের পরিবারের সদস্যদের স্থানান্তরিত করেন ঢাকায়। পরের বছরই সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধিকারী আলিবর্দি খান সুজা-উদ-দীন খানের জামাতা ও উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান রুস্তম জংকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করে সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ অধিকার করে নেন এবং নিজের জামাতা ও দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদ খানকে সেখানকার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক হলেও নবাব আলিবর্দি খান শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বার্ষিক ১২ লাখ টাকা প্রদানের বিনিময়ে শুধু উড়িষ্যা প্রদেশ নয়, তাঁর অধীন বাঙলা ও বিহার রাজ্যও মারাঠাদের আক্রমণের হাত

প্রদেশ নয়, তাঁর অধীন বাঙলা ও বিহার রাজ্যও মারাঠাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন। এর পেছনে কারণ ছিল এই যে, ১৭৪১-৪২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে উড়িষ্যা অধিকারের পরপরই দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের অধিপতি নিজাম-উল-মুলকের প্ররোচনায় মারাঠারা 'চৌথ' আদায়ের দাবিতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে আক্রমণ চালায়। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমগ্র অঞ্চলে তারা ক্রমাগত লুটতরাজ চালায় ও মানুষের বাড়িঘরে নির্বিচারে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। বর্গি নামে পরিচিত এই মারাঠা দস্যুরা প্রায় ১২ বছর ধরে পঙ্গপালের মতো লাখে লাখে উল্লিখিত রাজ্যগুলোতে এসে অকথ্য অত্যাচার, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। বিশ্বাসঘাতকতা করে ও প্রভুকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করা, নিজের বংশধরদের উত্তরাধিকার নিষ্কণ্টক করার জন্য অনেক জঘন্য অপরাধ করলেও নবাব আলিবর্দি খান ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক। ফলে মারাঠা দস্যুদের প্রতিহত করার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। অবশেষে প্রায় ১২ বছর পর রণক্লান্ত উভয় পক্ষ শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এরই পরিণতিতে আলিবর্দিকে ছেড়ে দিতে হয় উড়িষ্যা প্রদেশ, সেই সঙ্গে বার্ষিক ১২ লাখ টাকা প্রদানের চুক্তিতেও সম্মত ও আবদ্ধ হতে হয়।

খুবই দক্ষতার সঙ্গে মারাঠাদের প্রতিহত করতে সমর্থ হলেও প্রাচীন কাহিনির একচক্ষু হরিণের মতো তাদের চেয়েও অধিক গুরুতর বিপদের দিকে তিনি দৃষ্টি দেননি। সে বিপদ ছিল ইউরোপীয় তথা ইংরেজ বণিকদের ভারত উপমহাদেশে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে তাদের ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় ও সেখানে ঘাঁটি নির্মাণ করার ঘটনা। আলিবর্দি মারাঠাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে বাঙলাকে বর্গিদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং সম্ভাব্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করে তাঁর বংশের রাজত্বকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয়ের প্রতি তিনি কোনো নজরই দেননি। তার ওপর তিনি নিজে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতা অধিকারের লক্ষ্যে বিশ্বাসঘাতকতার যে বীজ রোপণ করেছিলেন, তার প্রচুর প্রভাব পড়েছিল তাঁর আমলাদের ওপরও। ফলে আলিবর্দির মৃত্যুর পরপরই তাঁর দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা প্রধানত তাঁর কর্মকর্তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শুধু নিজের রাজ্য ও প্রাণই হারাননি, সেই সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশকেও অধিকার করে নেয় প্রায় দুই শ বছরের জন্য।

নবাবি আমলের ইতিহাস এক বিরাট ভাঙাগড়ার ইতিহাস। এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বাঙলা তথা সমগ্র উপমহাদেশের স্বাধীনতা হারানোর মতো চরম গ্লানিকর অবস্থায় পতিত হওয়া এবং প্রায় দুই শ বছরের জন্য সমগ্র দেশবাসীর ইংরেজদের পদানত হওয়ার ভেতর দিয়ে।

বাঙলার নবাবি আমলের ইতিহাস নিয়ে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে এই শতাব্দীর শেষার্ধে ফারসি ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ১. *নও বাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি*—আজাদ-আল-হোসায়নি (বর্তমান গ্রন্থ), ২. *তারিখ-ই-বঙ্গালা*—মুনশি সলিমউল্লাহ্, ৩. *আহওয়াল-ই-জং* বা *তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গি*—ইউসুফ আলি খান, ৪. *মোজাফ্‌ফরনামা*—করম আলি খান (বর্তমান গ্রন্থ), ৫. *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন*—সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি ও ৬. *রিয়াজ-উস-সালাতিন*—গোলাম হোসেন সলিম। গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি: নবাব সুজা-উদ-দীনের রাজত্বকালে তাঁর জামাতা ও ঢাকার নায়েব নাজিম লুৎফ উল্লাহ [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খান রুস্তম জঙের সময় ইরান থেকে আসা আজাদ-আল-হোসায়নি নামের একজন দুস্থ অথচ প্রতিভাবান পণ্ডিত খুব সম্ভব ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থ রচনা করেন। মাত্র নয় পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বাঙলার ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিক বর্ণনা নেই। তবে নবাব মির জুমলা, শাহজাদা আজম ও নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের সময়ের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে, এতে ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যে মোগল অভিযান সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায়, এর আগে যা অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

২. তারিখ-ই-বঙ্গালা: এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ। গ্রন্থকার মুনশি সলিমউল্লাহ্ প্রথমে ১৭৫৭-৬০ খ্রিষ্টাব্দ, পরে ১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া নিযুক্ত বাঙলার নবাব মির জাফর খানের একান্ত সচিব ছিলেন। এর আগে, অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটার্ট (Henry Vansitart) তহাওয়ার জঙেরও একান্ত সচিব ছিলেন। মহাপণ্ডিত ও গবেষক এই গভর্নরের অনুরোধ ও অনুপ্রেরণাতেই মুনশি সলিমউল্লাহ্ এই গ্রন্থ রচনা করেন। এতে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ইতিহাসের যে বর্ণনা আছে, তা মোটামুটিভাবে বাস্তব ও নিরপেক্ষ।

৩. তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙি: নবাব সরফরাজ খানের জামাতা ইউসুফ আলি খান ছিলেন আলিবর্দি খানের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি গোলাম আলি খানের পুত্র। নবাব সরফরাজ খানের মৃত্যুর পর গ্রন্থকারকে আলিবর্দি খানের দরবারের একজন সদস্য হিসেবে দেখা যায়। ১৭৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত অসমাপ্ত এ গ্রন্থে নবাব আলিবর্দি খানের জীবনের অনেক কিছু স্থান পেলেও তাঁর মৃত্যু এবং তাঁর জীবনের শেষ বছরের ঘটনাবলির বর্ণনা এতে নেই। তবে নবাব

সিরাজ-উদ-দৌলার রাজ্য লাভ ও মৃত্যু, আলিবর্দি খানের পাশাপাশি তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং মারাঠাদের সঙ্গে আলিবর্দির সুদীর্ঘ ১২ বছরের সংঘাতের বিস্তারিত বিবরণ এতে আছে। এসব বিবরণের বেশির ভাগই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। তিনি শুধু আলিবর্দি খানের দরবারের সভাসদ ছিলেন না, বহু যুদ্ধাভিযানে তিনি তাঁর সঙ্গীও ছিলেন। ফলে তাঁর বর্ণনা অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও প্রমাণভিত্তিক। সে কারণে *সিয়ার* রচয়িতা গোলাম হোসেন তবাতবায়ি তাঁর রচনা থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সে কথা তিনি স্বীকারও করেছেন।

তবে আলিবর্দির ব্যাপারে গ্রন্থকারের বর্ণনাকে মোটেই নিরপেক্ষ বলা চলে না। এ কথা মানতেই হবে, নবাব আলিবর্দি খান চারিত্রিক দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা, বাগ্মিতা, রণনৈপুণ্য, বীরত্ব ও ধৈর্যসহ অসংখ্য সদ্‌গুণের, সর্বোপরি নবাব মুর্শিদ কুলি খানের মতো ছিলেন অসাধারণ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। একমাত্র নিজের বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সংস্পর্শে তিনি যাননি। তখনকার দিনে এ ধরনের নিষ্ঠাকে অসাধারণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। গ্রন্থকার আলিবর্দির চরিত্রের এসব গুণের প্রশংসা শতমুখে করেছেন। কিন্তু অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে লোভ, শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতার মতো অসংখ্য দোষ যে তাঁর চরিত্রে স্থান পেয়েছিল, গ্রন্থকার ভুলেও সে সম্বন্ধে একটি কথা বলেননি। যা কিছু ঘটেছে, তার সব দোষ আলিবর্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্বৃত্ত হাজি আহমদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গ্রন্থকার আলিবর্দিকে ধোয়া তুলসী পাতার মতো পবিত্র হিসেবে দেখাতে সচেষ্ট।

৪. মোজাফ্‌ফরনামা : এ গ্রন্থ সম্পর্কে পরে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫. সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন : এই বিখ্যাত গ্রন্থ ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে এটি রচনার সময় পর্যন্ত যে সাতজন মোগল সম্রাট দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং তাঁদের শাসনামলে ভারত উপমহাদেশে যেসব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল, তিন খণ্ডবিশিষ্ট এই সুবৃহৎ গ্রন্থে মোটামুটি তারই বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থের রচয়িতা নবাব আলিবর্দি খানের এক ভগিনীর দৌহিত্র ও শাহজাদা আলি গওহরের (পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) প্রধানমন্ত্রীর পুত্র। ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর জীবন অতিবাহিত হয় বাঙলা ও বিহারে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর তিনি ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসেন এবং প্রভূত সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। কোনো যোগ্য পণ্ডিতের অভাবে মঁসিয় এম রেমোঁ (M. Raymond) নামের একজন ফরাসি

১১৯৪ হিজরি (১৭৮০ খ্রি.) সনে ফারসি ভাষায় রচিত এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে কাজটি তিনি সম্পন্ন করেন 'হাজি মোস্তফা' ছদ্মনামে। অনূদিত গ্রন্থটি বাঙলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের নামে উৎসর্গ করেন তিনি 'নটা মিনাস' (Nota Menus) ছদ্মনাম গ্রহণ করে। হেস্টিংস বাঙলা ত্যাগের দুই বছর পর গ্রন্থটি তাঁর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু পথে জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় যথাসময়ে তাঁর কাছে তা পৌঁছাতে পারেনি।

সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন একটি অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ। এরই সুবাদে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত, বিশেষ করে বাঙলার ইতিহাসের খুবই মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে গ্রন্থকার ইংরেজদের প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। এর ফলে তিনি যথেষ্ট প্রতিদানও পেয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে।

৬. রিয়াজ-উস-সালাতিন : ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মুনশি সলিমউল্লাহ্ রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালা* গ্রন্থের ২৪ বছর পর ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে গোলাম হোসেন সলিম রচিত এ গ্রন্থে বাঙলায় মুসলিম আমলের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সুলতানি আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তাতে প্রকৃত ইতিহাসের চেয়ে প্রমাণহীন বর্ণনাই বেশি। আর নবাবি আমলের ঘটনাবলির যে চিত্র এতে তুলে ধরা হয়েছে, তা যে *তারিখ-ই-বঙ্গালা* গ্রন্থের বর্ণনাকে অনুসরণ করে, একনজরেই তা ধরা পড়ে। এ কারণে এই গ্রন্থে যেসব বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তব ও মোটামুটি নিরপেক্ষ বলে মনে হয়। তবে গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনাও এ গ্রন্থে আছে—তা হচ্ছে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যু-পরবর্তীকালের ঘটনাবলির ইতিহাস। এসব বর্ণনাকে মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে।

মোজাফ্‌ফরনামার মূল্যায়ন

বাঙলার নবাবি আমলের ইতিহাসে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে মুনশি সলিমউল্লাহ রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালা*, গোলাম হোসেন সলিম রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, ইউসুফ আলি খান রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গি*, সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ি রচিত *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন* প্রভৃতি গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য আছে। *সিয়ার*-এর উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করতে হয়। এই পরিধিবহুল গ্রন্থে নবাবি আমলের ইতিহাস অনেক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। *সিয়ার* রচয়িতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউসুফ আলি খানের রচনা অবলম্বনে তাঁর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলেও, বস্তুনিষ্ঠতার দিক থেকে তাঁর বর্ণনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তার পরও নবাবি আমলের ইতিহাসে *সিয়ার*-এর বর্ণনা সমসাময়িক অন্য আর সব রচনার তুলনায় বিস্তারিত এবং তুলনামূলকভাবে আরও বস্তুনিষ্ঠ।

এর পরের স্থানই বোধ হয় দিতে হয় *তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গি*কে। তবে আলিবর্দির ব্যাপারে ইউসুফ আলি খানের পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। গ্রন্থের এই বড় ধরনের ত্রুটি বাদ দিলে সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনায় ইউসুফ আলির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত ইতিহাসের মূল্য খুবই বেশি এবং এ কারণেই *সিয়ার* ও *মোজাফ্‌ফরনামার* রচয়িতা উভয়েই তাঁর বর্ণনাকে অনেক ক্ষেত্রে প্রায় হুবহু তুলে ধরেছেন। *সিয়ার* রচয়িতা অনেক ক্ষেত্রে সেই ঋণের স্বীকৃতিও দিয়েছেন। তবে *তারিখ*-এর ঐতিহাসিক মূল্য আরও বেশি হতো, যদি ইউসুফ আলি খান তাঁর পরিকল্পনামতো গ্রন্থটি শেষ করতে পারতেন। নানা কারণে গ্রন্থের শেষ দিকের রচনা অনেকটা খাপছাড়া হয়ে উঠেছে। অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি বাদও দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থের অঙ্গহানি ঘটেছে প্রচুর পরিমাণে।

নবাবি আমলের ইতিহাস হিসেবে মুনশি সলিমউল্লাহ রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালার* মূল্য অনেক। তিনি সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য

তুলে ধরেছেন। তাঁর বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ এবং মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নবাবি আমলের শেষ দিকের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাননি। ফলে আলিবর্দির জীবনের শেষ দিকের এবং নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সংক্ষিপ্ত শাসনামলের পুরো ইতিহাসই বাদ পড়েছে।

গোলাম হোসেন সলিম রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের নবাবি আমলের ইতিহাস যে সলিমউল্লাহর *তারিখ-ই-বঙ্গালার* অনুসরণে রচিত, তা সহজেই ধরা পড়ে। তবে গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনাংশকে (নবাবি আমলের শেষের দিকের ঘটনাবলির ইতিহাস) মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে।

নবাবি আমলের সার্বিক ঘটনাবলির ইতিহাস হিসেবে করম আলি খান রচিত *মোজাফ্‌ফরনামার* স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। পলাশীর যুদ্ধের সময় (১৭৫৭ খ্রি.) গ্রন্থকারের বয়স ২১ বছরও পূর্ণ হয়নি। তবে ১২ বছর বয়স থেকেই ঘোড়াঘাটের ফৌজদার হিসেবে অনেক রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী ছিলেন তিনি এবং পূর্ণিয়ার যুদ্ধের সময় (১৭৫৬ খ্রি.) তিনি নিজে বন্দীও হয়েছিলেন। নবাবি আমলের শেষের দিকের ঘটনাবলির অনেক কিছু তাঁর স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ঘটেছিল।

তবে *মোজাফ্‌ফরনামা* পাঠ শেষে দেখা যায়, বেশির ভাগ ঘটনার বর্ণনা সম্ভবত ইউসুফ আলি খানের রচনা থেকেই নেওয়া। কিন্তু সেসব বর্ণনার সংকলন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তিনি করেননি, ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিকতাও রক্ষা করেননি। ফলে তাঁর রচিত ইতিহাস হয়েছে খাপছাড়া ও ইতিহাসের বিচারে পারম্পর্যবিহীন।

তবে সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালের ঘটনাবলি বর্ণনার ব্যাপারে ঐতিহাসিক হিসেবে করম আলির প্রশংসা না করে উপায় নেই। তিনি খুবই বিন্যস্তভাবে এ সময়ের ঘটনাবলির বর্ণনা তুলে ধরেছেন, বিশেষ করে পলাশীর যুদ্ধের কুচক্রী মির মোহাম্মদ জাফর খান, রায়দুর্লভ প্রমুখের ভূমিকা। অন্যদিকে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মির মদন ও রাজা মোহনলালের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। হতভাগ্য সিরাজের অসহায় অবস্থার সুস্পষ্ট বিবরণও এতে আছে। মির জাফরের চক্রান্তের কারণেই যে ইংরেজরা নবাবকে পরাজিত করে বাঙলা অধিকার করতে পেরেছিল, তুলে ধরা হয়েছে সে কথাও স্পষ্টভাবে।

সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালের ইতিহাস তুলে ধরার কৃতিত্ব করম আলি খানকে নিঃসন্দেহে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আলিবর্দি খান, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহমদ ও তাঁর পুত্রত্রয়, আলিবর্দির পিতা-মাতা, তাঁদের গৃহভৃত্য ও অনুচরদের ইতিহাস তুলে ধরার ব্যাপারে।

পাশাপাশি তিনি আলিবর্দি খানের পূর্বপুরুষের বর্ণনা থেকে শুরু করে দরবারে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্রদের অবস্থানের বিবরণও তুলে ধরেছেন। বস্তুত, গ্রন্থকার আলিবর্দি খানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্মর্তব্য, আলিবর্দির গৃহেই তাঁর জন্ম এবং সেখানেই তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর এসব বর্ণনা তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে।

করম আলি খান ছাড়াও সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে আর যিনি আলিবর্দির পরিবারের ইতিহাস লিখে গেছেন, তিনি হচ্ছেন নবাব সরফরাজ খানের জামাতা ও *তারিখ* রচয়িতা ইউসুফ আলি খান। তাঁর রচনাতেও আমরা এই পরিবারের আদি ইতিহাস অনেকটা পাই এবং তা বেশ নির্ভরযোগ্যও। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে এ দুটি গ্রন্থ থেকেই আমরা নবাব সুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, নবাব আলিবর্দি খান, তাঁর পরিবারের সদস্য ও তাঁর অনুচরবৃন্দ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাই। এ কারণে পুস্তক দুটির, বিশেষ করে *মোজাফ্ফরনামা*র মূল্য অপরিসীম।

তবে আরও একটি কারণে এ গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য। সেটা হচ্ছে গ্রন্থকারের নিরপেক্ষ ও সত্যকে প্রকাশ করার ঐকান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। নবাব আলিবর্দি খান ছিলেন গ্রন্থকারের আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা ও পালনকর্তা। সংগত কারণেই তিনি তাঁর গুণগান করেছেন। কিন্তু আলিবর্দির প্রতি তাঁর যে কৃতজ্ঞতাবোধ, তা তাঁর দোষ বর্ণনায় গ্রন্থকারের কণ্ঠ রোধ করতে পারেনি। তিনি সত্য প্রকাশে দ্বিধা করেননি এবং গোড়া থেকেই সত্যের প্রতি অবিচল থাকার প্রমাণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উপক্রমণিকার 'নাদির শাহর ভয়ে বিহার সীমান্তে...' শীর্ষক পরিচ্ছেদের ৪৫ ও ৪৬ পাদটীকা দ্র.। সেখানে আলিবর্দি সৈন্যদের আনুগত্য লাভের আশায় নবাব সরফরাজ খানের নামে একটি জাল চিঠি তৈরি করে সৈন্যদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সত্যান্বেষী করম আলি সে কথা গোপন না করে তাঁর গ্রন্থে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

আলিবর্দির চরিত্রের একটি অতি জঘন্য দিক গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন 'হত্যার চক্রান্ত' শীর্ষক ১১ ও ১২ পরিচ্ছেদের মাধ্যমে। হোসেন কুলি খানকে হত্যা করার জন্য আলিবর্দি উঠেপড়ে লাগেন এবং তাঁর জ্ঞাতসারেই প্রকাশ্য দরবারে সিরাজ হোসেন কুলিকে হত্যা করার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। সেই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে আলিবর্দি নিজে তাঁকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হন। কারণ, তিনি মনে করতেন, হোসেন কুলি খানই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার মতো ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া অবশ্যকর্তব্য বলে আলিবর্দি মনে করেন।

১২ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বলেন, 'সংসারধর্মের পূর্ণ অভিজ্ঞতা আলিবর্দির ছিল। কী করে হোসেন কুলি খানের পতন ঘটাবেন, এ নিয়ে কয়েক বছর ধরে তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করে চলেছিলেন। শঠতার আশ্রয় নিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় কন্যাকে ভর্ৎসনা করে তাঁকে হোসেন কুলি খানের প্রতি বিরূপ করে তোলেন এবং "দূরদর্শিতার সঙ্গে" আলিবর্দি তাঁর গোপন চিন্তার কথা শাহাম্মত জংকে এভাবে বলেন, "গুরুদায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা সিরাজের নেই এবং কথা বলে সে অন্যায়ভাবে মানুষের মনে আঘাত দেয়। আমার অবর্তমানে কিছুদিনের মধ্যেই সে রাজ্য ধ্বংস করে ফেলবে এবং নিজেকে ধ্বংসকারীদের হাতে তুলে দেবে। তাকে ছাড়া তোমার বা আমার আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। বিজ্ঞ হোসেন কুলি খান ছাড়া আমি এমন আর কাউকে দেখি না যে সিরাজের প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করতে পারে। অতএব, হোসেন কুলি খানকে রেহাই দেওয়া আমি সুবিধাজনক ব্যাপার বলে মনে করি না। যদিও এতে [আমাদের বিরুদ্ধে জনগণের মনে] অবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। তবু তাঁকে সরিয়ে ফেলা ছাড়া আমাদের আর কোনো প্রতিবিধান নেই।"'

[হোসেন কুলি খানকে হত্যা করার ব্যাপারে] শাহাম্মত জঙের অনুমতি আদায় করে আলিবর্দি সিরাজকে জানিয়ে দেন।...হোসেন কুলির দলভুক্ত বলে যাদের সন্দেহ করা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে করে আলিবর্দি শিকারের অজুহাতে রাজধানীর বাইরে চলে যান এবং সিরাজ-উদ-দৌলা প্রকাশ্যে হোসেন কুলি ও তাঁর চাচাতো ভাই অন্ধ হায়দার আলি খানকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

আলিবর্দির চরিত্রের এই অন্ধকার দিক একমাত্র করম আলি খানই অকপটে তুলে ধরেছেন। অন্তত সত্যের প্রতি গ্রন্থকারের এই নিষ্ঠার জন্য তাঁর রচিত *মোজাফ্ফরনামা* বাঙলার নবাবি আমলের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া

উপক্রমণিকা

[সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র] শাহজাদা আজমের গৃহে[১] তাঁর জননী পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে [চাকরিতে] নিযুক্ত থাকাকালে সেখানে আলিবর্দির[১ক] জন্ম হয়। তাঁর পিতা শাহ কুলি খান[২] শাহজাদার স্বর্ণালংকার দপ্তরের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজম শাহ ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, এই শিশু (আলিবর্দি) একদিন প্রশাসক হবে।

[১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন] আজম শাহ[৩] নিহত ও তাঁর (আলিবর্দি খান) সম্পদ লুণ্ঠিত হলে তিনি দিল্লিতে চলে আসেন। এ সময় তিনি সীমাহীন দারিদ্র্যের[৪]

---

১. এ সম্বন্ধে *তারিখ-ই* (পৃ. ১ ও *তারিখ-ফা* পাদটীকা) দ্র.। তাতে *তারিখ* রচয়িতা ইউসুফ আলি খান বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের এক শহরে (یکی از بلاد دکن—'ইয়েকে আজবেলাদ-ই-দকিন') আলিবর্দির জন্ম হয়েছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা আহমদের জন্মের প্রায় ১০ বছর পর। তখনো তাঁদের জননী শাহজাদা আজমের গৃহে চাকরিরত ছিলেন কি না, তা পরিষ্কারভাবে বলা নেই।

১. ক. নবাব আলিবর্দি খানের বংশলতিকা পরের পাতায় দ্রষ্টব্য। *

২. *তারিখ-ই* মতে, তাঁর পিতার নাম মির্জা মোহাম্মদ এবং তিনি শাহজাদা আজমের 'শিলাঞ্চী', অর্থাৎ তাঁর খানসামা বা ভোজের টেবিলের প্রধান পরিবেশক ছিলেন। মির্জা আহমদ (হাজি আহমদ) সেখানে 'আবদারখানা', অর্থাৎ পানীয় জল দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ও মির্জা মোহাম্মদ আলি (আলিবর্দি খান) প্রথমে শাহজাদা আজমের সূচিশিল্প কারখানার, পরে হস্তীশালার তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন।

৩. এ সম্পর্কে *তারিখ-বা* প্রথম অধ্যায় ও পাদটীকা দ্র.। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর জীবিত তিন পুত্র, যথা—দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মোয়াজ্জম (পরে সম্রাট বাহাদুর শাহ), তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আজম এবং পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা কামবখশের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে প্রথমে শাহজাদা আজমের পুত্রদ্বয় বেদার বখত ও ওয়ালদ এবং পরে কামবখশ নিহত হন।

৪. মৃত্যুর পর আলিবর্দি খানের পরিবারের সদস্যদের সীমাহীন দারিদ্র্যের বর্ণনা *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ৩ এবং *সিয়ার*-এর (*সিয়ার-ই*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭৫) বর্ণনায় আছে।

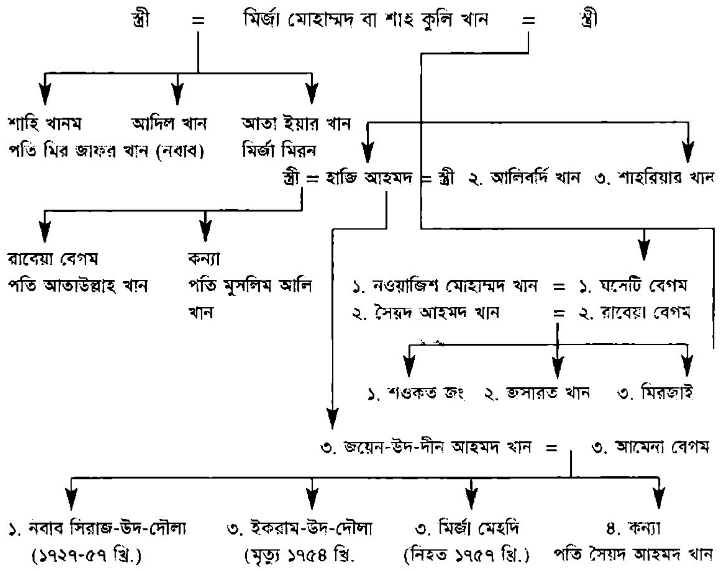
সম্মুখীন হন। কোনো কোনো দিন তাঁকে অনাহারে পর্যন্ত থাকতে হতো। সে সময় তিনি মাঝেমধ্যে রাজা যুগল কিশোরের পিতা রাজা বালকিষাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি সাহেব আজম শাহর মৃত্যুর পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানে কিছুকাল শান্তির সঙ্গে বসবাস করেন।

[সম্রাট] মোহাম্মদ শাহর রাজত্বের প্রথম দিক পর্যন্ত [তাঁর] অবস্থা এরকমই ছিল।

উড়িষ্যায় নবাব সুজা খানের[5] কাছে আলিবর্দি খানের গমন : নবাব আকিল

*** নবাব আলিবর্দি খানের বংশলতিকা**

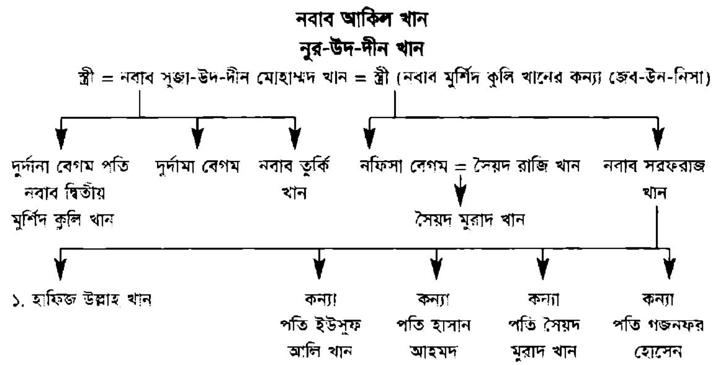
নবাব আলিবর্দির পিতামহ ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুধভাই। তবে তাঁর নাম জানা যায়নি



৫. সুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান ওরফে সুজা-উদ-দৌলা ওরফে সুজা খান ছিলেন সম্ভ্রান্ত তুর্কি আফশার গোত্রের লোক। তিনি ও আলিবর্দি খান একই পূর্বপুরুষের (জদ্দা) বংশধর ছিলেন বলে এখানে বলা হয়েছে। আরবি 'জদ্দা' (جد) শব্দের আভিধানিক অর্থ : 'A grandfather (Paternal or maternal), or another forefather etc.'। এখানে খুব সম্ভব ancestor তথা পূর্বপুরুষ অর্থে ব্যবহৃত, পিতামহ বা মাতামহ অর্থে নয়। কারণ, সুজা খানের পিতামহ ছিলেন নবাব আকিল খান (নিচে বংশলতিকা দ্র.) এবং আলিবর্দির পিতামহ ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুধভাই (নাম পাওয়া যায়নি)। নবাব সুজা খানের বংশলতিকা :

খানের পৌত্র ছিলেন নবাব সুজা খান। তিনি ও আলিবর্দি খান একই পূর্বপুরুষের (জদ্দা) বংশধর ছিলেন। বাঙলার সুবাদার নবাব জাফর খানের (মুর্শিদ কুলি খান) কন্যার সঙ্গে তাঁর (সুজা খান) বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর অসংযমী চরিত্র[৬] ও অখ্যাতিজনক আচরণের জন্য জাফর খানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তিনি (সুজা খান) দিল্লি চলে যান। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক লাখ মোহর অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা সংক্রান্ত অভিযোগপত্র নবাব জাফর খান সম্রাট বরাবর প্রেরণ করেন। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা অবলম্বন করে আমির-উল-উমারা খান-ই-দওরানের উপদেশে সুজা খানকে উড়িষ্যার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন। ১১৩১ হিজরি (১৭১৯) সনে তিনি সে প্রদেশে গমন করে সেখানকার শাসনকাজ পরিচালনা করতে থাকেন।

আলিবর্দি খানের পিতা শাহ কুলি খান [দিল্লি থেকে] নবাব সুজা খানের অনুগামী হন এবং (এর) বছর খানেক পর নবাবকে অনুরোধ করে তাঁর পুত্রকে (আলিবর্দি খান) উড়িষ্যা আগমনের জন্য একটি পরোয়ানা[৭] প্রেরণ করতে সমর্থ



৬. মূল ফারসি পাঠ 'আওবাশি (اوباشی) শব্দের অর্থ 'Profligacy' or 'Debauchery', অর্থাৎ ব্যভিচার। অন্য অসংখ্য মানবিক গুণের অধিকারী হলেও যৌন ব্যভিচারে সুজা খানের আসক্তি ছিল অত্যন্ত বেশি এবং একসঙ্গে চার ঘন্টার অধিক কোনো-না-কোনো নারী সহবাস ছাড়া তিনি থাকতে পারতেন না বলে *সিয়ার*-এর ইংরেজি অনুবাদক টীকায় বলেছেন।

৭. ফারসি পাঠে Parwanah (پروانه) শব্দ আছে বলে স্যার যদুনাথ বলেছেন। এই শব্দের অনেক অর্থের একটি অর্থ রাজকীয় আদেশপত্র, অর্থাৎ 'Order: a certificate granting rights (sanad) issued by a provincial governor Nazim or Diwan.' খুব সম্ভব এ অর্থেই পরওয়ানাহ শব্দ এখানে ব্যবহৃত।

হন। আলিবর্দি তাঁর স্ত্রীর অলংকারাদি নয় শ টাকার বিনিময়ে বিক্রি[৮] করেন। সেই টাকা থেকে (৬০০ টাকা দিয়ে) তাঁর পরিবার-পরিজনকে পরিবহনের জন্য একটি পশুবাহিত শকট ভাড়া করেন এবং (অবশিষ্ট) ৩০০ টাকা দিয়ে নিজের জন্য ক্রয় করেন একটি অশ্ব। তিনি তাঁর পুরোনো গৃহভৃত্য (খানজাদা)[৯] ফকির উল্লাহ বেগ ও নুর উল্লাহ বেগ খানকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁদের নিয়ে সুজা খানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ১১৩২ হিজরি (১৭২০ খ্রি.) সনে চলে আসেন উড়িষ্যায়। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি (আলিবর্দি) অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করলে নবাব সুজা খান তাঁকে সাতন্দ্রাপুরের থানাদার[১০] পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর উপাধি হয় মোহাম্মদ আলিবর্দি খান[১১]। তাঁকে ছয় শ (মনসবদারের) জাগির প্রদান করা হয়।

সাতন্দ্রাপুর থানা ছিল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে। ছিল কেওনঝর,[১২] আনখর ও ধনকবলের রাজাদের রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই তিনজন রাজাই ছিলেন সুবাদারের বিরুদ্ধে। আলিবর্দি এ থানায় সহজেই তাঁর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সুআচরণের মাধ্যমে উল্লিখিত তিনজন রাজাকেও তাঁর আজ্ঞানুবর্তী করে ফেলতে সক্ষম হন।

আমন্ত্রণক্রমে হিজরি ১১৩৩ (১৭২০-২১ খ্রি.) সনে হাজি সাহেব তাঁর জননী, সন্তানসন্ততি, মির্জা গোলাম হোসেন, মির্জা খয়েরউল্লাহ বেগ, মির্জা কুলি বেগ ও বংশানুক্রমে নিয়োজিত অন্যান্য পারিবারিক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে নবাব সুজা

---

৮. আলিবর্দির অতি শোচনীয় আর্থিক অবস্থার বর্ণনা *তারিখ*-এও আছে, (*তারিখ-ই*, পৃ. ১২ ও *তারিখ-বা*, পরিচ্ছেদ ১ দ্র.)।

৯. ফারসি 'খানজাদাহ' (خانزاده) শব্দের অর্থ গৃহজাত ক্রীতদাসদের বংশধর (sons of family slaves)।

ফকির উল্লাহ বেগ খান ও নূরউল্লাহ বেগ খান ছিলেন আলিবর্দিদের গৃহজাত ক্রীতদাসের সন্তান। পরবর্তীকালে তাঁরা উঁচু পদ লাভ করে সেনাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন এবং সব সময়ই বিশ্বস্ত ছিলেন।

১০. এখানে আলিবর্দিকে থানাদার বলা হয়েছে। বাঙলায় এ ধরনের কর্মকর্তাকে ফৌজদার বলা হতো। খুব সম্ভব উড়িষ্যাতে থানাদার পদবি প্রচলিত ছিল।

১১. *তারিখ* মতে (*তারিখ-ই*, পৃ. ৬ ও *তারিখ-বা* পরিচ্ছেদ ২) আলিবর্দির বাঙলায় আগমন ও রাজমহলের ফৌজদার পদে নিযুক্তির পরে (খুব সম্ভব ১৭২৭-২৮ খ্রি.) মির্জা মোহাম্মদ আলি 'আলিবর্দি খান' (علی ور دی خان = মহান পদবিধারী খান) উপাধিতে ভূষিত হন। *তারিখ*-এর বর্ণনাই সঠিক বলে মনে হয়।

১২. এসব স্থান সম্পর্কে স্যার যদুনাথ পাদটীকায় (য. না., পৃ. ১২) বলেন: 'Sawantrapur, given as Santrapur in Sterling's 'Orissa Keonjhar', 21.37 N. 25.38 E. Ankhor is evidently a copyist's error for Angul. Khalikotl. 15 m.n Ganjam town. Malud, south of the Chilka lake. Kujang on an arm on the sea, 20.14 N. 80.34.'

খানের কাছে উপস্থিত হন।[১৩] কিন্তু নবাবকে দিন-রাত সঙ্গদান করা ছাড়া তাঁর অধীনে কোনো চাকরি গ্রহণের ব্যাপারে হাজি সাহেব অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। যোগ্যতা অনুসারে তাঁর পুত্রদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করে তিনি তাঁর প্রিয় ভ্রাতার পদোন্নতির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর প্রশাসনিক জ্ঞান ও শক্তিবলে আলিবর্দি সমগ্র উড়িষ্যা থেকে শান্তি ভঙ্গকারীদের উৎখাত এবং তাদের অনেককে হত্যাও করেন। খালিকোট ও থানা মালুদের যুদ্ধগুলোতে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। সে অঞ্চলে সুজা খানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে নবাব তাঁকে কুজঙ্গ আক্রমণ করার আদেশ দেন। এই কুজঙ্গ দুর্গ ছিল সমুদ্রে কয়েকটি দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রাকৃতিক কিছু অসুবিধার কারণে সেই দুর্গে অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে তিনি তিন বছর ধরে তা অবরোধ করে রাখেন।

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বর্ণনা : তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দুর্গ অধিকৃত হয়নি বলে সুজা খান (আলিবর্দির ওপর) অসন্তুষ্ট হন। আলিবর্দি তখন একাকী নবাবের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে দুর্গের কাছে নিয়ে আসেন। সুপরামর্শ দান শেষে আলিবর্দি (দুর্গের অধিপতি) রাজার কাছে একটি চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আত্মসমর্পণ করলে রাজা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবেন এবং নবাবের তরফ থেকে রাজাকে অনেক অনুগ্রহ প্রদান করা হবে বলেও সে পত্রে উল্লেখ করা হয়। রাজা তাতে সাড়া দেন। আত্মসমর্পণের জন্য তিনি দুর্গের বাইরে নবাব বরাবর উপস্থিত হন এবং সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান। এই সাফল্যের কারণে নবাব এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি আলিবর্দিকে প্রচুর অনুগ্রহ প্রদান করেন এবং তাঁকে সেখানকার শাসনকর্তা হিসেবে অবস্থান করার আদেশ দেন।

১১৩৯ হিজরি (৩০ জুন ১৭২৭ খ্রি.) সনে [নবাব] জাফর খানের মৃত্যু হলে নবাব সরফরাজ খানের অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকারের সংবাদ নবাব সুজা খানের কাছে পৌঁছায়। তিনি আরও জানতে পারেন, নবাব আলা-উদ-দৌলা [সরফরাজ খান] ঘোষণা করেছেন, নবাব সুজা খান যদি মুর্শিদাবাদে [সিংহাসন অধিকার করার জন্য আসেন], তবে সরফরাজ খান তাঁকে সশস্ত্রভাবে বাধা দেবেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ অসংগত বিবেচনা করে নবাব সুজা খান মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু হাজি সাহেব নবাবকে এই পরামর্শ দেন যে, 'সাধারণ মানুষের কথা এখনো সরফরাজ খানের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার

---

১৩. বর্ণনামতে মির্জা গোলাম হোসেন, মির্জা খয়ের উল্লাহ বেগ এবং মির্জা কুলি বেগও আলিবর্দিদের পরিবারের বংশানুক্রমিক গৃহভৃত্য (hereditory servants) ছিলেন। তবে তাঁরা 'খানজাদাহ' ছিলেন কি না তা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত নেই।

করেনি। তিনি আপনার পুত্র। তাঁর জননী জীবিত এবং তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে আছেন। যত দ্রুত সম্ভব আপনার সেখানে যাওয়া কর্তব্য।'

এ সময় মুর্শিদাবাদে বসবাসরত (নবাব সুজা খানের) বেগমের[১৪] কাছ থেকে এই মর্মে পত্র আসে যে, তাঁর [নবাব সুজা খানের] যত দ্রুত সম্ভব সেখানে (মুর্শিদাবাদে) যাওয়া আবশ্যক। নবাব সুজা খান তাঁর [অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত] পুত্র নকি[১৫] খানকে উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করে তাঁর হাতে শাসনভার ন্যস্ত করে পূর্ণ বর্ষাঋতুর মধ্যেই অবিলম্বে বাঙলা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই তকি খান[১৫] ছিলেন সরফরাজ খানের জননীর সতিনের সন্তান। হাজি আহমদ খান ও শাহ্ কুলি খান এই অভিযানে তাঁর সহযাত্রী হন।[১৬] বর্ষাকাল ও অতিরিক্ত কাদার কারণে আলিবর্দি খান কুজঙ্গ থেকে এসে তাঁদের সঙ্গী হতে পারেননি।

নবাব সুজা খান বাঙলায় এসে সুবাদারের মসনদে বসেন এবং তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে তাঁর নায়েব সুবাদার (deputy) নিযুক্ত করেন। নবাবের আদেশে আলিবর্দি খান বাঙলায় বর্ষা শেষে চলে আসেন। সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব[১৭] ও জাফর খানের বাজেয়াপ্ত সম্পদ বাঙলা থেকে পাটনার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে প্রথমে আলিবর্দিকে নিযুক্ত করা হয়। দায়িত্ব পালন শেষে ফিরে আসার পর তাঁকে ১১৪০ হিজরি (১৭২৭-২৮ খ্রি.) সনে (বিহার ও) বাঙলার সীমান্তে অবস্থিত রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। সেই বছরই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা জন্মগ্রহণ

---

১৪. নবাব সুজা-উদ-দীন খানের স্ত্রী ও নবাব জাফর খানের (মুর্শিদ কুলি খান) একমাত্র কন্যার নাম ছিল জেব-উন-নিসা বা জিন্নত-উন-নিসা। এ সম্পর্কে *তারিখ-বা,* পরিচ্ছেদ ১, পাদটীকা ৭ দ্র.। *সিয়ার*-এর মূল ফারসি পাঠেও জেব-উন-নিসা পাঠই দেখা যায়।

১৫. তাঁর প্রকৃত নাম ছিল তকি খান (নকি খান নয়)। স্যার যদুনাথ ভুল করে নকি খান দিয়েছেন। খুব সম্ভব ফারসি তকি (تقی) খান পাঠের (ت) অক্ষরের একটি নুকতা না থাকার কারণে স্যার যদুনাথ ভুলক্রমে নকি (نقی) খান পাঠ লিখেছেন। তকি খান ও তাঁর ভগিনী দুর্দানা বেগম (দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের স্ত্রী) ছিলেন নবাব সুজা-উদ-দীন খানের অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। তিনি ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর স্থানে নবাব সুজা খান তাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানকে ঢাকা থেকে বদলি করে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। কটকের কদম রসুল নামের দরগাতে তকি খানের পাকা সমাধি ছিল। এখনো হয়তো আছে।

১৬. এই তথ্য *তারিখ*-এ নেই এবং আলিবর্দি খান যে সুজা খানের সঙ্গে আসতে পারেননি, সে কথাও সেখানে নেই।

১৭. মোগলদের রীতি অনুসারে সম্রাটের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মৃত্যু হলে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের নয়, সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হতো।

করেন।[১৮] আলিবর্দি খান এই নবজাতককে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখার জন্য আদেশ প্রদান করেন। চার বছর ফৌজদার থাকাকালে প্রীতিপদ ও কঠোর—এই উভয়বিধ আচরণ দিয়ে রাজমহলের চারপাশের পাহাড়ি মানুষদের তিনি বশীভূত করে ফেলেন। বণিক ও পথিকের সম্পদ হরণ করার অভ্যাস ছিল এই পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের। তিনি তাদের আজ্ঞানুবর্তী মানুষে পরিণত করে তাদের যাতায়াতের পথ সুগম করে দেন।

এ সময় এ অঞ্চলের ভাট উপজাতীয় কিছু হিন্দু পাহাড় থেকে নেমে এসে আলিবর্দিকে বলেন, 'বহুকাল পর এখানে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। অসংখ্য সাপ আমাদের মুখের প্রশংসাবাণী শোনার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে। এগুলোর অনেকের মুখে টাকা ও মোহর। ভবিষ্যতে আমাদের অভাব মেটানোর জন্য তারা আমাদের সেই সব [টাকা ও মোহর] দিয়ে দেয়, যাতে আমরা তা কোনো মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা না করে আনি। এর ফলে তারা আমাদের হত্যা করতে পারে।'

আলিবর্দি তাদের কথা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু গ্রন্থকার প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে জানতে পারেন, এই ঘটনা সত্যি।

এই সময় আলিবর্দি খানের পিতার মৃত্যু হয় ৬৭ বছর[১৯] বয়সে। রাজমহলে তাঁর সমাধি আছে।

পাটনার নায়েব সুবাদার পদে আলিবর্দির নিযুক্তি : নবাব সুজা খান নবাব খান-ই-দওরানের[২০] মাধ্যমে (দিল্লির) সম্রাটের কাছে চার বছর ধরে নিয়মিত ১

---

১৮. বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন নবাব আলিবর্দি খানের কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বেগম ও হাজি আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র জয়েন-উদ-দীন আহমদ খানের পুত্র। তিনি ১৭২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এখানে বলা হয়েছে (আলিবর্দি খানের বংশলতিকা দ্র.)।

১৯. আলিবর্দির পিতা শাহ কুলি খান বা মির্জা মোহাম্মদের বয়স নিয়ে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন আছে। ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৭ বছর হলে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে আলিবর্দি মারা গেলে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। আর তা না ধরে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করার সময় তাঁর বয়স যদি ৬০ বছর হয়, তাহলে তাঁর জন্মসাল ছিল ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ এবং তাঁর চেয়ে ১০ বছরের বড় হাজি আহমদের জন্ম হয়েছিল ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ তাঁদের পিতার ৭ বছর বয়সকালে। তা হতে পারে না। খুব সম্ভব মির্জা মোহাম্মদের জন্ম হয়েছিল অনেক আগে এবং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি ছিল।

২০ দিল্লির সম্রাট মোহাম্মদ শাহর (১৭১৯-৪৯ খ্রি.) সেনাবাহিনীর প্রধান বখশি আমির-উল-উমারা সমসাম-উদ-দীন খান-ই-দওরানের প্রকৃত নাম ছিল খাজা আসম। বদখশান থেকে

কোটি করে টাকা প্রেরণ করতেন। ফলে তিনি অর্জন করেন মহা সম্মান ও বিশ্বাস। আজিমাবাদের (পাটনা) সুবাদার ছিলেন ফখর-উদ-দৌলা। হাজি আহমদ ও আলিবর্দির পরামর্শে সুজা খান আজিমাবাদের সুবাদারির জন্যও সম্রাটের কাছে দরখাস্ত পেশ করেন। ফখর-উদ-দৌলাকে সেই পদ থেকে বরখাস্ত করার এক পরোয়ানা এবং সুজা-উদ-দৌলাকে সেই পদে নিযুক্ত করার (সম্রাটের কাছ থেকে) এক সনদ[২০ক] আসে। একজন স্থায়ী নায়েব নাজিম না আসা পর্যন্ত এই সুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফখর-উদ-দৌলার সতীর্থ গোলাম আলি খানকে নবাব সুজা খান চিঠি লেখেন এবং আহসান উল্লাহকে সেখানে তাঁর নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তি (আহসান উল্লাহ) এর দুই কি তিন দিন পরই মৃত্যুবরণ করেন। রাজ্যের ছোট-বড় সব কাজই হাজি সাহেবের পরামর্শমতে পরিচালিত হতো বলে আলিবর্দি খানকে বিহারের নায়েব সুবাদারের পদে নিয়োগ করা হয়। কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করে তিনি ১১৪৫ হিজরি (১৭৩২-৩৩ খ্রি.) সনে পাটনায় উপস্থিত হন।

তাঁর সুশাসনের মাধ্যমে আলিবর্দি সশস্ত্র বাহিনী ও প্রজাদের উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সব বিদ্রোহী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সবাই তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়ে পড়ে। বাদশাহি রাজস্বের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন দিওয়ান চিন্তামন দাস এবং নবাবের (জাফর খানের) রাজস্বের পরিচালনায় ছিলেন রাজা জানকীরাম। মির্জা মিরক খান বখশি, মির্জা দাওয়ার কুলি খান, জিনসি[২১] গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা হায়দর আলি খান, দস্তি[২১] গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা গোলাম হোসেন খান, দিওয়ানখানার দারোগা ফকির উল্লাহ বেগ খান, কোতোয়াল ও নুর উল্লাহ বেগ খান হস্তী ও 'নখাশমহল'-এর[২২] দারোগার পদে নিযুক্তি লাভ করেন।

আসা তাঁর পূর্বপুরুষেরা আগ্রায় বসতি স্থাপন করেন। নাদির শাহর ভারত আক্রমণকালে তিনি যুদ্ধে নিহত হন। নবাব সুজা খান তাঁর স্নেহপুষ্ট ছিলেন।

২০ ক. Sanad: 'Certificate issued by a provincial officer, Nazim or Diwan.'

২১. 'জিনসি' (جنسی) ও দস্তি (دستی)—এই দুই ধরনের কামান তখনকার দিনে ব্যবহৃত হতো বলে দেখা যায়। জিনসি খুব সম্ভব বড় ধরনের কামান। হাত দিয়ে উত্তোলন ও ব্যবহার করা যায় এমন কামানকে খুব সম্ভব দস্তি কামান বলা হতো।

২২. ফারসি পাঠের অভাবে এই 'নখাস মহাল' পদের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। এই শব্দ যদি আরবি (نقاش) (নকাশ) হয়ে থাকে, তাহলে তা ছবি আঁকা বা মানচিত্র তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। আর যদি তা আরবি 'নখাস' (نخاس) হয়, তাহলে তা গো-মহিষাদির মহাল অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে দারোগাহ শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

রাজমহল থেকে আলিবর্দি খানের পাটনায় যাওয়ার পর সেই বছরই হাজি আহমদের কনিষ্ঠ জামাতা আতাউল্লাহ খানকে রাজমহলের এবং নবাব সওলত জংকে (হাজি আহমদের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আহমদ) রংপুরের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করা হয়।

ভোজপুরের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আলিবর্দির অভিযান: সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করার ব্যাপারে ভোজপুরের জমিদাররা অত্যধিক বিলম্ব করতেন। রাহাজানিও ছিল এই গোত্রের মানুষদের পেশা। একসময় তা চরম আকার ধারণ করে। এসব করেই তারা পূর্ণ আধিপত্যের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। এসব কারণে আলিবর্দি খান ১১৪৬ হিজরি (১৭৩৩-৩৪ খ্রি.) সনে ওই অঞ্চলে অভিযানে অগ্রসর হন। পূর্ববর্তী সুবাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো এবারও তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেও পরাজিত হয়ে পলায়ন ও আত্মগোপন করেন। তাঁদের অনেককে হত্যা করা হয়। কিছু লোক বন্দীও হন। তাঁদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো বিধ্বস্ত করা হয়। তাঁদের জমিদার গাজিপুরে পালিয়ে গিয়ে মধ্যস্থতাকারী সংগ্রহ করে (তাদের মাধ্যমে) তাঁর কাছে যে বিস্তর রাজস্ব বকেয়া ছিল, তা পরিশোধ করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের অন্যায় করবেন না বলে অঙ্গীকারপত্র দেওয়ার পরই তিনি (আলিবর্দি) নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বিজয়ীর বেশে আলিবর্দি তাঁর কর্মস্থলে ফিরে আসেন।

আলিবর্দির বেত্তিয়া মহলে অভিযান এবং আরও কিছু ঘটনা: বেত্তিয়া[২৩] (অঞ্চলের) রাজা ছিলেন বিহারের বিদ্রোহী জমিদারদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি (সুবাদারের) সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট হয়রানি করতেন। ১১৪৭ হিজরি (১৭৩৪-৩৫ খ্রি.) সনে তাদের দমন করার জন্য আলিবর্দি খান শাহাম্মত জংকে[২৪] একদল

ফারসি 'দারোগাহ' (داروغه) শব্দের অর্থ: Headman of an office, prefect of a town or village, overseer or superintendent of any department.

২৩. বেত্তিয়ার জমিদারদের সম্পর্কে গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক স্যার যদুনাথ সরকার পাদটীকায় (য. না. পৃ. ১৫) বলেন: 'The Bettia rajas are Jaitharia Brahmans. They first secured the recognition of the Emperor of Delhi in Jahangir's reign. On the death of Gaj Singh in 1694, his possessions were partitioned among his three sons, Dalip S. getting Bettia, another son Seohar, and a third Madhubani. Alivardi's opponent was Dhrub Singh (reigned 1715–1763) the son and successor of Dalip Singh.'

২৪. হাজি আহমদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আলিবর্দির জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগমের স্বামীর নাম ছিল রেজা খান। পরে তাঁর নাম হয় নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান এবং তাঁকে আরও পরে 'শাহাম্মত জং' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এসব বর্ণনা *তারিখ*-এ থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থে নেই। এ সম্পর্কে প্রথম পৃষ্ঠায় আলিবর্দি খানের বংশলতিকা দ্র.।

সৈন্যের অধিনায়ক করে সেখানে প্রেরণ করেন। আবদুল করিম আফগানকে[২৫] প্রেরণ করেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য। সমগ্র দেশ ছিল গভীর জঙ্গলে আবৃত। অভিযানকারীরা অরণ্যের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে রাজার দুর্গের কাছে উপস্থিত হয়। সম্মুখসমরে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অক্ষম হয়ে রাজা এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহাম্মত জং এই দুর্গ অবরোধ করেন এবং দুর্গের বুরুজের নিচে শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্যের আধান স্থাপন করে খনন করেন সুড়ঙ্গ। আবদুল করিম সেই সুড়ঙ্গ পরীক্ষা করতে গেলে স্থানে স্থানে তা ভেঙে পড়ে। সেখানে দুই-তিন দিন ধরে এমন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় যে, আবদুল করিমের পক্ষে [সেখান থেকে] বের হয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুই দিন পরে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য মাটি খনন করা হলে তিনি জীবন্ত ও নিরাপদ অবস্থায় বের হয়ে আসেন। (এতে) ভীত হয়ে বেত্তিয়ার রাজা দুর্গের চারদিকে দুরতিক্রম্য গভীর পরিখার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তী পাহাড়ে পলায়ন করে সেখান থেকে তিনি দূত প্রেরণ করেন।

নবাবের সেনাবাহিনী সেই অঞ্চলের অনেক গ্রাম ধ্বংস করে, অবাধ্য লোকদের হত্যা করে, বিস্তর ধন-সম্পদ হস্তগত করে এবং সেখানকার শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করে আলিবর্দির কাছে ফিরে আসে। এই বিজয় আবদুল করিমকে মহা সম্মানের পাত্র করে তোলে। ফলে তাঁর গর্ব আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে।

সেই একই ১১৪৭ হিজরি (১৭৩৪-৩৫ খ্রি.) সনে আলিবর্দি খানের আমন্ত্রণে গ্রন্থকারের পিতা-মাতা[২৬] দিল্লি থেকে চলে আসেন এবং আলিবর্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হাজি সাহেবের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে তাঁরা বাঙলা অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাব সুজা খানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হাজি সাহেবের সুপারিশে গ্রন্থকারের পিতাকে [নবাব সুজা খান] নগদ [মাসিক] দুই শ টাকা বেতনে বর্ধমানের সংবাদ-লেখকের পদে চাকরির ব্যবস্থা করেন। ২৪ বছর পর এই

---

২৫. আবদুল করিম আফগান ছিলেন একজন অসমসাহসী যোদ্ধা ও বীর। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা পরে আছে।

২৬. গ্রন্থকার করম আলি খান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আলিবর্দির কী সম্পর্ক ছিল, সে কথা স্পষ্টভাবে কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু তা যে খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ, গ্রন্থকারের পিতা তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে আলিবর্দির গৃহেই বাস করতেন বলে দেখা যায় এবং সে গৃহেই ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে করম আলি খানের জন্ম হয়েছিল। হাজি আহমদের সুপারিশে করম আলির পিতার চাকরি হয়েছিল দেখে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্কের ধারণা আরও দৃঢ় হয়। *তারিখ*-এর বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় যে, করম আলির মাতা আলিবর্দি-জননীর অতি নিকটাত্মীয় ছিলেন।

বর্ধমান চাকলা ইংরেজ সাহেবদের অধিকারে এলে এই চাকরি আমাদের পরিবারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।[২৭]

একই বছর মিথ্যা অপবাদকারীদের প্ররোচনায় নবাব সুজা খান আলিবর্দিকে তাঁর দরবারে তলব করেন। একজন অনুগত ভৃত্যের মতো তিনি মুর্শিদাবাদে যান এবং নবাবের মন থেকে অসন্তোষের ধূলি দূরীভূত করেন। [নবাবের] বেগম আলিবর্দিকে নায়েব সুবাদারের পদ থেকে অপসারিত করে তাঁর জামাতা [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খানকে সেই পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবাব সুজা খান মুর্শিদ কুলি খানের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। নবাবের আহ্বানে কোনো অজুহাত প্রদর্শন না করে অবিলম্বে তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার কারণে নবাবের মন থেকে তাঁর সম্পর্কে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। নবাব তাঁকে তাঁর প্রতিনিধির (নায়েব সুবাদার) চাকরিতে বহাল রাখেন। ফলে সেই রাজ্যের জনগণের মনে মহা আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।[২৮]

ভুনরার রাজাকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে আলিবর্দির অভিযান: পাহাড়, জঙ্গল ও শক্তিশালী ঘাঁটির কারণে ভুনরার[২৯] রাজা খুবই গর্বিত ছিলেন বলে শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখাতেন। এ বছরও তিনি তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রদর্শনে তৎপর হন।

'অশ্বের জিনকে তাঁর নিদ্রাস্থল করে' আলিবর্দি অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। রাজাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়; এমনটি এর আগে সেখানে দেখা যায়নি। পরিশেষে রাজা পলায়নপর হন। আবদুল করিম খানকে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি কষ্টকৃত অভিযান চালিয়ে ধাওলাঘাট পাহাড়ের প্রান্তদেশে রাজার স্ত্রী-পুত্রকে বন্দী করে তাঁদের সুবাদারের জিম্মায় তুলে দেন। বিজয়ীগণ পাটনা দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজা আনুগত্য স্বীকার করলে তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

---

২৭. ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলার নায়েব নাজিম সৈয়দ রেজা খানের পদচ্যুতির সঙ্গেই গ্রন্থকারের পরিবারের এ চাকরি চলে যায়। রেজা খান (মোজাফ্ফর জং) যে গ্রন্থকারের পরিবারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, গ্রন্থের নামকরণই তা প্রমাণ করে।

২৮. এ ঘটনার কথা *তারিখ, সিয়ার* বা অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

২৯. এই রাজাদের সম্পর্কে গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক স্যার যদুনাথ সরকার পাদটীকায় (য. না., পৃ. ১৬) বলেন :

'Bhunra, 19 miles n.n.e. of ettia town and about the same distance n.n.w. of Segauh. It stands on the Nepal frontier. Gladwin in his translation of the *Tarikh-i-Bangalah*, read the name as Phoolwareh, which Rennel also gives in his Plate as Fulvaryo. Evidently the Persian clerks of these two authors wrongly read be and e as pe and aliph as lam. Ain (ii 156) has Bhanwarah, a mahal in sarkar Tirhut.'

এরপর তিনি তাঁর নিজ গৃহে ফিরে যান।

মহাল বেত্তিয়ার বনজারদের[৩০] বিরুদ্ধে আলিবর্দির সৈন্য প্রেরণ: বনজার উপজাতির মানুষেরা—অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে প্রায় ৮০ হাজার লোক ও প্রায় ১ লাখ বলদ নিয়ে একসঙ্গে সমবেত হতো। চাল ক্রয়-বিক্রয় করা ছিল তাদের লোক-দেখানো ব্যাপার, আসলে তারা যেদিকে যেখানেই যেত, সেখানেই লুটপাট করত, বিশেষ করে অযোধ্যা, গোরখপুর, গাজিপুর, বেত্তিয়া ও ভোয়ানরাতে (শেষোক্ত স্থানটি ছিল তাদের বিশেষ লীলাক্ষেত্র)।

এ সময়ও তারা একসঙ্গে আসে এবং অন্যান্য অন্যায়কারী দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বড় বড় দল গড়ে তুলে তারা অন্যায়-অত্যাচার চালাতে থাকে। আলিবর্দি খান এবার তাদের অগ্রগমনের সংবাদ পেয়ে আবদুল করিম খানকে ৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা করে হেদায়েত আলি খানের[৩১] নেতৃত্বে দিওয়ান চিন্তামন দাসকে এই উপজাতি গোষ্ঠীকে দমন করার আদেশ দেন। সেনাবাহিনী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। বনজাররা আবদুল করিমের নাম শুনে ভীত হয়ে মকওয়ানি নামের পাহাড়ি ঘাঁটিতে পালিয়ে যায়। আবদুল করিম খান তাদের বিশ্রামের কোনো সুযোগ না দিয়ে বেত্তিয়ার রাজার প্রদর্শন করা পথে সেই গিরিদুর্গে উপস্থিত হন এবং তাঁর বীর সৈনিকদের নিয়ে বিপৎসংকুল গিরিপথ দিয়ে হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হন। আমাদের সৈন্যরা এক দিক দিয়ে উপস্থিত হলে অন্য পক্ষের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো গতি থাকে না। সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর তারা মকওয়ানির গিরিপথ ধরে সেই রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। মকওয়ানি রাজ্য হিন্দুস্থানের সম্রাটের কর্তৃত্বের বাইরে ছিল।[৩২] সেই পাহাড় ছিল আকাশের মতো উঁচু। আবদুল করিম খান সে দেশের রাজার কাছে লেখেন, 'আমার শিকার যদি এসব গিরিপথ দিয়ে পালিয়ে যায়, তবে জেনে রাখুন, আমি আপনার রাজ্যে গিয়ে হাজির হব।'

---

৩০. বনজারগণ ছিল খুব সম্ভব উপজাতীয় যাযাবর (জিপসি) প্রকৃতির লোক। 'বনজারা' (بنجاره) শব্দটি খুব সম্ভব হিন্দি ভাষা থেকে গৃহীত এবং হিন্দি ভাষার এ শব্দের অর্থ শস্য ব্যবসায়ী, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে শস্য সরবরাহকারীকে বোঝায়।

৩১. এই হেদায়েত আলি খানের আর কোনো পরিচয় এখানে পাওয়া যায়নি। তবে তিনি যে *সিয়ার* রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ির পিতা ও দিল্লির সম্রাটের একসময়ের উজির সৈয়দ হেদায়েত আলি খান ছিলেন না, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে হেদায়েত আলি খান নবাব আলিবর্দি খানের ভাগনিকে বিয়ে করেছিলেন এবং বিহার রাজ্যে তাঁর বাসগৃহসহ জাগির ভূমিও ছিল। তিনি প্রথম জীবনে বিহার প্রদেশেই ছিলেন বলে জানা যায়।

৩২. খুব সম্ভব মকওয়ারি অঞ্চল পার্শ্ববর্তী নেপাল রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল।

তিনি (রানা) এ সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীদের পলায়নের গিরিপথগুলো বন্ধ করে দেন। আবদুল করিম খান সেসব গিরিপথে প্রবেশ করে অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রায় ২০ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহীকে বন্দী করেন এবং হস্তগত করেন তাদের লুণ্ঠন করা বহু দ্রব্য।

প্রত্যাবর্তনের পথে গাজিপুরের ফৌজদারের কাছ থেকে তিনি এ মর্মে একখানা চিঠি পান যে, এসব লোক অযোধ্যা সুবার ব্যবসায়ী। তাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা সংগত হবে না। সুতরাং যাত্রাবিরতি করে খান জবাবে লিখে পাঠালেন, 'আমি আমার বন্দীদের নিয়ে উপস্থিত আছি। আপনি আসুন ও (তাদের) নিয়ে যান।'

এক সপ্তাহ বিলম্ব করার পরও কেউ এসে হাজির হয়নি দেখে তিনি (আবদুল করিম খান) পাটনায় ফিরে যান। কোনো গ্রন্থেই লেখা নেই যে, মাত্র ৪ হাজার সৈন্য ২০ হাজারের একটি সেনাবাহিনীকে তাদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রসহ বন্দী করতে সমর্থ হয়েছিল। ১০টি মঞ্জিল অতিক্রম করার পর তাদের একজনও পালিয়ে যেতে পারেনি। আবদুল করিম নিম্নবর্ণিত উপায়ে এ কাজ করেছিলেন। পাটনায় ফিরে যাওয়ার সময় তিনি সেই ২০ হাজার বন্দী বনজারকে তাদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রসহ পেছন থেকে একপাল মেষের মতো তাড়িয়ে নেন। কোনো ব্যক্তি বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেটে ফেলার ব্যবস্থা করেন। এভাবে পাটনায় পৌঁছার আগে পর্যন্ত প্রায় ৫০০ লোককে হত্যা করা হয়। তাদের (নিহত ব্যক্তিদের) স্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিষপান করে অথবা ছুরি বা তরবারির আঘাতে আত্মহত্যা করে তাদের স্বামীদের সঙ্গী হয়। তারা আলিবর্দি খানের কাছে উপস্থিত হলে এই উপজাতির কিছু লোককে হত্যা, কিছু লোককে বন্দী ও বাকি লোকদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

যেসব বনজার গিরিপথ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেককে মকওয়ানির দস্যুরা হত্যা ও তাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। সংক্ষেপে, উল্লিখিত প্রায় ১ লাখ লোকের মধ্যে ১০ হাজারের বেশি লোক তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। অবশিষ্ট লোকজন বিনষ্ট হয় তাদের কৃতকর্মের কারণে। যাদের কয়েদ করা হয়েছিল, পরে তাদের অনেকেই হয়বত জং ও বাবর জঙের মধ্যে যুদ্ধের সময় পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল।[৩৩] আবদুল করিম খান হাজিপুরে পৌঁছালে

---

৩৩. এ যুদ্ধের কথা পরে আলোচ্য গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ৫০-৫৫, দ্র.), *সিয়ার* (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮) ও *তারিখ-ই-বঙ্গালা* (পৃ. ১৭০-৭) দ্র.। আলিবর্দির আফগান সেনাপতি মোস্তফা খান বাবর জং ও আলিবর্দির জামাতা জয়েন-উদ-দীন খান হয়বত জঙের মধ্যে ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

আলিবর্দি খান গঙ্গা অতিক্রম করেন এবং লুট করা দ্রব্যের একাংশ তাঁর আয়ত্তে আনেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের যে অংশ সরকারের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, আবদুল করিম খান তা বদান্যতার সঙ্গে সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

আবদুল করিম খানকে হত্যা করার বর্ণনা : তাঁর মহান কৃতিত্ব ও অহংকারের জন্য আবদুল করিম খান কাউকে পরোয়া করতেন না। তাঁর আচরণ ছিল অবাধ্য। বনজারদের [লুণ্ঠিত] দ্রব্য অধিকারের প্রশ্নে দুই দলের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হলে আবদুল করিম সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হন। ফলে কিছুদিন তিনি আলিবর্দির দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। নিজ গৃহে অবস্থান করে অকার্যকর পরিকল্পনায় মেতে ওঠেন।

আলিবর্দি তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং দুর্গে আসার পথে তাঁর [জীবনের] পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে দুটি স্থানে [সশস্ত্র] লোক মোতায়েন করেন। বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ এই বীর দ্বিতীয় স্থানে এসে পৌছান। স্থানটি ছিল যশোবন্ত নাগরের অধীনে। সেখানে একজন নাগরী সৈনিক তাঁর পেছন থেকে এগিয়ে এসে তরবারি দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে চায়। কিন্তু আবদুল করিম তাঁর দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান যে, সেই ব্যক্তি দমে যায়। কেউ তাঁকে বাধা দিতে সাহস পায়নি বলে আবদুল করিম উভয় স্থানে দণ্ডায়মান সৈন্যদের অতিক্রম করেন এবং [মাত্র] দুজন সঙ্গী নিয়ে আলিবর্দির সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। বীরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মির্জা দাওয়ান কুলি বেগ তাঁকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়ান এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। অস্ত্রটি তাঁর মস্তকে এক বিঘত পরিমাণ প্রবেশ করে। এই আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও আবদুল করিম খান মির্জা দাওয়ান কুলিকে নিজের তরবারি দিয়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, একটি অঙ্গুলিসহ দাওয়ান কুলির তরবারির বাঁট বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা রুস্তম[৩৪] ও আসফিনদিয়ারের মতো একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল করিম পরাজিত ও নিহত হন। আবদুল করিমের সঙ্গী দুজনকে মির্জা কুলি আঘাত করেন। অন্যরা তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে। এতক্ষণ ধরে চারজন লোকের সঙ্গে বসে আলিবর্দি খান দৃশ্যটি অবলোকন করছিলেন। আবদুল করিমের ছিন্ন মস্তক (দুর্গের) বাইরে অপেক্ষারত তাঁর অনুসারীদের সামনে নিক্ষেপ করা হলে তারা নিরুপায় হয়ে নিজেদের জীবন রক্ষার্থে পালিয়ে যায়।[৩৫]

---

৩৪. প্রাচীন পারস্যের কিংবদন্তির বীরপুরুষ ছিলেন রুস্তম ও আসফিন্দিয়ার। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি আছে।

৩৫. আবদুল করিম খানের হত্যার এ ঘটনার কথা *তারিখ* বা *সিয়ার*-এ নেই।

টিকারির জমিদার সুন্দর সিংহের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ: দুষ্টলোকের প্ররোচনায় সুন্দর সিংহ[৩৬] বাধ্যতার সীমানা অতিক্রম করলে আলিবর্দি তাঁর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সুন্দর (সিংহ) একজন বীরপুরুষ হলেও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ কারণে তিনি পাহাড়ি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকেই খণ্ডযুদ্ধ শুরু করেন। সুযোগ পেয়ে সরকারি বাহিনী সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, আমাদের সৈন্যরা আকস্মিক কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কিন্তু নিজের আসন্ন বিপদের কথা অনুধাবন করে আল্লাহর রহমতে সুন্দর সিংহ পলায়ন করেন। সরকারি বাহিনী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে বন্দী করে। তারপর তাঁর হাত ও ঘাড় বেঁধে আলিবর্দির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে আলিবর্দি তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেও দিওয়ান চিন্তামন দাসের প্রচেষ্টায় তাঁকে ক্ষমা করে শাসনকর্তার [আলিবর্দির] পুত্ররূপে গ্রহণ করা হয়। রাজা অতীত দুষ্কৃতীর জন্য অনুতপ্ত হয়ে বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার নতুন শপথ গ্রহণ করেন এবং একটি খিলাত দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এরপর তিনি আর কোনো দিন অবাধ্য হননি। নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও আলিবর্দির পক্ষে বহু যুদ্ধে লিপ্ত হন।

রাজা সুন্দর সিংহের অনুগত মোস্তফা খান[৩৭] নামের একজন নতুন কর্মকর্তাকে তাঁর ৩৫ জন যোদ্ধাসহ আলিবর্দির অধীনে চাকরি দেওয়া হয়। দিন দিন তাঁর এত পদোন্নতি হতে থাকে যে, তিনি সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হয়ে বাবর জং (যুদ্ধে সিংহ) উপাধি লাভ করেন এবং চার শ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হন।

নবাব সুজা খানের আদেশে আলিবর্দির বীরভূম অভিযানে নেতৃত্ব : নবাব সুজা খানের প্রতি বীরভূমের রাজা অবাধ্যতা প্রদর্শন করেন। তাঁর এই অবাধ্যতার ফলে অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাঁকে দমন করার জন্য নবাব সুজা খান মুর্শিদাবাদ থেকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উপযুক্ত সৈন্যসহ পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আলিবর্দিকে পত্র লেখেন, যাতে

---

৩৬. রাজা সুন্দর সিংহ ছিলেন উত্তর বিহারের (গয়া অঞ্চলের) একজন প্রতাপশালী জমিদার। তাঁর অধীন সেনাবাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী। পরবর্তীকালে তিনি আলিবর্দি ও তাঁর পরিবারের মিত্র হন এবং তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

৩৭. এই আফগান মোস্তফা খান পরে আলিবর্দির প্রধান সেনাপতি হন (তাঁর সম্বন্ধে পরে প্রদত্ত বর্ণনা দ্র.)। আরও পরে আলিবর্দির অধীন চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বিদ্রোহী হন এবং আজিমাবাদ (পাটনা) অধিকার করার চেষ্টা করলে সেখানকার শাসনকর্তা ও আলিবর্দির কনিষ্ঠ জামাতা জয়েন-উদ-দীন খান হয়বত জঙের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে নিহত হন। *সিয়ার, তারিখ* ও *রিয়াজ*-এ (পৃ. ২৭৬-৭৭) তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আলিবর্দি তাঁকে 'বাবর জং' (ببر جنگ = যুদ্ধে ব্যাঘ্র) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

বীরভূমের রাজা আসাদ-উজ-জামান খান[৩৮] অন্য কোনো পথে সেখান থেকে পলায়ন করতে না পারেন। আলিবর্দি এই অভিযানের জন্য অগ্রসর হন। তিনি বীরভূমে উপস্থিত হলে পলায়নের অন্য কোনো পথ না পেয়ে বীরভূমের রাজা আলিবর্দির সঙ্গে আপসের জন্য দূত প্রেরণ করেন। বীরধর্মের অনুসারী আলিবর্দি রাজাকে বন্দী না করে তাঁর সাহায্যকারী হন। আলিবর্দির নির্দেশে রায় আলম চাঁদ[৩৯] তাঁর সুপারিশকারী হয়ে তাঁকে নবাব সুজা খানের কাছে হাজির করেন। তাঁকে খুশি করার পর তাঁরা তাঁকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নবাব সুজা খান আদেশ প্রদান করেন। তাঁরই আদেশে আলিবর্দি নিজের কর্মস্থলে ফিরে আসেন।

এই বছরই, অর্থাৎ ১১৪৯ হিজরি সনের ৭ রজব (৩১ অক্টোবর ১৭৩৬ খ্রি.) বাঙলার শহরে[৪০] (মুর্শিদাবাদে) আলিবর্দি খানের বাসভবনে এই গ্রন্থকারের জন্ম হয়। নবাব সুজা খান তাঁর নাম রাখেন করম আলি খান।

নাদির শাহর ভয়ে বিহার সীমান্তের কর্মনাশাতে আলিবর্দির নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ, নবাব সুজা খানের মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনা : ১১৫১ হিজরি (১৭৩৮ খ্রি.) সনে নাদির শাহ[৪১] ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন। সব দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে উপযুক্ত সেনাবাহিনী নিয়ে সীমান্ত রক্ষার জন্য নবাব সুজা খান আলিবর্দিকে আদেশ প্রদান করেন। তাঁকে (আরও) শক্তিশালী করার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে দুই-তিনজন হাজারিকে [সৈন্যসহ] প্রেরণ করা হয়। তাঁর নতুন ও পুরোনো সৈন্য এবং (মুর্শিদাবাদ থেকে) সরবরাহ করা সেনাদল নিয়ে আলিবর্দি কর্মনাশাতে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে নবাব সুজা খান মৃত্যুমুখে পতিত হন[৪২] এবং মরহুম

---

৩৮. বীরভূমের জমিদার রাজা আসাদুজ্জামান ছিলেন একজন পরাক্রান্ত জমিদার। তিনি প্রায় স্বাধীন নৃপতির মতো আচরণ করতেন এবং নবাবের রাজস্ব আদায়ে ছিলেন গাফেল। *রিয়াজ*-এ (পৃ. ২৩৯-৪০) তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

৩৯. রায়রায়ান আলম চাঁদ ছিলেন নবাব সুজা খানের দিওয়ান। *তারিখ*, *রিয়াজ*, *সিয়ার* ও অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা আছে।

৪০. 'বলদা-ই-বঙ্গালা' (balda-i-Bangalah) বলতে 'City of Bengal' বোঝায় এবং তা যে বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগর ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। নবাব সুজা-উদ-দীন যে গ্রন্থকারের নামকরণে সমর্থন জোগান এবং গ্রন্থকারের পরিবার যে বিশিষ্ট ছিল, তা-ও বোঝা যায়। তখন মুর্শিদাবাদ নগরে আলিবর্দির নিজস্ব মহল বা বাসভবন ছিল বলেও ধারণা করা যায়।

৪১. ইরানের রাজা নাদির শাহর ভারত আক্রমণের কাহিনি *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-১২) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে এবং *রিয়াজ*-এ (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৪১) ও *তারিখ-ই-বঙ্গালায়* অতি সংক্ষেপে (পৃ. ১২২ ও ১২৫) উল্লেখ আছে।

৪২. নবাব সুজা-উদ-দীন ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চে মৃত্যুবরণ করেন বলে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন।

নবাবের পুত্র সরফরাজ খান আলা-উদ-দৌলা সুবাদারের মসনদে আরোহণ করেন। নতুন সুবাদার প্রত্যেক নায়েব সুবাদার ও ফৌজদারকে নিজ নিজ পদে বহাল রেখে ফরমান জারি করেন।

চার কি পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নাদির শাহর আক্রমণ শেষে (১ মে ১৭৩৯ খ্রি.) আলিবর্দি তাঁর কর্মস্থলে (আজিমাবাদ) ফিরে আসেন। দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ও মিথ্যা কলঙ্ক রটনাকারীদের প্ররোচনায় নবাব সরফরাজ খান আলিবর্দির ওপর অসংগতভাবে রুষ্ট হন।[৪২] তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী নবাবকে বলেন, আলিবর্দি ঐশ্বরিক আশীর্বাদধন্য ও আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ের অধিকারীও[৪৩]। অতএব, তাঁর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে সরফরাজ খান আলিবর্দি বরাবর এক রূঢ় বার্তা ও অসংগত পত্র প্রেরণ করেন। পাশাপাশি হাজি সাহেব ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি উপহাসসূচক ব্যবহার করতে শুরু করেন।[৪৪] বিন্দুমাত্র বিজ্ঞতার অধিকারী নয়, এমন কয়েকজন হীন প্রকৃতির লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লোভে এমন একজন 'সরদার'-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করে যে, তা নবাব সুজা খানের রাজ্য ও তাঁর ভাগ্যের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আলিবর্দির সেনাদলকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য তারা তাঁর কাছে এই মর্মে এক চিঠি লেখার ব্যবস্থা করে যে, 'নবাব সুজা খানের উদ্যোগে সৈন্য সংগ্রহকারী হাজারিদের স্বর্ণ ও প্রবালখচিত যেসব মালা প্রদান করা হয়েছিল, সেগুলো ফিরিয়ে এনে যেন মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

আলিবর্দি প্রকাশ্য দরবারে সেই পত্র পাঠ করেন এবং সেই দরবারেই হাজারিদের কাছ থেকে সেসব মালা সংগ্রহ করে থলে ভর্তি করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। ফেরত নেওয়া সেসব মালার পরিবর্তে তিনি তখন হাজারিদের মুক্তাখচিত মালা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে হাজারিরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হন। এসব কারণে সৈন্যরা সালা-উদ-দৌলার হীন প্রবৃত্তির জন্য তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে; গভীর আনুগত্য ও বাধ্যতাসহ আলিবর্দিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৫] তাদের কেউ কেউ অবশ্য বলে, (প্রকৃতপক্ষে) নবাবের সৈন্যদের তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই আলিবর্দি এই জাল পত্র তৈরি করেছিলেন।[৪৬]

---

৪৩. একে আলিবর্দির পক্ষে গ্রন্থকারের সাফাই গাওয়ার সূচনা বলা যেতে পারে।

৪৪. এসব বর্ণনা *তারিখ* বা *সিয়ার*-এ দেখা যাচ্ছে না। তবে আলিবর্দির গৃহে জন্মগ্রহণকারী ও সেখানে লালিত-পালিত করম আলি খানের বর্ণনা যে আলিবর্দির ব্যাপারে যথেষ্ট পক্ষপাতদুষ্ট হবে, তা অনুমান করা যায়।

৪৫. গ্রন্থকার এখানে সত্য কথাই বলে ফেলেছেন। খুব সম্ভব এটাই ছিল প্রকৃত ঘটনা।

৪৬. সৈন্যদের এই আনুগত্য আদায় করাই ছিল খুব সম্ভব আলিবর্দির জাল পত্র তৈরির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অভিজ্ঞতা ও বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বলে আলিবর্দি কিছু সময়ের জন্য নিজেকে নবাবের (সরফরাজ খান) প্রতি আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা সীমার মধ্যে রাখেন।[৪৭] কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে নিজের অবস্থানে অসহায়ের মতো অপেক্ষা করার বিপক্ষে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি বুঝতে পারেন, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা পশুদের প্রকৃতি। গৌরবের অধিকারী হওয়া ও ক্ষমতা দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মহত্ত্বের পরিচায়ক। প্রায়ই তিনি এই কবিতা পাঠ করতেন।[৪৮]

যে ব্যক্তি আজকের কাজ আগামী দিন করে,
ভাগ্য তাকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করে।

কারও কাছে তাঁর অন্তরের বাসনা প্রকাশ না করে বাঙলার সিংহাসন অধিকারের যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, তাকে হাতছাড়া না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি।

সেনাবাহিনী নিয়ে আলিবর্দির বাঙলায় অভিযান, নবাব আলা-উদ-দৌলা নিহত : আলিবর্দি এক বছর অপেক্ষা করেন। এরপর ১১৫২ (প্রকৃতপক্ষে ১১৪৩ হিজরি, ১৭৪০ খ্রি.) সনে তিনি সুবাদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি প্রথমে নবাব শাহাম্মত জং ও নবাব হাসান কুলি খানকে[৪৯] একদল শক্তিশালী সৈন্য দিয়ে হানসওয়া ও নওয়াদার জমিদারদের শায়েস্তা করার অজুহাতে (সেদিকে) পাঠিয়ে দেন এবং (সেখানে) পরবর্তী আদেশ পাওয়া মাত্র তা পালন করার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে বলেন। পাটনাতে নবাব হয়বত জংকে[৫০] তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তিনি ভোজপুরের জমিদারদের শাস্তিদানের অজুহাতে তাঁর সেনাবাহিনী ও উপদেষ্টাদের নিয়ে বাঁকিপুরে তাঁবু গাড়েন। সেখানে তিনি প্রায় এক মাস অপেক্ষা

---

৪৭. আলিবর্দির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতার সীমা ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থকার ও *তারিখ* রচয়িতা ইউসুফ আলি খান তাঁর পক্ষে যথেষ্ট সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করলেও সত্য বের হয়ে পড়েছে। নবাবের প্রতি আলিবর্দির এই তথাকথিত আনুগত্য ছিল করুণা প্রদর্শনেরই শামিল। আলিবর্দি যে অনেক দিন আগে থেকেই মসনদ অধিকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, গ্রন্থকারের বর্ণনা মারফত তা দেখা যাচ্ছে।

৪৮. আলিবর্দির চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ এখানে ধরা পড়েছে। কবিতার মূল ফারসি পাঠ পাওয়া যায়নি। স্যার যদুনাথ যে ইংরেজি পাঠ দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ :
Fortune condemns the man
Who performs today's work tomorrow.

৪৯. এই হাসান কুলি খান খুব সম্ভব পরবর্তীকালে সিরাজ-উদ-দৌলার হাতে দিবালোকে নিহত হোসেন কুলি খান।

৫০. জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জং। তিনি ছিলেন আলিবর্দির কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বেগমের স্বামী ও সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা।

করেন, যাতে ভোজপুরে তাঁর অভিযানের সংবাদ কাছের ও দূরের লোকজনের কাছে পৌঁছে যায়। ১১৫২ হিজরি (প্রকৃতপক্ষে ১১৫৩ হি., ১৭৪০ খ্রি.) সনে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহাম্মত জংকে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে রাজমহলে পৌঁছার আদেশ দেন এবং তিনি মাত্র ছয়বার যাত্রাবিরতি করে দ্রুতগতিতে রাজমহলে এসে উপস্থিত হন। তাঁর লোকজনকে বিশ্রাম দেওয়ার মানসে এবং পিছিয়ে পড়া লোকদের তাঁর কাছে এসে পৌঁছার জন্য তিনি সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করেন। সেখান থেকে তিনি নবাব আলা-উদ-দৌলাকে এই মর্মে পত্র লেখেন[৫১], 'নবনিযুক্ত সৈন্যরা তাদের বকেয়া বেতন আদায় করার জন্য আমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে। সুতরাং, আমার এই ভ্রমণের ব্যাপারে আপনার মনে কোনো সন্দেহ উদ্রেক হওয়া উচিত নয়। হাজি সাহেবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমার মনের কথা তাঁর মাধ্যমে মুখে মুখে প্রকাশ করতে পারি এবং (মুর্শিদাবাদে) আমার যেসব আত্মীয়স্বজন আছে, তাঁদেরও আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমার ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যায় তাঁরাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে নবনিযুক্ত সৈন্যদের বকেয়া বেতনও পরিশোধ করে দিন।'

আলিবর্দির আগমনবার্তা ও তাঁর পত্র পেয়ে নবাব আলা-উদ-দৌলা হাজি সাহেবকে বিদায় দেওয়ার ব্যাপারে জগৎশেঠ ও রায় আলম চাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।[৫২] তাঁরা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁকে এই উপদেশ দেন, 'হাজি সাহেবকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ, তাঁর বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াতে কিছু আসে যায় না। কিছুদিনের জন্য আপনি আলিবর্দির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। এভাবে তাঁর মন থেকে ভীতির ভাব দূর করে দিন। এরপর প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, আপনি তাঁকে শেষ করে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। এ কাজে বিলম্ব বা গাফিলতি করবেন না।'[৫৩]

এই উপদেশ অনুসারে নবাব সুজা খান হাজি সাহেবকে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং সেনাবাহিনীর সৌহার্দ্য আদায়ের চেষ্টা করেন। যেসব লোক মাস দুই আগে

---

৫১. আলিবর্দির ভণ্ডামি ও নির্লজ্জ আচরণের অপরূপ দৃষ্টান্ত এই পত্র।

৫২. হাজি আহমদ, রায়রায়ান আলম চাঁদ ও জগৎশেঠকে নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদ নবাব সুজা খানের রাজ্য চালাতেন এবং পিতার নির্দেশে নবাব সরফরাজ খান তাঁদের উপদেশ অনুসারেই চালাতেন তাঁর শাসনকার্য। এই তিনজনই ছিলেন বিশ্বাসঘাতক।

৫৩. এই বিশ্বাসঘাতকেরা তাঁদের যোগ্য উপদেশই দিয়েছিলেন অতি সরল প্রকৃতির নবাব সরফরাজ খানকে। এই প্রসঙ্গে *সিয়ার* (*সিয়ার-ই*, পৃ. ২৩২), *তারিখ-ই*, পৃ. ১৪-১৬) ও *রিয়াজ* (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৪৩-৪৫) দ্র.।

চাকরিচ্যুত হয়েছিল, পুনরায় তাদের নিযুক্ত করার আদেশ দেন তিনি। অভিজ্ঞ সৈনিকদের সঙ্গে তিনি নিজে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে নগর থেকে বের হয়ে আসেন এবং দুই দিনের মধ্যে সুতি নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন।[৫৪]

হাজি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আলিবর্দি তাঁর বিশাল বাহিনী একত্র করেন। ফলে বাহিনীটির স্থানসংকুলান কঠিন হয়ে পড়ে। রাজমহল থেকে তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। সুতি নদীর দুই তীরে একে অন্য থেকে তিন ক্রোশের ব্যবধানে দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সাবধানতা ও পর্যবেক্ষণগত ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে অবহেলা করে নবাব আলা-উদ-দৌলা, (মির) হাবিব উল্লাহ খান, গওস খান আফগান, মির শরফ-উদ-দীন ও (পর্তুগিজ) পাঞ্জম পারকেলের অধীন সেনাবাহিনীকে নদী পার করিয়ে আলিবর্দির সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার আদেশ দেন।[৫৫] তিনি নিজে কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে নদীর এপারে থাকেন। তিনি সুজাত বেগ ও বসন্ত খোয়াজাকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে আলিবর্দির কাছে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা করা হয়েছিল গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষ্য থেকে।[৫৬] তবে বিচক্ষণতাপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে আলিবর্দি এই দুই ব্যক্তির মন জয় করে নেন এবং তিনি যে সৎ প্রকৃতির মানুষ, তা প্রমাণ করেন। তাঁরা শান্তি বা যুদ্ধবিষয়ক কোনো কথা আরম্ভ না করেই ফিরে এসে বলেন, আলিবর্দির মতো অনুগত ও বিশ্বস্ত দ্বিতীয় একজন কর্মকর্তা পাওয়া দুষ্কর।[৫৭]

মির্জা মোহাম্মদ ইরাজ খানের[৫৮] বংশজাত বখশি আলি মর্দান খানের পরামর্শক্রমে নবাব সরফরাজ খান আলিবর্দির সেনাপতিদের টাকার প্রলোভন

---

৫৪. করম আলি খান সব কথা এখানে পরিষ্কার করে বলেননি। বলা যেতে পারে, তাঁর বর্ণনা অনেকটা খাপছাড়া ধরনের। এই সম্পর্কে *তারিখ* ও *সিয়ার*-এর বর্ণনা অনেক বিস্তারিত ও স্পষ্ট।

৫৫. এই প্রসঙ্গে *সিয়ার* (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০-৩৫) ও *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ১৫-১৭ দ্র.) দ্র.। সেখানে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

৫৬. এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা *সিয়ার* (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০-৩৫) এবং *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ১৫-১৭)-এ আছে। প্রকৃতপক্ষে আলিবর্দির আমন্ত্রণেই নবাব সরফরাজ খান এঁদের তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য নিজে থেকে পাঠালেও তাতে কোনো অন্যায় ছিল না।

৫৭. কপটতা ও ভণ্ডামিতে দক্ষ আলিবর্দি তাঁদের প্রভুর চেয়েও আহাম্মক দূতদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের মনের কথাই বলেছিলেন। কারণ, আলিবর্দির ভণ্ডামি তাঁরা মোটেই বুঝতে পারেননি।

৫৮. অভিজাত বংশীয় ইরাজ খানের কন্যার সঙ্গে পরবর্তীকালে সিরাজ-উদ-দৌলার বিয়ে হয়েছিল।

দেখিয়ে ফাঁকে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রতিশ্রুতি ও সীমাহীন পারিতোষিকের প্রলোভনে পূর্ণ রাজকীয় পত্র আলিবর্দির দলের প্রত্যেক কর্মকর্তার কাছে গোপনে পাঠানো হয়।[৫৯] বিশ্বস্ত মোস্তফা খান এমন একটি পত্র নিয়ে মধ্যরাতে আলিবর্দির কাছে এসে তাঁকে তা দেখিয়ে বলেন, 'আমাদের সম্মান রক্ষার ওপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল। আপনি আমাদের প্রভু, আপনার যা ইচ্ছা, তা-ই করুন। শত্রুসৈন্য আমাদের তুলনায় অনেক বেশি হলেও তাদের সবাই নতুন মানুষ, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ।'

আলিবর্দি তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করেন, তাঁর প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সেই মধ্যরাতেই সৈন্যদের যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার আদেশ প্রদান করেন। যথাসম্ভব অল্প আওয়াজ করে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে শ্রেণিবদ্ধ করেন এবং শাহাম্মত জং ও মোস্তফা খানকে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে থেকে শত্রুপক্ষের ডান দিকের ব্যূহের দিকে অগ্রসর হতে বলেন। তিনি রঙ্গলাল নামের সরদারকে সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে নবাবের অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাপতি হাবিব উল্লাহ খান ও গওস খানের সম্মুখীন হতে বলেন। কিন্তু আক্রমণ করতে নিষেধ করেন। ১১৫২ (প্রকৃতপক্ষে ১১৫৩) হিজরি সনের ২৯ মহররম (১৫ এপ্রিল ১৭৪০ খ্রি.) আলিবর্দি তাঁর অশ্বের রক্ষক, ক্রীতদাস ও অন্যান্য (ব্যক্তিগত) পোষ্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বারোহণে প্রত্যুষে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে নবাব আলা-উদ-দৌলার শিবিরের কাছে উপস্থিত হন এবং গোলন্দাজ বাহিনীকে গোলা নিক্ষেপের আদেশ প্রদান করেন। তাঁর সেনাবাহিনীসহ নবাব আলা-উদ-দৌলা তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। বন্দুকের গুলি ও কামানের গোলার শব্দে তিনি জেগে ওঠেন। এই অবস্থায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শাহাম্মত জং ও মোস্তফা খানের সৈন্যদের আগমনের ফলে ডান পাশে থাকা নবাবের সৈন্যদল তাদের মালপত্র পরিত্যাগ

---

৫৯. প্রকৃতপক্ষে আলিবর্দিই যে এই কদর্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে সৈন্যদের খেপিয়ে তুলেছিলেন, সেই কথা *সিয়ার* ও *রিয়াজ*-এ স্পষ্টভাবে বলা আছে। অথচ গ্রন্থকার এখানে সরল হৃদয় সরফরাজ খানকেই এর জন্য দায়ী করেছেন এবং খুব সম্ভব ইচ্ছাকৃতভাবে সবকিছু জেনেশুনেই। এই সম্পর্কে *সিয়ার*-এর টীকাকার (*সিয়ার-ই* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬, ৩০৯ পাঠ) বলেন, 'We know for certain and this is the universal report that this manoeuvre was played by Aalyverdy qhan himself through Jagat-sedt, his friend, against Ser-efraz qhan's officers; and we have been assured by one of them, still living, that himself had received such a Tip for Rs 4,000, and had been desired to load the artillery only with earth and rubbish. The universal report at Moorshidabad is, that in fact some guns were served in this manner and by the by not a word is said by the author of Ser-efraz Khan's artillery.'

করে পালাতে শুরু করেন। মোহাম্মদ ইরাজ খানের পুত্র নিহত হলে বখশি আলি মর্দান খান ও জনজরিয়া গোত্রের সৈন্যরা পলায়ন করে।[৬০]

নবাব আলা-উদ-দৌলা 'ফজরের', অর্থাৎ প্রাতঃকালের নামাজ শেষ করে একটি হস্তীতে আরোহণ করে তাঁর শিবির থেকে কয়েক পদ অগ্রসর হলে একটি বন্দুকের গুলি এসে তাঁর কপালে আঘাত করে। ফলে তাঁর মাথা থেকে উষ্ণীষ পড়ে যায়। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৬১] মির দিলির আলি তাঁর কয়েকজন অনুচর নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং নবাবের সব শেষ হয়ে গেছে দেখে পলায়নের গ্লানি বহনে সম্মত না হয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। গওস খান, হাবিব উল্লাহ খান, মির শরফ-উদ-দীন, পর্তুগিজ পাঞ্জম এবং অন্যরা শত্রুপক্ষকে তাঁদের সম্মুখে দেখার পর নিজেদের পক্ষে অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহের সময় না পাওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ করতে থাকেন এবং সহজেই রঙ্গলাল বনজারকে হত্যা করেন।

নবাব আলা-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর এই বাহিনী আলিবর্দির সম্মুখীন হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু তাঁদের (বিভিন্ন সেনাপতির) মধ্যে কোনো যোগাযোগ না থাকায় হাবিব উল্লাহ খান তাঁর সমুদয় বাহিনী নিয়ে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। গওস খান কুতব ও বাবর নামে তাঁর দুই পুত্র ও অন্যদের নিয়ে তিনি এবং মির শরফ-উদ-দীন কয়েকজন অনুসারীকে নিয়ে গঙ্গা নদী অতিক্রম করে আলিবর্দির সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হন। তারপর বীরের মতো যুদ্ধ করে পিতা ও দুই পুত্র নিহত হন। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে মির শরফ-উদ-দীন আলিবর্দির বাহু লক্ষ্য করে একটি তির নিক্ষেপ করে নিরাপদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

---

৬০. এ যুদ্ধের বর্ণনা *রিয়াজ, সিয়ার* ও *তারিখ*-এ বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে। সেই সব বর্ণনা অনেক বিস্তারিত। আলোচ্য গ্রন্থকার যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রে খাপছাড়া ও অসম্পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

৬১. সরফরাজ খানের মৃত্যু সম্পর্কে এ বর্ণনার সঙ্গে *তারিখ*-এর বর্ণনার (*তারিখ-ই*, পৃ. ১৫-১৬) যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু *রিয়াজ*-এর বর্ণনা (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৪৯-৫০) সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে আছে :

'শত্রুপক্ষের জয় হয়েছে দেখে মাহুত সরফরাজ খানকে বলল, "মহামান্য হুজুরের যদি অনুমতি হয় তবে আমি আপনাকে বীরভূমের জমিদার বদিউজ্জমানের ওখানে নিয়ে যেতে পারি।" সরফরাজ খান মাহুতের ঘাড়ে একটা ঘুষি মেরে উত্তরে বললেন, "হাতির পা শিকল দিয়ে বাঁধো; এই সকল কুকুরের সামনে থেকে আমি পশ্চাদগমন করব না।" মাহুত বাধ্য হয়ে হাতি সম্মুখের দিকে চালাল। শত্রু বাহিনীর বরকন্দাজ ও ভালিয়ারা আগে থেকেই সরফরাজ খানের শিবিরের চারদিক ঘিরে রেখেছিল।...এই সময় সরফরাজ খানও নিজ শিবিরস্থ জনৈক বিশ্বাসঘাতকের বন্দুকের গুলিতে কপালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাতির হাওদার ওপর পড়ে যান এবং তাঁর আত্মাপাখি বেহেশতে উড়ে যায়।'

প্রত্যাবর্তন করেন। বিজয়ের রণ-দামামা বাজিয়ে আলিবর্দি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরে ফিরে যান।[৬২]

আলা-উদ-দৌলার রাজত্ব এক বছর এক মাস স্থায়ী হয়েছিল।

---

৬২. করম আলি খানের এই বর্ণনা মোটামুটি সত্য।

প্রথম অধ্যায়[1]

আলিবর্দির সিংহাসনে আরোহণ

এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন বিজয়লাভের পর আলিবর্দি সুতি থেকে দিওয়ান সরাইতে [সৈন্যদের সঙ্গে] কুচকাওয়াজ করে যান। তিনি নিজে না গিয়ে হাজি সাহেবকে প্রথমে [মুর্শিদাবাদ] নগরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যাতে হাজি সাহেব জনগণকে বিজয়ের কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করতে পারেন। হাজি সাহেব নগরে প্রবেশ করে জনসাধারণের মন সান্ত্বনাবাক্যে প্রশমিত করলে উঁচু-নিচু সব স্তরের লোক আলিবর্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে।[2] হাজি সাহেবের নগরে আসার দুদিন পর আলিবর্দি সেখানে আসেন। এসে প্রথম তিনি আলা-উদ-দৌলার ভগিনীর[3] গৃহে যান। তাঁর সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ বক্তব্য সেই ভগিনীর হৃদয়ের দুঃখ

---

১. স্যার যদুনাথ অনূদিত মুদ্রিত গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠা পরে এখানে প্রথমবারের মতো পরিচ্ছেদগত ভাগ দেখা যাচ্ছে। মূল ফারসি পাণ্ডুলিপিতেও এরকমটিই ছিল কি না পাণ্ডুলিপি না দেখে তা আমাদের পক্ষে বলার সাধ্য নেই।

২. এ সম্পর্কে *রিয়াজ*-এ (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৫৪) অন্যরকম কথা আছে এবং তা সত্য বলেই মনে হয়। সেখানে আছে: 'যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর আলিবর্দি খান, মহাবত জঙের আফগান ও ভালিয়া সৈন্যরা তিন দিন যাবৎ মুর্শিদাবাদ নগরী ও সরফরাজ খানের সম্পদ লুটপাট করে। এই লুণ্ঠন যাতে স্বচক্ষে দেখতে না হয়, সে জন্য তিনি (আলিবর্দি) নগরে প্রবেশ করেননি।'

৩. তিনি ছিলেন নবাব সুজা খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা নফিসা বেগম। তাঁর স্বামীর নাম ছিল সৈয়দ রাজি খান এবং তাঁদের পুত্র ছিলেন সৈয়দ মুরাদ খান। *সিয়ার*-এর বর্ণনামতে (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০) আলিবর্দির কথায় আশ্বস্ত হওয়া তো দূরের কথা, আলিবর্দির লম্বা বক্তৃতার উত্তরে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। আর আলিবর্দির এ বক্তৃতা যে শঠতা

দূরীভূত করে।

এরপর আলিবর্দি 'দরবার-ই-আম'-এ যান। অসংখ্য সৈন্য ও অন্য অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের পদসঞ্চালনে উত্থিত ধূলি সূর্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।...শাসনকর্তার মসনদে উপবেশন করে [তিনি] বলেন যে, সৈন্য ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন। নবাব আলা-উদ-দৌলার নিযুক্ত কোনো চাকরিজীবীকে পদচ্যুত করা হয়নি। তাঁদের সবাই নিজ নিজ পদে নিরাপদে বহাল থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছিলেন বলে হাবিব উল্লাহ খান[৪] মানুষের সামনে মুখ দেখাতে অতিশয় লজ্জিত ছিলেন। তাঁর কর্কশ ভাষার জন্য লোকে তাঁকে তিরস্কার করে। শাহাম্মত জং ও হাকিম আলি নকি খানকে আলিবর্দি হাবিব উল্লাহর গৃহে পাঠিয়ে তাঁকে দরবারে আনার ব্যবস্থা করেন। একটু কুণ্ঠার সঙ্গে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি শাহাম্মত জংকে তাঁর রক্ষক বলে ঘোষণা করে দরবারে আসেন এবং আলিবর্দির অনুগত থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে আলিবর্দি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর দপ্তরে মির হাবিবকে চাকরি দেওয়া হয়।

সম্রাটের দরবার থেকে আলা-উদ-দৌলার জন্য খিলাত নিয়ে আগমন, নবাব জাফর খান ও নবাব সুজা খানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য মুরিদ খানের আগমন এবং আলিবর্দিকে খিলাত প্রদান[৫] : প্রয়াত নবাব জাফর খান ও সুজা খানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায়ে [দিল্লির] সম্রাটের প্রেরিত নবাব মুরিদ খান নবাব আলা-উদ-দৌলার জন্য একটি বাদশাহি খিলাত নিয়ে পাটনা পৌঁছালে আলিবর্দি তাঁদের মধ্যকার আগের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে একটি পত্র লেখেন এবং পাটনাতে কিছুদিন যাত্রাবিরতি করতে অনুরোধ করেন।[৬] কিছুদিন পর বাঙলার শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করে আলিবর্দি মুরিদ খানকে বাঙলায় আসতে বলেন। কিন্তু তিনি যাতে মুর্শিদাবাদে না আসতে পারেন, সে জন্য তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আলিবর্দি নিজেই রাজমহল চলে যান। মুরিদ খানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কোনো কিছু বাড়িয়ে বা সংক্ষেপে না বলে নিজের ব্যাপারে যা ঘটেছিল, তার সবই মুরিদ খানকে তিনি বলেন। মুরিদ খান ছিলেন সে যুগের

ও কপটতাপূর্ণ ছিল, কিছুদিন পর দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানকে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত করে সেই রাজ্য অধিকার করে নেওয়ার ঘটনাই তা প্রমাণ করে।

৪. এই ব্যক্তিই পরবর্তীকালের কুখ্যাত মির হাবিব। তাঁর সম্বন্ধে পরে বর্ণনা আছে।

৫. দিল্লির সম্রাট মোহাম্মদ শাহর দরবারে নবাব সরফরাজ খানের জন্য মুরিদ খান মারফত যে খিলাত পাঠানো হয়েছিল, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত তা আলিবর্দিকে প্রদান করা হয়।

৬. এই ঘটনার বর্ণনা সমসাময়িক অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থেও আছে।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল[৭]। আলা-উদ-দৌলার জন্য আনা খিলাত আলিবর্দির গায়ে পরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান। কিছুদিন পরস্পরের কাছে যাওয়া-আসার ফলে এই দুই আমিরের মধ্যে বন্ধুত্ব নিবিড় হয়। নবাব সুজা খান ও নবাব সরফরাজ খানের পরিত্যক্ত সম্পদের কিছু অংশ আলিবর্দি সম্রাটকে দিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে পৌঁছে দেন তাঁর নিজের উপহারও।

[দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খানের[৮] অভ্যুত্থানের সংবাদ পাওয়া গেলে আলিবর্দি

---

৭. খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দীর গ্রিক মহাপণ্ডিত সক্রেটিস বর্তমান সভ্যতারও স্বাধীন চিন্তাধারার জনক। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন মহাপণ্ডিত প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও বর্তমান সভ্যতার স্থপতি। তাঁদের সঙ্গে মুরিদ খানকে তুলনা করা গ্রন্থকারের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮. দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন সুরাটের এক বণিকের পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মির্জা লুৎফউল্লাহ। তিনি বাঙলার সুবাদার সুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খানের এক স্ত্রীর (নবাব মুর্শিদ কুলি জাফর খানের কন্যা নন) গর্ভজাত কন্যা দুর্দানা বেগমকে বিয়ে করেন। নবাব সুজা-উদ-দীনের সুবাদারিকালে তাঁকে ঢাকার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হয়। পরে সুবাদারের সুপারিশে দিল্লির বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ তাঁকে মুর্শিদ কুলি খান রুস্তম জং উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে নবাব সুজা-উদ-দীনের পুত্র ও উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার তকি খানের মৃত্যু হলে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। সেই সঙ্গে হস্তলিপিতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী।

বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দি খান নবাব সরফরাজ খানকে হত্যা করে বাঙলার মসনদ অধিকার করলে অতিশয় স্বাভাবিক কারণে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানসহ সরফরাজ খানের উত্তরসূরিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যুক্তিসংগত কারণে এ জন্য তাঁদের দোষারোপ করা চলে না। কিন্তু মুর্শিদ কুলি খান যে বাঙলার সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেছিলেন, এমন কোনো বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ ধরনের বর্ণনা একমাত্র ইউসুফ আলি খান রচিত *তারিখ* ও আলোচ্য *মোজাফ্‌ফরনামা* গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তাঁদের বর্ণনা যে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই কাল্পনিক ইতিহাসকে ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এ সম্পর্কে *রিয়াজ*-এর নিরপেক্ষ বর্ণনায় (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৫৫-৫৭) আছে: 'মুর্শিদ কুলি খানকে পরাভূত করে ওডিসা (উড়িষ্যা) সুবা জয় করার জন্য মহাবত জং কোমর বাঁধলেন এবং সে জন্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে স্বীয় ভগ্নিপতি মির জাফর খান বাহাদুরকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন।...অতঃপর আলিবর্দির ভয়ে মুর্শিদ কুলি খান আত্মরক্ষার নিমিত্তে সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে হাজি আহমদ খানের জামাতা মুখলিস আলি খানকে (যিনি আগে থেকে মুর্শিদ কুলির কাছে ছিলেন) সন্ধি চুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য পাঠান। হাজি আহমদ ও আলিবর্দি খান তাঁর মারফত কূটনৈতিক কৌশলপূর্ণ পত্র পাঠিয়ে মুর্শিদ কুলিকে দুশ্চিন্তামুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। মুর্শিদ কুলির সেনাপতিদের মধ্যে গোপনে রাজদ্রোহের বীজ বপনের জন্য মুখলিস আলিকে নির্দেশ দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়।'

মুরিদ খানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁকে দিল্লিতে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে মুর্শিদ কুলি খানের বিদ্রোহ দমনের জন্য অগ্রসর হন। রুস্তম জং উপাধিধারী [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন নবাব সুজা খানের জামাতা ও উড়িষ্যার [নায়েব] সুবাদার।

আলিবর্দির উড়িষ্যা অভিযান ও রুস্তম জঙের পলায়ন: নবাব আলা-উদ-দৌলাকে হত্যা করে আলিবর্দির সুবাদারের মসনদে উপবেশন করার সংবাদ পেয়ে [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খান [রুস্তম জং] ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁর উপদেষ্টা ও সেনাপতিদের একত্র করে বলেন, 'বাঙলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমাধান এখনো যেমন হয়নি, তেমনি রাজধানীর মানুষ এখনো পুরোপুরি আলিবর্দি খানের অনুগত হয়নি। তাই আসুন, আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর শক্তি ধ্বংস ও আলা-উদ-দৌলার রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করি এবং সেটাই হবে সংগত।'[৯]

সুতরাং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে তিনি উড়িষ্যা থেকে বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হন। মুরিদ খানকে বিদায় জানিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে দমন করার উদ্দেশ্যে আলিবর্দি তাঁর সেনাবাহিনীসহ রাজমহল থেকে অগ্রসর হন। সুজা খানের সময় থেকেই সওলত জং ছিলেন রংপুরের ফৌজদার। তিনি তাঁর পিতৃব্যের [আলিবর্দির] সঙ্গে যোগদান করেন। দুজন সম্মিলিতভাবে উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হন। আলিবর্দি খান গ্রন্থকারের পিতাকে[১০] (এখন তিনি মৃত) [অশ্বারোহী বাহিনীর] অশ্বগুলোকে ছেঁকা দিয়ে চিহ্নিত (branding) ও সত্যায়িত করার দারোগার চাকরিতে নিযুক্ত করেন। তিনি শাহামত জং ও হাজি সাহেবকে রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে সাহসী হাবিব উল্লাহ খানকে এই দুজনের অধীনে নিযুক্ত করেন। আলিবর্দি নিজে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কুচকাওয়াজ

---

৯. করম আলির এ বর্ণনাকে নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অনুরূপ বর্ণনা ইউসুফ আলি রচিত *তারিখ*-এও (*তারিখ-ই*, পৃ. ২০) দেখা যায়। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিবর্দি বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন এবং মুর্শিদাবাদে তাঁর অবস্থানকে সুসংহত করে এর বেশ কিছুদিন পর তিনি উড়িষ্যা অভিযানে গিয়েছিলেন। [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খানের যদি সত্যি সত্যিই বাঙলা অধিকারের ইচ্ছা থাকত, তাহলে তিনি আলিবর্দির সিংহাসন অধিকারের পরপরই এই রাজ্য অধিকারে আসতেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থসহ সব গ্রন্থেই বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজের রাজ্য ছেড়ে এক পা-ও অগ্রসর হননি। অতএব আলোচ্য গ্রন্থকার ও ইউসুফ আলির বর্ণনা যে সর্বতোভাবে মিথ্যা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। *রিয়াজ*-এর নিরপেক্ষ বর্ণনাও তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। খুব সম্ভব করম আলি আরও কিছু যোগ করে ইউসুফ আলির বর্ণনা অনুসরণ করেই এই ইতিহাস লিখেছিলেন। ঘটনার সময় করম আলি ছিলেন পাঁচ বছরের বালক মাত্র।

১০. গ্রন্থকারের পিতার নামের উল্লেখ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি ছিলেন খুব সম্ভব আলিবর্দির মাতার দিক থেকে তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

করে অগ্রসর হন।

কটক থেকে তিন মঞ্জিল দূরে থাকা অবস্থায় আলিবর্দির শিবিরে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ব্যাপারটা ঘটেছিল অতি দ্রুতগতিতে তাঁর অগ্রসর হওয়ার কারণে। শেষ পর্যন্ত তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, একজন তামাক বিক্রেতা ক্রেতাদের চাপে একটি হাতির ওপর বসে বেচাকেনা করতে থাকে, যদিও সেই হাতিটি ছিল হস্তী বিভাগের দ্রব্যাদি বহন করার দায়িত্বে নিয়োজিত।[১১]

আলিবর্দির শিবির থেকে দুই বা তিন ক্রোশ দূরে নদীতীরে পরিখার মধ্যে অবস্থান করে [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আলিবর্দির শিবিরে তামাক বিক্রেতার কাহিনিসহ খাদ্যশস্যের চরম অনটনের কথা তাঁর শ্রুতিগোচর হলে তিনি মনে করেন যে, এই দুর্ভিক্ষের কারণে [আলিবর্দির] সেনাদল দুর্দশাগ্রস্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যে খাদ্যশস্যের সরবরাহ হলেই তারা তাদের শক্তি ফিরে পাবে। সুতরাং তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। অভিজ্ঞতার অভাবহেতু তিনি বেলা দ্বিপ্রহরে নদী অতিক্রম করে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন। তাঁর জামাতা বাকের আলি খানকে এক বিরাট সেনাবাহিনী দিয়ে অগ্রগামী দলের নেতা হিসেবে প্রেরণ করেন। হাজি সাহেবের আত্মীয়[১২] বখশি মুখলিস আলি খানকে বাকের আলি খানের সম্মুখ বাহিনীর নেতৃত্বে নিযুক্ত করেন।

আলিবর্দি খান তাঁর বীর সেনানীদের নিয়ে শ্রেণিবদ্ধভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। অভিজ্ঞতার অভাবহেতু মুর্শিদ কুলি খানের সৈন্যদল তাদের গোলন্দাজ বাহিনীকে পেছনে ফেলে এসে তাদের [সঙ্গে আনা] অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করতে থাকে। আলিবর্দির বাহিনী তাদের জিনসি ও দস্তি কামানগুলো সম্মুখভাগে রেখে যুদ্ধ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আলিবর্দির বাহিনীর গোলার আঘাতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং সুযোগমতো সব দিক থেকে আক্রমণ করতে করতে

---

১১. আলিবর্দির শিবিরে খাদ্যাভাবের অনুরূপ বর্ণনা *তারিখ*-এও (*তারিখ-ই*, পৃ. ২২১) দেখা যায়। খুব সম্ভব *তারিখ* থেকেই এই বর্ণনা গৃহীত।

১২. 'খোয়েশ' (خویش) শব্দ ব্যবহার করে গ্রন্থকার এখানে মুখলিস আলিকে হাজি আহমদের আত্মীয় বলে পরিচিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন হাজি আহমদের জামাতা। তিনি যে আলিবর্দির পক্ষে মুর্শিদ কুলি খানের সৈন্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে রত ছিলেন, সেই বর্ণনা একমাত্র *রিয়াজ*-এর নিরপেক্ষ বিবরণ (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৫৭-৬০) থেকে পাওয়া যায়। পরে কটক দখল করার পর আলিবর্দি তাঁকে উড়িষ্যাতেই পদস্থ রাজকাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর সম্পর্কে *রিয়াজ*-এ আছে (*রিয়াজ*, পৃ. ২৫৭), 'মুখলিস আলি খান প্রকাশ্যে তাঁকে (মুর্শিদ কুলি খান) নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করেন এবং গোপনে প্রলোভন দেখিয়ে মুর্শিদ কুলির সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজদ্রোহিতার বীজ বপন করেন।'

তারা বীরের মতো যুদ্ধ করে নিহত হয়। দস্তি গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা হায়দর আলি খানের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে আসে, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত সৈন্যদের [গোলার] আগুনে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উভয় পক্ষের যেসব সৈন্য কাছাকাছি থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিল, তারা তরবারি, বর্শা, তির ও ধনুকের সুব্যবহার করেছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু অধিকাংশ শত্রুসৈন্য নিহত হয়েছিল।

তাঁর সৈন্যদের মৃত্যুতে বাকের আলি খান ভগ্নহৃদয়ে তাঁর বখশি মুখলিস আলি খানসহ পলায়ন করে [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খানের কাছে উপস্থিত হন। তাঁরা দুজন একটি ভাড়া করা নৌকাতে চড়ে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে পলায়ন করেন। এই ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাঁরা নৌকাটি [আগে থেকেই] প্রস্তুত রেখেছিলেন। দুই শ কামান-বন্দুকসহ অসংখ্য মালপত্র আলিবর্দির হস্তগত হয়। তাঁর বেগমসহ [দ্বিতীয়] মুর্শিদ কুলি খানের হারেমের নারীকুল তাঁর সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় অরণ্যের ভেতর দিয়ে পলায়ন করেন এবং যারপরনাই দুর্ভোগ ও কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘকাল পর তাঁদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন।[১৩] ফকির উল্লাহ বেগ ও নুর উল্লাহ বেগকে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠানো হয়। বনাঞ্চলের কাছে এসে তাঁরা মুদ্রা ও অন্যান্য মালপত্র বোঝাই এক শতাধিক গাড়ি ও শকট হস্তগত করেন।[১৪] [ইতিমধ্যে] বেগম [ও তাঁর সঙ্গীরা] জঙ্গলে প্রবেশ করে গেছেন। তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করার আদেশ ছিল না বলে তাঁরা তাঁদের পেছনে আর অগ্রসর না হয়ে প্রাপ্ত মালপত্র অধিকার করে নেন। আলিবর্দি তাঁর বীর সৈন্যদের পুরস্কৃত করেন। এই যুদ্ধে মির মোহাম্মদ জাফর আলি ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে যুদ্ধ করেন এবং বীরের মতো যুদ্ধ করার সময় আঘাতপ্রাপ্ত হন। তিনি সীমাহীন অনুগ্রহ লাভ করেন।

উড়িষ্যা রাজ্য জয় করার পর আলিবর্দি সেখানে [ন্যায়] বিচারগত শাসনব্যবস্থার প্রচলন করেন। অনেক প্রজা এসে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তিনি সওলত জংকে[১৫] উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন।

---

১৩. এ প্রসঙ্গে *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ২৩) দ্র.। সেখানে বলা আছে, 'Boarded...a ship, that was kept ready for such a situation, along with their ladies and the belongings that they could collect.' *রিয়াজ* (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৬০) এবং *সিয়ার*-এও (*সিয়ার-বা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে। *সিয়ার*-এর বর্ণনা বেশি বিস্তারিত।

১৪. মালপত্র হস্তগত করার বর্ণনা *রিয়াজ* বা *সিয়ার*-এ নেই। কিছু পরিত্যক্ত মালপত্র আলিবর্দির হস্তগত করার কথা *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ২৩)-এ আছে।

১৫. হাজি আহমদের দ্বিতীয় পুত্র ও আলিবর্দির দ্বিতীয় কন্যা রাবেয়া বেগমের স্বামী সৈয়দ আহমদের উপাধি (বাদশাহ প্রদত্ত) ছিল সওলত জং (صولت جنگ), অর্থাৎ 'যুদ্ধে

অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সেনাপতি হাসান বেগ খানকে সওলত জঙের সহকারী হিসেবে রেখে আসেন, যাতে তাঁদের সম্মিলিত বিচারবুদ্ধি দিয়ে তাঁরা দেশ শাসন করতে পারেন।

[যুদ্ধে] বিজয়ী হয়ে আলিবর্দি খান বাঙলায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর বেগমের ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা মিরকের পুত্র কাশিম আলি খানকে বখশির পদ থেকে [সরিয়ে] রংপুরের ফৌজদারের পদে নিয়োগ করা হয়।[১৬] তখন পর্যন্ত মির মোহাম্মদ জাফর আলি খান[১৭] মাসিক ১০০ টাকা বেতনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর বীরত্বের জন্য তাঁকে প্রথম বখশির পদে নিয়োগ করে পুরস্কৃত করা হয়। দ্বিতীয় বখশির পদে নিয়োগ করা হয় ফকির উল্লাহ্ বেগ খানকে।[১৮] নবাবের মাতার দিক থেকে নিকট বা দূরের আত্মীয়ের মধ্যে যাঁরা অল্প বয়স্ক ছিলেন, তাঁদের মাসিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থকারের বয়স ছিল তখন মাত্র পাঁচ বছর। তাঁকে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে, অর্থাৎ এই ১১৮৬ হিজরি (১৭৭২ খ্রি.) সনে ইংরেজরা প্রবল না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থকার এই বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হননি।[১৯]

একইভাবে [মির মোহাম্মদ জাফর আলি খানের পুত্র] সাদেক আলি খান (মিরন), [গোলাম হোসেন আরজ বেগির পুত্রদ্বয়][২০] গোলাম আলি এবং খুররম আলিকেও বৃত্তি প্রদান করা হয়। শাহাম্মত জং ছিলেন সুবা বাঙলার দিওয়ান ও জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) অঞ্চলের শাসনকর্তা। শাহাম্মত জংকে সেখানে তাঁর

ভয়ংকর'। নবাব সুজা খান ও নবাব সরফরাজ খানের রাজত্বকালে তিনি রংপুর অঞ্চলের ফৌজদার ছিলেন। সেখানে তিনি অন্যায়ভাবে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৬. মূল ইংরেজি (পৃ. ২৬) পাঠ, 'Qasim Ali Khan, the son of Mirza Mirak, the brother's son of the Nawab Begam Sahiba.'

১৭. আলিবর্দির বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ বেগমের স্বামী ও ইরাকের নজফ শহরের সৈয়দ বংশীয় মির মোহাম্মদ জাফর খান যে তখন (১৭৪০-৪১ খ্রি.) পর্যন্ত মাত্র মাসিক ১০০ টাকা বেতনে আলিবর্দির অধীনে চাকরিরত ছিলেন, সে বর্ণনা এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেওয়া হয়েছে। এ তথ্য সমসাময়িক অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

১৮. আলিবর্দির পারিবারিক ভৃত্য (খান জাদাহ) ফকির উল্লাহ বেগ খানের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (য. না., পৃ. ১২ দ্র.)।

১৯. গ্রন্থকার করম আলি খান যে আলিবর্দির জননীর দিক থেকে তাঁর নিকটাত্মীয় ছিলেন—এ বর্ণনা তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে। আলিবর্দির নিজ গৃহে গ্রন্থকারের জনক ও জননীর বসবাস এবং সেই গৃহে গ্রন্থকারের জন্ম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আলিবর্দিদের সঙ্গে গ্রন্থকারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

২০. এই গোলাম হোসেনও যে আলিবর্দিদের ভৃত্য-জাতীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (তবে খান জাদাহ ছিলেন কি না তা সঠিকভাবে বলা যায় না), সে কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে (এই প্রসঙ্গে য. না., পৃ. ১২ দ্র.)।

দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। নবাব হাসান আলি খানকে[২১] তাঁর সহকারী নিযুক্ত করা হয়। শাহাম্মত জং[২২] আপসে সেখানকার প্রধান ব্যক্তিবর্গ ও জমিদারদের কাছ থেকে প্রভূত সম্পদ লাভ করেন। কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বাকের আলি খানের হাতে সওলত জঙের বন্দী হওয়া ও উড়িষ্যা অধিকার করার বার্তা [আলিবর্দির কাছে] আসে। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র পূর্ণ বর্ষাকাল থাকা সত্ত্বেও আলিবর্দি খান শাহাম্মত জংকে ঢাকা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং শীতকাল আরম্ভ হতেই তাঁকে প্রতিনিধি হিসেবে রাজধানীতে রেখে প্রচণ্ড গতিতে কটক অভিমুখে যাত্রা করেন।

---

২১. এই নবাব হাসান আলি খান যে সিরাজ-উদ-দৌলার হাতে প্রকাশ্যে নিহত বহুল আলোচিত হোসেন কুলি খান, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। স্যার যদুনাথ অনূদিত এই গ্রন্থে এ ব্যক্তিকে হাসান কুলি খান, হোসেন কুলি খান প্রভৃতি নামে দেখানো হয়েছে। হয়তো পাণ্ডুলিপির ত্রুটির জন্য এই বিভ্রান্তি। কিন্তু একই পৃষ্ঠায় এই বিভিন্ন বানানের নাম তিনি দিলেও পাদটীকায় কোনো মন্তব্য দেননি।

২২. শাহাম্মত জং পরিচিত ছিলেন নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান নামেও। এই পরিবারের বংশলতিকা আগে (প্রথম দিকে দ্র.) দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাকের আলির বিরুদ্ধে আলিবর্দির দ্বিতীয় অভিযান

মুর্শিদ কুলি খানের (দ্বিতীয়) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাকের আলি খান[১] একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উড়িষ্যা যান। উড়িষ্যার নিকটবর্তী হয়ে তিনি তাঁর পূর্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের কাছে দূত প্রেরণ করেন। এসব কর্মকর্তা তখন সওলত জঙের অধীনে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁদের কাছে তাঁর আগমনবার্তা ও পরিকল্পনার কথা জানান। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রলুব্ধ করে তাঁর দলে আনা হয়। হাসান বেগ খানের উপদেশে কান না দিয়ে সওলত জং [কটক] দুর্গ ও [সেই] অঞ্চল ওই সব কর্মকর্তার হাতে তুলে দেন। নিজে ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। হাসান বেগ খান তাদের পথে বাধা হবে জেনে এই দুর্বৃত্তের দল তাঁকে [কটকের] কদম রসুলের কাছে হত্যা করে[২]। তারপর সেখান থেকে অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর

---

১. *সিয়ার* (*সিয়ার-বা,* পৃ. ৪১৯) মতে, মির্জা বাকের খান ছিলেন ইরানের প্রাচীন সাফাভি রাজবংশের অধস্তন পুরুষ। তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান ও নবাব সুজা খান-তনয়া দুর্দানা বেগমের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

মির্জা বাকের ও তাঁর শ্বশুর দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে যে পুনরায় উড়িষ্যায় যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, তার উল্লেখ এখানে নেই। *তারিখ*-এর (*তারিখ-ই,* পৃ. ২৩) বর্ণনা মতে, তাঁরা কটক থেকে ৯ কি ১০ মঞ্জিল দূরে দাক্ষিণাত্যের কোনো এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন।

২. এ প্রসঙ্গে *তারিখ*-এর বর্ণনা (*তারিখ-ই,* পৃ. ২৪) দ্রষ্টব্য। সেখানে সওলত জঙের বিশ্বস্ত সেনাপতি গুজর খানের বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হওয়ার উল্লেখ আছে। আর এখানে হাসান বেগ খান নামের সেনাপতির নিহত হওয়ার কথা আছে। *সিয়ার*-এও (*সিয়ার-বা,* পৃ. ৪৩৭) 'গুজর খান' নামের সেনাপতিকে হত্যা করার কথা আছে।

হয়ে তারা সওলত জংকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানসহ বন্দী করে। তারা এ সংবাদ জানিয়ে বাকের খানের কাছে চিঠি লেখে। তিনি কাছাকাছি স্থানেই ছিলেন। তিনি [সেখানে] আসেন এবং সওলত জংকে হত্যা করতে চাইলে তাঁর স্ত্রী তাতে বাধা দেন। এভাবেই বন্দীদের জীবন রক্ষা করা হয়।

কিন্তু ১১৫৪ হিজরি (১৭৪১ খ্রি.) সনে আলিবর্দি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বাকের খানকে দুর্দশার উষর প্রান্তরে ভ্রমণ করতে বাধ্য করেন।

দ্রুতগতিতে অভিযান চালিয়ে কটক থেকে দুই কি তিন মঞ্জিল[৩] দূরে থাকতেই আলিবর্দি সংবাদ পান যে, [রাজধানী ছেড়ে] বাকের খান পালিয়ে গেছেন এবং সওলত জংকে একটি রথে[৪] আবদ্ধ করে সেখানে দুজন মোগল প্রহরীকে রাখা হয়েছে। সেই রথকে পাহারা দেওয়ার জন্য তেলেঙ্গা নামের[৫] একদল পদাতিক বাহিনী নিযুক্ত করে তিনি তাদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আলিবর্দির সেনাদল তাঁর কাছে আসতেই যেন সওলত জংকে হত্যা করা হয়। আর তা না হলে তাঁকে যেন [বাকের খানের কাছে] নিয়ে যাওয়া হয়। অতএব আলিবর্দি খান মোস্তফা খান ও ওমর খানকে বাতাসের চেয়েও দ্রুততর গতিতে সওলত জঙের কাছে পৌঁছে তাঁকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় উদ্ধার করার আদেশ দেন। আলিবর্দির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ আমিন খান[৬] এই দলের সঙ্গে যোগদানের প্রার্থনা জানালে

রিয়াজ-এ (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৬২) যে ভিন্ন ধরনের উক্তি আছে, তা নিম্নরূপ : বিদ্রোহী সেনাপতিগণ 'কাসিম বেগকে হত্যা করেন এবং হেদায়েত উল্লাহ আহত অবস্থায় পলায়ন করেন। নাগরিকগণ ও বিদ্রোহীরা একসঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে সওলত জংকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে তাঁর অনুচরবৃন্দ, আত্মীয়স্বজনসহ বন্দী করে তাদের সমস্ত মালমাত্তা লুণ্ঠন করে। তারপর মুর্শিদ কুলি খানের জামাতা মির্জা বাকের খানকে চিলকা হ্রদের অপর পাড়স্থ সিকাকুল থেকে ডাকিয়ে এনে উড়িষ্যার মসনদে বসায় এবং সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হয়ে মেদিনীপুর ও হিজলি অধিকার করে।'

গুজর খান ও হাসান বেগ খান একই ব্যক্তি হতে পারেন হয়তো।

৩. আরবি 'মনজিল' (منزل) শব্দের অর্থ, সৈন্যসামন্ত নিয়ে এক জায়গা থেকে যাত্রা করে দিনান্তে অন্য যে জায়গায় পৌঁছা যেত, সেটিকে 'মনজিল' বলা হতো। সাধারণ অর্থে মঞ্জিলকে গন্তব্যস্থানও বলা যেতে পারে।

৪. সংস্কৃত 'রথ' শব্দ বলতে সাধারণত শকটকে বোঝায়। এখানে এ শব্দ ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত। এই রথের কথা *তারিখ* ও *সিয়ার* উভয় গ্রন্থে আছে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব গ্রন্থের বর্ণনা প্রায় একই রকমের।

৫. ফিরিঙ্গিদের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষিণ ভারতীয় সৈনিকদের সাধারণত তেলেঙ্গা বলা হতো।

৬. তিনি ছিলেন আলিবর্দির বৈমাত্রেয় ভাই, খুব সম্ভব মির মোহাম্মদ জাফর খানের স্ত্রী শাহ বেগমের সহোদর ভ্রাতা।

আলিবর্দি তা মঞ্জুর করেন। আমিন খান দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হতে থাকেন। মোস্তফা খান এই হতভাগাদের নিকটবর্তী হলে বাকের খান ভীত হয়ে তাঁর বন্দীগণ ও পরিবার-পরিজনকে পরিত্যাগ করে আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে পলায়ন করেন। [বাকের খানের] পদাতিক বাহিনীর প্রহরীগণ রথে কয়েকবার বর্শার আঘাত করার পর তাতে বন্দীর মৃত্যু হয়েছে মনে করে তারা পালিয়ে যায়। দুজন মোগল প্রহরীর মধ্যে একজন তেলেঙ্গাদের বর্শার আঘাতে মারা যায় এবং অন্যজন রথ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ঝাঁপ দিলে আলিবর্দির লোকেরা তাকে হত্যা করে। অনুসন্ধানের পর মোস্তফা খান সওলত জংকে রথের ভেতরে আবিষ্কার করা হয় এবং আমিন খানের কাছে তাঁকে সোপর্দ করে তিনি বাকের খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু তাঁর কাছে যেতে না পেরে তিনি ফিরে আসেন।[৭]

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিরাপদ অবস্থায় পেয়ে আলিবর্দি অত্যন্ত উৎফুল্ল হন। তিনি কটকে দিন কয়েক দরবার বসান এবং মুখলিস খানকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করে প্রত্যাবর্তনের জন্য অগ্রসর হন। বালেশ্বরে পৌঁছে তিনি মারাঠাদের আগমন ও মুখলিস খানের অসুস্থতার সংবাদ পান। শেখ মাসুমকে এই সুবার প্রধান সেনাপতি ও [রাজা জানকীরামের পুত্র] রাজা দুর্লভরামকে নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করে তাঁদের নিজেদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রেরণ করেন। [অতঃপর] তিনি নিজে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন।[৮] মেদিনীপুরে এসে তিনি সওলত জংকে তাঁর মাতা-পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগে আগেই পাঠিয়ে দেন এবং তিনি নিজে তাঁর সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। পাশাপাশি মারাঠাদের সম্বন্ধে সংবাদ গ্রহণ করতে

---

৭. সওলত জংকে উদ্ধারের ব্যাপারে *রিয়াজ*-এ (*রিয়াজ-বা,* পৃ. ২৬৩) বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এর কিছু অংশ নিম্নরূপ: '...সওলত জংকে ঝালর দিয়ে ঘেরা একটি রথে বসান এবং মুর্শিদ কুলি খানের ভ্রাতা মোহাম্মদ আমিনকে উন্মুক্ত ছোরা হস্তে সেই রথে সঙ্গীরূপে বসিয়ে দেন। দুজন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যকে রথের দুপাশে রেখে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, যদি মহাবত জঙের সৈন্যরা তাদের নাগাল পায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ যেন সওলাত জংকে ছোরা ও বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয় এবং তিনি যেন কোনোক্রমেই পালাতে না পারেন।...'

এই দীর্ঘ বর্ণনা শেষে দেখা যায় যে, মোহাম্মদ আমিন খান আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কোনোমতে অশ্বারোহণে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। সওলত জংকে দৈবক্রমে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

সিয়ার-এর বর্ণনা (*সিয়ার-বা,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১-২৩) আরও বিস্তারিত। তাতে সামান্য অথচ নতুন তথ্য আছে।

৮. প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে *তারিখ* (*তারিখ-ই,* পৃ. ২৭) দ্র.।

থাকেন। তাঁর বর্ধমান চাকলাতে পৌঁছার পর মারাঠারা সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং তারা তাঁর পুরো বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। বন্ধ করে দেয় তারা খাদ্য সরবরাহের পথ। ফলে দুই-তিন দিন ধরে আলিবর্দির শিবিরে কুড়ি টাকা সের দরেও কোনো খাদ্যশস্য পাওয়া যায়নি।

মারাঠাদের আক্রমণ, তাদের পরাজয়[৯], পলায়ন এবং তাদের সঙ্গে হাবিব উল্লাহ্ খানের যোগদান : বলা হয়ে থাকে যে, রুস্তম জং জাহাজযোগে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গিয়ে নিজাম-উল-মুলকের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেন। নিজাম-উল-মুলক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে [মারাঠাদের মনোবৃত্তি জেনে] বাঙলার অর্থ ও সম্পদের প্রতি লোভ দেখিয়ে তাদের কাছে গোপনে চিঠি লেখেন।[১০]

মারাঠা সরদারগণ সসৈন্যে বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে শেখ মাসুম ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের হত্যা ও রাজা দুর্লভরামকে বন্দী করেন। উপরন্তু বর্ধমানে আলিবর্দির সেনাবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করার পর তাদের বাঙলায় আগমনের ব্যয় বাবদ [আলিবর্দির কাছে] ১ কোটি টাকা চৌথ[১১] দাবি করে। মারাঠাদের অতর্কিত আগমন ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে নিজের প্রস্তুতির অভাবের কথা বিবেচনা করে আলিবর্দি প্রথমে চৌথ ও [সেই সঙ্গে] অন্য দ্রব্যাদি দিতে সম্মত হন এই ভেবে যে, তাতে আপাতত বিনা যুদ্ধে এই শয়তানদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর চোখের মণি ও রাজ্যের প্রদীপ সিরাজ-উদ-দৌলাকে মারাঠারা প্রতিভূরূপে[১২] দাবি করলে আলিবর্দি আল্লাহর সাহায্যের ওপর

---

৯. মারাঠাদের পরাজয় ঘটেনি। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, তাঁবু ও তাঁবুর সব মালপত্র হারিয়ে এবং বহু সৈন্য খুইয়ে আলিবর্দিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল। অথচ সত্যান্বেষী করম আলি খান এটিকে আলিবর্দির বিজয় বলেছেন।

১০. মারাঠারা যে নিজাম-উল-মুলকের প্ররোচনায় বাঙলায় লুটতরাজ করতে এসেছিল, এ তথ্য *তারিখ*-এও (*তারিখ-ই*, পৃ. ২৭) পাওয়া যায়। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠারা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। রাজধানীতে শক্তির দ্বন্দ্বে সুবিধা করতে না পেরে দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল-মুলক বাঙলার নবাবের মতো প্রায় স্বাধীনভাবে আচরণ করতে শুরু করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য মারাঠাদের বাঙলায় লুটতরাজে উসকানি দেন। এই ব্যাপারে *সিয়ার*-এ বিস্তারিত বর্ণনা আছে (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৭৮)।

১১. কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের দুর্বলতা, অমাত্যদের লোভ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে বিদ্রোহী মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব দাবি করলে মোগল সম্রাট বাধ্য হয়ে তা দিতে স্বীকার করেন। মারাঠারা বাঙলাতেও সেই চৌথ দাবি করে (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৭৮ দ্র.)।

১২. মারাঠাদের এই শর্তের উল্লেখ শুধু আলোচ্য গ্রন্থেই আছে, সমসাময়িক অন্য কোনো ইতিহাস গ্রন্থে নেই।

নির্ভর করে তাঁর সামরিক নেতাদের একত্র করে বেপরোয়া হয়ে বললেন, 'আমি মারাঠাদের যা দিতে যাচ্ছি, তা আপনাদের পুরস্কার হিসেবে দেব না কেন? সমগ্র মারাঠা বাহিনীকে আল্লাহ এক নিমেষের মধ্যে ও একটি আদেশের বলে জাহান্নামে পাঠাতে পারেন।'

আলিবর্দির এ কথা শুনে তাঁর সেনাপতিগণ আমরণ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমস্ত সেনাপতি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অতীব প্রশংসনীয়ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন। দুই-তিন দিন ধরে এ ধরনের প্রলম্বিত যুদ্ধের পর আমাদের সেনাবাহিনীর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে [মারাঠারা] পলায়নপর হয়ে শহর ও গ্রাম লুণ্ঠন করতে থাকে।[১৩] হাবিব উল্লাহ খান[১৪] এই অভিযানে আলিবর্দির সঙ্গে ছিলেন। তিনি নিহত হয়েছেন—এই মিথ্যা সংবাদ রটনা করে নিজেকে সেনাবাহিনী থেকে দূরে রাখেন। আগে থেকেই তিনি ছিলেন আলিবর্দির পরিবারের শত্রু। মারাঠারা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। রাজধানী লুণ্ঠন করার জন্য তিনি মারাঠাদের প্ররোচিত করেন এবং [তাদের কাছ থেকে] ২-৩ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে তিনি নিজের গৃহে যান এবং তাঁর ভাইকে তাঁর সঙ্গে নেন। কিন্তু আলি জওয়াদ খান ও আতাউল্লাহ খানের বিরোধিতার কারণে তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেননি। এরপর জগৎশেঠের বাড়িতে হানা দেন এবং তিনি ৩ লাখ টাকা লুট করে নদীর তীরে ভেড়ানো নৌকাতে বোঝাই করে নগর থেকে বের হয়ে আসেন। পরদিন শাহাম্মত জং ও হাজি সাহেব নগর রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে, এর পর থেকে মারাঠারা আর নগরে প্রবেশ করতে পারেনি।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে মারাঠারা আলিবর্দিকে আক্রমণ করত এবং তাদের হাজার হাজার লোক নিহত হওয়ার পর সন্ধ্যাকালে তারা পালিয়ে যেত। এসব বিশৃঙ্খলার মধ্যে আলিবর্দি কাটোয়া পৌঁছে রাজধানী ও জগৎশেঠের গৃহ লুণ্ঠনের সংবাদ পান। কালবিলম্ব না করে তিনি পূর্ণ বর্ষাকালের মধ্যেই দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে মারাঠাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে একে রক্ষা করেন। পথশ্রমের ক্লান্তি লাঘবের জন্য তিনি দুই কি তিন দিন বিশ্রাম গ্রহণ

---

১৩. এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন *তারিখ* রচয়িতা ইউসুফ আলি খান এবং তাঁর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই (*তারিখ-ই*, পৃ. ২৭-৩৬ দ্র.) করম আলি, *সিয়ার* রচয়িতা ও অন্যরা সেই ইতিহাস লিখেছেন। করম আলির বয়স ছিল তখন ছয় বছর মাত্র।

১৪. তিনি হচ্ছেন বহু ঘটনার নায়ক মির হাবিব। অশিক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও চতুর সেনাপতি। ছিলেন খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বহু অত্যাচার চালান। তবে শেষ পর্যন্ত মারাঠারাই তাঁকে হত্যা করে।

করেন। তারপর মারাঠাদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বের হয়ে পড়েন এবং রাজধানীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। বন্যার পানি যাতে নগরকে স্পর্শ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ভাগীরথীর তীরে বাঁধ নির্মিত হতো। আলিবর্দি আতাউল্লাহ্ খান (সাবিত জং) ও মোস্তফা খান বাবর জংকে পলাশীতে পাঠিয়ে সেখানে বাঁধ কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই বাঁধ কেটে দেওয়ার কারণে নগরের দক্ষিণাংশ প্লাবিত হওয়ায় শত্রুসৈন্যের আগমন প্রতিহত হয়।[১৫]

মারাঠারা কাটোয়াতে সমবেত হয়েছে শুনে আলিবর্দি ভাগীরথী অতিক্রম করে সেদিকে অগ্রসর হন। হাবিব উল্লাহ খান ওলন্দাজদের কাছ থেকে কয়েকটি কামান, এক মাস্তুলের সজ্জিত একটি জাহাজ সংগ্রহ করেন। সেই জাহাজ থেকে আলিবর্দির সেনাবাহিনীর ওপর কামানের গোলা বর্ষণ করেন। 'জিনসি' গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা মির্জা দওয়ার কুলি নিজে গুলি করে সেই যুদ্ধজাহাজটি ডুবিয়ে দেন। কাটোয়ার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত অজয় নদের তীরে আলিবর্দি [নৌকা দিয়ে] একটি সেতু নির্মাণ করে[১৬] তাঁর সেনাবাহিনীকে রাতের বেলা সেই সেতু অতিক্রম করার আদেশ দেন। শমশির খান ও সরদার খান [সসৈন্যে] সেতু অতিক্রম করার পর সেতুটি মাঝখান থেকে ভেঙে পড়লে মধ্যরাতে এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ও কলরবের সৃষ্টি হয়। আলিবর্দি পদব্রজে কাদামাটি ভেঙে সেতুর কাছে যান, সৈন্যদের সান্ত্বনা দেন এবং সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই সেতুটি পুনর্নির্মাণ করে সেনাবাহিনীকে তা অতিক্রম করার আদেশ দেন। আমাদের সেনাবাহিনীর উচ্চ রবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মারাঠারা তাদের মালসামানা পরিত্যাগ করে পলায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কাটোয়ার যুদ্ধ : উভয় সৈন্যবাহিনীই নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং নবাবের সেনাদলের মধ্যে বিপর্যয় সমুপস্থিত বলে মনে হয়। সে সময় মোস্তফা খান তরবারি হাতে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁর পশ্চাদ্বর্তী সৈন্যদল শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আফগানরা শর বৃষ্টি করে। আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধে জয়লাভ করলে মারাঠারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এমন নিরাশ

---

১৫. এই বাঁধ কেটে দেওয়ার বর্ণনা সমসাময়িক আর কোনো ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মারাঠাদের বিরুদ্ধে আলিবর্দির এই প্রথম যুদ্ধের বর্ণনা এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনা যে ইউসুফ আলি রচিত *তারিখ* গ্রন্থে বিশদভাবে দেওয়া আছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। *রিয়াজ*-এর বর্ণনাও (*রিয়াজ-বা,* পৃ. ২৬৬-৭৩) বেশ বিশদ।

১৬. এই সেতু নির্মাণ, রাত্রিকালে সেখানে দুর্ঘটনা ঘটা ও পরাজিত হয়ে মারাঠাদের পলায়নের কথা সমসাময়িক প্রায় সব ঐতিহাসিকের বিবরণেই পাওয়া যায়।

হয়ে পলায়ন করে যে, উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত চিলকা হ্রদ পর্যন্ত তারা অশ্বের লাগাম টেনে ধরেনি। আলিবর্দি দ্রুতবেগে তাদের পেছনে ধাওয়া করেন। তাদের সমবেত হওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়ে তিনি কটক পর্যন্ত অগ্রসর হন। এ সময় বাবর জঙের ভ্রাতুষ্পুত্রকে[১৭] উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করে আলিবর্দি দলবলসহ রাজধানীতে ফিরে আসেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য নগরবাসী পথে বের হয়ে আসে এবং তাঁর কাছ থেকে অশেষ অনুগ্রহ লাভ করে। যেসব সৈন্য সেতু অতিক্রম করার সময় ডুবে যায়, তাদের আত্মীয়স্বজনকে এবং যুদ্ধের সেনাপতি ও সমস্ত সৈন্যকে তিনি রক্তের মূল্য হিসেবে ৩ লাখ করে টাকা প্রদান করেন। গ্রন্থকারের পিতা পানিতে ডুবে যাওয়া সৈন্যদের ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষা করেন বলে তিনি পুরস্কারস্বরূপ একটি হস্তী লাভ করেন।[১৮]

১৭. আলিবর্দির আফগান সেনাপতি (পরে বিদ্রোহী) গোলাম মোস্তফা বাবর জঙের ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম আবদুল আজিজ।

১৮. গ্রন্থকারের পিতার নামের উল্লেখ গ্রন্থের কোথাও দেখা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাস্কর ও অন্যান্য মারাঠা সেনাপতিকে নৃশংসভাবে হত্যা[১]

আলিবর্দি চৌথের দাবির উত্তর তরবারির সাহায্যে দিয়েছেন শুনে মারাঠাদের নেতা রাজা ভাস্করকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন এবং আলি ভাই দিওয়ানকে[২] আপস-মীমাংসার দায়িত্ব দিয়ে তাঁদের বাঙলায় প্রেরণ করেন। তাঁরা যেসব জায়গায় যায়, সেখানেই লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। রাজা জানকীরাম তাঁর বন্দী পুত্র দুর্লভরামের মুক্তির জন্য দূত প্রেরণ করলে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। একই দূতদের মাধ্যমে চৌথের সমাধানকল্পে আলি ভাইয়ের কাছে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। আলি ভাইকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর প্রভু। তিনি রাজা জানকীরামের মাধ্যমে আলিবর্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অশেষ অনুকম্পা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের মাধ্যমে আলি ভাইয়ের হৃদয় জয় করেন নবাব। বিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। রাজা জানকীরাম ও বাবর জংকে নবাবের

---

১. *তারিখ* ও *সিয়ার*-এ বর্ণিত ঘটনাবলির ধারাবাহিকতার সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলির ধারাবাহিকতার মিল নেই। *তারিখ*-এর বর্ণনা এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সেই বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য। দেখা যায় যে, এর আগে মারাঠারা আরও দুবার বাঙলা আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনার বর্ণনা *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৪৬–৯৪) এবং *রিয়াজ*-এ (পৃ. ২৭৯-৭১) দ্রষ্টব্য। আলোচ্য গ্রন্থের বর্ণনা প্রমাদপূর্ণ।

২. আলি ভাই (علی بھائی) সম্পর্কে *রিয়াজ*-এ (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৭৩) বলা হয়েছে: 'মহাবত জং কূটকৌশলে অন্যতম মারাঠা নেতা আলি কারাওয়ালের (যিনি আগে মারাঠা ছিলেন ও পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় নাম হয়েছিল আলি ভাই) সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন।'

দূত হিসেবে ভাস্করের কাছে প্রেরণ করা হয়।

এই দুই ব্যক্তি রাজা ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে শপথ গ্রহণ করে বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করেন। ভাস্করের কাছে আলিবর্দি খান প্রেরণ করেন অনেক উপঢৌকন। এতে ভাস্কর অসতর্ক হয়ে পড়েন।

রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন শাসকের জন্য যেকোনো সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ প্রশংসনীয় বিষয় বলে নবাব প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর যথোচিত আদব-কায়দা বজায় রেখে ভাস্করের সঙ্গে নবাব সাক্ষাতের প্রস্তাব দেন এবং মনকরা নামের প্রশস্ত স্থানে তাঁর শিবির স্থাপনের আদেশ দেন। সাক্ষাতের দিন নবাব বড় ধরনের ফৌজ নিয়ে তাঁর তাঁবুতে অপেক্ষায় থাকেন। মির মোহাম্মদ জাফর আলি খানকে কয়েকজন অশ্বারোহীসহ তাঁবুর প্রবেশপথে মোতায়েন করা হয়। হায়দর আলি খানকে তাঁর বন্দুক-কামানসহ রাখা হয় প্রবেশপথ বরাবর তাঁর নিজের তাঁবুতে এবং মির্জা দওয়ার আলি খানকে রাখা হয় মারাঠাদের পেছনে। তারপর (এত সব ব্যবস্থা করে) নবাব মারাঠা সেনাপতিদের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকেন। প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে জনসাধারণের কোনো ধারণা না থাকায় (মারাঠাদের আগমনের) এই ঘটনা দেখার জন্য প্রচুর লোকসমাগম হয়। ফলে প্রখর রৌদ্রেও পথঘাট বন্ধ হয়ে যায়।

রাজা ভাস্কর বাবর জং ও রাজা জানকীরামের সঙ্গে অশ্বারোহণে আসার সময় তাঁর সেনাবাহিনীকে আলিবর্দির শিবির থেকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে রেখে আসেন। নবাবের তাঁবুতে আসেন মাত্র ১২ জন[৩] সেনাপতি ও আলি ভাইকে নিয়ে। ভাস্করের ওপর আলিবর্দির দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া মাত্র তিনি আদেশ দেন বস্ত্রাদির প্রান্তদেশ মুড়ে সেলাই করার মতো তাঁদের যেন শেষ করে ফেলা হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ যেন নিস্তার না পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্যরা মারাঠাদের হত্যা করে। রাজা ভাস্করের শির ছিন্ন করে বর্শাফলকে বিদ্ধ করা হয়। ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয় তাঁর দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে আলিবর্দি একটি সুবৃহৎ হস্তীর ওপর আরোহণ করে মারাঠাদের বিতাড়িত করার জন্য অগ্রসর হন। তাঁর আদেশে বাবর জং ও ওমর খান নেতাহীন মারাঠাদের ওপর আক্রমণ চালান। অসংখ্য তরবারির ঝলকানি দর্শকদের চক্ষু ঝলসে দেয় এবং সংখ্যাহীন তির শত্রুদের মুখমণ্ডলে বিদ্ধ হয়। সমতল ভূমির ওপর মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়ে থাকে। মোস্তফা খান ও রাজা জানকীরাম ছাড়া আর কেউ এই পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না বলে

---

৩. *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৪৬) ১৯ জন, *রিয়াজ*-এ (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৭৫) ও *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪) ২২ জন সেনাপতির কথা বলা আছে।

তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকজন হতবাক হয়ে যায়। তারা ভয়ে পালিয়ে যায় আলিবর্দির প্রস্থানের পর। হাজি সাহেব তাঁর দূরদৃষ্টি বলে আলিবর্দিকে বলেন, 'আজ থেকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তুমি নিজের জন্য শত্রু সৃষ্টি করলে!'[৪]

তাঁর জীবন বিপন্ন করে তিনি অনেকবার অনেক কাজের ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলে ১১৪৫ হিজরি (১৭৪৩-৪৪ খ্রি.) সনে মোস্তফা খানকে অনেক অনুগ্রহ প্রদান করা হয় ও ভূষিত করা হয় 'বাবর জং'[৫] উপাধিতে। অন্যান্য সৈন্যকেও সীমাহীন পুরস্কার দেওয়া হয়। সেইবার আলিবর্দি মারাঠাদের পেছনে পেছনে মেদিনীপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু বর্ষাকাল আরম্ভ হওয়ায় তিনি রাজধানীতে ফিরে আসেন।

এই অভিযান থেকে ফিরে আসার পর বাঙলায় শান্তি বজায় থাকলেও সওলত জং হুগলীতে গেলে আবগারি শুল্ক নিয়ে জার্মানদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটে। সওলতের প্রতিনিধি সুজন সিংহ কঠোরভাবে তাঁর দাবি আদায় করার কারণে তাদের সবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। পরিণতির কথা চিন্তা না করেই জার্মানরা মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং অন্য ইউরোপীয়দের মতো রাত্রিকালে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করে। হুগলী দুর্গের পেছনে ছিল তাদের গির্জা। সেখানে যাওয়ার অজুহাতে প্রায় ৫০ জন জার্মান কয়েকটি মইয়ের সাহায্যে নৌকায় উঠে মধ্যরাতে তাদের কারখানা থেকে নদীপথে বের হয়ে পড়ে এবং দুর্গে প্রবেশ করার অভিপ্রায়ে সাহসিকতার সঙ্গে সেদিকে অগ্রসর হয়। প্রহরীরা, বিশেষ করে জেগে থাকা বন্দুকধারী প্রহরীরা তাদের বাধা দেয়। ফলে ইউরোপীয়রা নিরাশ হয়ে প্রভাতের দিকে নৌকায় আরোহণ করে প্রত্যাবর্তন করে। সওলত জং হাসান রেজা খান ও সওলত জঙের সহকারী সুজন সিংহকে শক্তিশালী সেনাদল সঙ্গে দিয়ে সওলত জং জার্মানদের কারখানা অধিকার করার জন্য পাঠান। বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে এই জার্মান সাহেবরা নদী অতিক্রম করে আমিন চাঁদের বাগানে এসে অলসভাবে বসে ছিল।

জার্মানদের মধ্যে দুই ব্যক্তি নিজেদের ফরাসি[৬] বলে পরিচয় দিয়ে দুর্গে আসে

---

৪. হাজি আহমদের মতো অতি নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষের মুখ থেকে এমন উক্তি প্রকাশ বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর চরিত্রে যত দোষই থাকুক না কেন, তিনি যে একজন মানুষ ছিলেন, এ উক্তিই তার প্রমাণ বহন করে। দুর্বৃত্ত হলেও তিনি যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তা স্বীকার করতেই হয়।

৫. সম্রাট মোস্তফা খানকে 'বাবর জং' (ببر جنگ), অর্থাৎ 'যুদ্ধে ব্যাঘ্র' উপাধি আলিবর্দির সুপারিশে প্রদান করেন।

৬. ইংরেজি পাঠ Frenchmen-এর পর (বন্ধনীতে) banam-i-farasis (بنام فراسیس) শব্দ দুটি আছে।

এবং দুর্গ থেকে যাওয়া-আসার পথগুলো পর্যবেক্ষণ করে মধ্যরাতে তারা কারখানা থেকে বের হয়ে এসে ঘুমন্ত সৈনিকদের ওপর আক্রমণ চালায়। সৈনিকেরা অন্যদের কথা একবারও চিন্তা না করে তাদের পরিখা পরিত্যাগ করে পলায়ন করে।[৭]

এ সংবাদ পেয়ে আলিবর্দি এই দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর বখশি মির মোহাম্মদ জাফর খানকে পাঠান। তিনি এসে জার্মানদের কারখানা ঘেরাও করেন। জার্মানরা আতঙ্কিত হয়ে কারখানা পরিত্যাগ করে জাহাজে চড়ে চলে যায়। লোকে এখনো বিশ্বাস করে যে, মির মোহাম্মদ জাফর আলি খান ১০ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে জার্মানদের জাহাজে চড়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।[৮] সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত (১৭৭১ খ্রি.) এই ৩০ বছরের মধ্যে জার্মানদের আর কোনো কারখানা স্থাপন করতে দেওয়া হয়নি। এ বছরই আলিবর্দি সাহায্য প্রার্থনা করে সম্রাটের কাছে আবেদনপত্র পাঠান।[৯]

---

৭. জার্মানদের এই আক্রমণের বর্ণনা খুবই খাপছাড়া বলে বাংলা অনুবাদে তা খুব পরিষ্কার করা সম্ভব হলো না।

৮. মির মোহাম্মদ জাফর খান গোড়া থেকেই যে নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ ছিলেন, করম আলি খানের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে।

৯. সম্রাট মোহাম্মদ শাহর কাছে আলিবর্দি খানের এই সাহায্য প্রার্থনার আবেদন ছিল ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। কিন্তু করম আলি খান ঘটনাবলি ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে হঠাৎ এই বাক্য সংযোজন করে দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ভাস্কর হত্যার প্রতিশোধের জন্য রঘুজির আগমন—সম্রাটের আদেশে আলিবর্দির সাহায্যে বালাজি রাওয়ের আগমন

তাঁর সেনাপতিকে হত্যার পর ১১৫৬ হিজরি (১৭৪৩-৪৪ খ্রি.) সনে কমবেশি ১ লাখ সৈন্য নিয়ে রঘুজি বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হন। 'লুণ্ঠনকারী'[১] বলে পরিচিত হিন্দুস্থানের এমন এক গোষ্ঠীতে রঘুজির জন্ম।[২]

আলিবর্দির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহায্যের জন্য নিযুক্ত বালাজি রাও ৭০ হাজার সৈন্য নিয়ে [বাঙলা অভিমুখে] অগ্রসর হন। [মারাঠাদের] এই দলটি হিন্দুস্থানের সম্রাটের অনুগত ছিল। দুটি বিদেশি সৈন্যদলের [একই সময়ে] আগমনের সংবাদ পেয়ে আলিবর্দি বিহার থেকে জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জং ও হুগলী থেকে সৈয়দ আহমদ খান সওলত জংকে ডেকে পাঠান। এরপর ৭০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং প্রায় ১ লাখ বরকন্দাজ (বন্দুকধারী

---

১. মূল ফা. পাঠ Ghanim (খুব সম্ভব আরবি غنيم) ছিল বলে স্যার যদুনাথ (য. না., পৃ. ৩২) বলেছেন। তাঁর মতে, এই শব্দের অর্থ 'Ghanim, plunderers ie Marathas')। আরবি (غنيم) শব্দের মূল অর্থ 'plunder' এবং অন্য অর্থ 'plunderer,' 'enemy taker of spoils' etc.।

২. *তারিখ*-এর বর্ণনা মতে (*তারিখ-ই*, পৃ. ৪২) ভাস্করের মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে রঘুজি আরও একবার বাঙলাতে এসেছিলেন এবং বালাজি বাজি রাওয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ আলির বর্ণনা বেশি গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যায়। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা করম আলি খান খুব সম্ভব ভুল করে রঘুর দ্বিতীয়বারের আগমনকে প্রথমবারের ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনার সময় করম আলি ছয় কি সাত বছরের বালক মাত্র ছিলেন।

সৈন্য) ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে দুই [বিদেশি] সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্যে আলিবর্দি নির্ভয়ে অগ্রসর হন।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর বালাজি রাও ঠিক করেন যে, দুই বাহিনী একে অন্য থেকে এক ক্রোশ ব্যবধানে থাকবে এবং দুই পক্ষের সেনাপতিগণ তাঁদের সৈন্যদলকে পেছনে রেখে মধ্যবর্তী একটা জায়গায় মিলিত হবেন। মোস্তফা খান, শমশির খান, সরদার খান, ওমর খান, হায়দর আলি খান, দওয়ার আলি খান, রহম খান, মির মোহাম্মদ জাফর আলি খান, ফকির উল্লাহ বেগ খান ও অন্যান্য সেনাপতিকে আলিবর্দি এই আদেশ দেন যে, সাক্ষাৎকালে ও বিজয় পতাকা নামিয়ে ফেলার সময় প্রকৃত যুদ্ধকালের মতো তাঁরা যেন তাঁদের সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত রাখেন এবং তাঁরা এমন অবস্থায় বালাজি রাওকে অভ্যর্থনা করতে যাবেন যাতে সৈন্যদের সংখ্যা, বিন্যাস ও সেনাপতিদের দক্ষতা দেখে তাঁর মনে রেখাপাত করে। তাঁরা সে অনুসারেই কাজ করেন।[৩]

সেদিন অসংখ্য সৈন্যসমাবেশের কারণে এবং তাদের পদচারণের ফলে যে ধূলি উত্থিত হয়, তাতে মানুষের পক্ষে পথের রেখা চিনতে কষ্ট হয়। এই অবস্থায় দুই প্রধান তাঁদের শিবিরের নিকটবর্তী স্থানে (এসে) একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁরা নিজ নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করেন। আলিবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজ-উদ-দৌলা বালাজি রাওয়ের সঙ্গে মাথার পাগড়ি বদল করেন। সিরাজ-উদ-দৌলা বালাজি রাওয়ের পুত্রস্থানীয় বলে গণ্য হন। আলিবর্দি ও বালাজি একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করেন এবং কীভাবে রঘুজির উপদ্রব ও শত্রুতার অবসান ঘটানো যায়, তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে ত্বরিতগতিতে শত্রুকে দমন করার অভিপ্রায়ে বালাজি রাও একাই যাত্রা করেন। তিনি কটক[৪] (গঙ্গা) পর্যন্ত রঘুজির পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাঁর বহু সৈন্য হত্যা করে নিরাপদে ফিরে আসেন। আলিবর্দি বালাজি রাওকে কয়েক লাখ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং সেই টাকা তিনি দিয়ে দেন তখনই। তিনি তাঁকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করেন। বালাজি রাও হৃষ্টচিত্তে ফিরে যান।[৫]

বর্ষাকাল সমাগত বলে রঘুজি সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে (আলিবর্দির কাছে) দূত প্রেরণ করেন। আলিবর্দি দূতকে বলেন, 'বালাজি রাও এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আমি তাঁকে অনেক টাকা দিয়েছি। চার বছর ধরে আমাদের ও

---

৩. এখানে মূল পাঠে খুব সম্ভব কিছু ক্রটির কারণে অনুবাদক কিছু শূন্যস্থান রেখেছেন।

৪. অনুবাদক স্যার যদুনাথ কটক পাঠের সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বন্ধনীতে গঙ্গা (Ganges?) পাঠ দিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন।

৫. *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৪৪) এই বর্ণনা আরও বিস্তারিত। করম আলির বর্ণনা শুধু সংক্ষিপ্ত নয়, বিভ্রান্তিকরও বটে।

আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে। আমি আপনাদের উচ্চপদস্থ অনেক সেনাপতিকে হত্যা করেছি (আপনারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেননি)। অবশ্য আপনারা আমার রাজ্যের অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেও কোনো উল্লেখযোগ্য 'ফায়দা' বা লাভ আপনাদের হয়নি। সুতরাং এটাই সংগত যে আমরা একত্রে বসে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি এবং আপনাদের (উপযুক্ত) উপঢৌকন দিয়ে বিদায় দিই।'[৬]

রঘুজি এই মর্মে উত্তর পাঠিয়ে দিলেন, 'আপনার ও আমার মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আপনি আমার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে যুদ্ধ বন্ধ করুন এবং সেটাই বিধেয়।'

চুক্তির কথাবার্তা নিয়ে কিছুদিন অতিবাহিত হয় এবং কোনো পক্ষ থেকেই এ সময় কোনো ধরনের অন্যায় আচরণ করা হয়নি। তখন শুরু হয় বর্ষাঋতু। এখানে থাকা আর সুবিধাজনক নয় মনে করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন না করেই রঘুজি তাঁর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আলিবর্দিও তাঁর নিজ স্থানে ফিরে যান এবং তাঁর যেসব সৈন্য ভালো কাজ করেছিল, তাদের প্রচুর পুরস্কার দেন।

এমন এমন আনন্দ-উৎসবের পরিবেশে আলিবর্দির মাতা ৯০ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।[৭]

---

৬. রঘুর এই শান্তির প্রস্তাব, *তারিখ*-এর মতে, (*তারিখ-ই*, পৃ. ৫৭) অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা এবং *তারিখ*-এর বর্ণনাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। *সিয়ার*-এও এর সমর্থন পাওয়া যায়। খুব সম্ভব করম আলি খান এখানে ভুল করে পরের ঘটনা আগে টেনে এনেছেন।

৭. মৃত্যুকালে (১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) আলিবর্দির জননীর বয়স ৯০ বছর হলে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। আলোচ্য গ্রন্থে এর আগে (উপক্রমণিকায়) বলা হয়েছে যে ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ৬৭ বছর বয়সে আলিবর্দির পিতা রাজমহলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর (আলিবর্দির) পিতার বয়স ৬৭ হলে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ তিনি তাঁর স্ত্রীর চেয়ে ১২ বছরের ছোট ছিলেন। তা অসম্ভব না হলেও অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয়। *তারিখ*-এর বর্ণনা মতে (*তারিখ-ই*, পৃ. ১১৮) ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুকালে আলিবর্দির বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সে ক্ষেত্রে তাঁর জন্ম ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং তাঁর চেয়ে ১০ বছরের বড় হাজি আহমদের জন্ম ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়।
সমুদয় ব্যাপারই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। খুব সম্ভব আলিবর্দির পিতা ও মাতার বয়সের বর্ণনায় কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। মৃত্যুকালে যে আলিবর্দির অন্তত ৭৫ বছর বয়স ছিল, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

রঘুর পক্ষে মারাঠাদের সেনাপতি হিসেবে মির হাবিবের আগমন—তাঁর বিরুদ্ধে আলিবর্দির অভিযান

নিরাশ হয়ে গৃহে ফিরে যাওয়ার পর রঘুজি ১১৫৯ হিজরি (১৭৪৬-৪৭ খ্রি.) সনে হাবিব উল্লাহ খানের সঙ্গে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর (মির হাবিব) নির্দেশমতো চলার জন্য সেনাপতিদের আদেশ দেন। হাবিব উল্লাহ খান উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবেশ করে বারবাটি দুর্গ শূন্য দেখে তা অধিকার করে নেন।[১] শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে এ দুর্গ ছিল বিখ্যাত। কাটাজুরী নদী থেকে এই দুর্গের দুই দিকের পরিখাতে জল আসত বলে এটি অধিকার করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। সেনাবাহিনীর একাংশসহ[২] তিনি সৈয়দ নূর ও সর আন্দাজ খানকে এবং [সেই সঙ্গে] সেখানে একজন হাজারিকেও অনেক মালপত্রসহ রেখে আসেন। তারপর বাঙলার দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি বালেশ্বর, জলেশ্বর, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, মঙ্গলকোট ও কৃষ্ণনগর লুটতরাজের মাধ্যমে

---

১. করম আলির বর্ণনা এখানে বিভ্রান্তিকর। উড়িষ্যা অঞ্চল অনেক দিন ধরেই আলিবর্দির অধিকারের বাইরে ছিল। মাঝেমধ্যে সে অঞ্চল তাঁর অধিকারে এলেও তা কোনো দিনই স্থায়ী হয়নি। সেসব কথা অন্যত্র, যেমন—*সিয়ার* (১ম ও ২য় খণ্ড), *রিয়াজ*, *তারিখ-ই-বঙ্গালা* ও *তারিখ*-এ বর্ণিত হলেও আলোচ্য গ্রন্থে তা নেই। তিনি হঠাৎ করে এখানে কটকের বারবাটি দুর্গ মির হাবিব কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার কথা বলেছেন।

২. মূল ইংরেজি পাঠ (য. না., পৃ. ৩৪) : 'He left Syyid Nur and Sar andaz Khan with a dasta of troops and ahazari with heavy materials (baggage and stores in it).' ফারসি দস্তাহ (دسته) শব্দের অর্থ এখানে 'division of an army' এবং হাজারি (hazari= هزاری) শব্দের অর্থ 'a commander of guards'।

এমনভাবে অধিকার করেন যে, লোকে মনে করতে পারত যে, এসব জায়গায় এর আগে কোনো জনবসতি ছিল না, সেখানে কোনো চাষাবাদ হতো না।[৩]

তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আলিবর্দি বের হয়ে আসেন। মির হাবিব তখন বিষ্ণুপুরে অবস্থানরত। আলিবর্দি সেখানে মোস্তফা খান ও রহম খানকে প্রেরণ করেন। ওমর খানকে পাঠিয়ে দেন মঙ্গলকোটে। তিনি মির জাফর খান, শমশির খান ও সরদার খানকে পাঠান বীরভূম যাওয়ার পথ রোধ করতে। দস্তি গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা মির্জা দওয়ার কুলি ও সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট অংশ নিয়ে তিনি নিজে পথঘাটহীন অঞ্চল দিয়ে বিষ্ণুপুরের পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হন। কণ্টকময় বৃক্ষরাজির আধিক্য ও পথের অসমতলতার কারণে তাঁর সৈন্যগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে তিনি আদেশ দেন যে, অগ্রসর হওয়া ও বিরতির সময় যেন প্রচুর তোপধ্বনি করা হয়, যাতে সৈন্যরা [একে অন্যের] কাছাকাছি থাকতে পারে এবং বিশৃঙ্খলার কারণে অরণ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।[৪] তাঁর [সেনাবাহিনীর] কামানের গর্জনের কারণে বনভূমি ও আকাশ মুখরিত হয়। তিনি অরণ্যের ভেতর দিয়ে পথ করে নেন এবং দিন কয়েকের মধ্যেই অতর্কিতে হাবিব উল্লাহ খানের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শত্রুরা পলায়ন করে। উভয় দলের সৈন্যরা অরণ্য ও পাহাড়ি অঞ্চলে এক মাস ধরে যুদ্ধ করে। তখন তারা জীবনের পরোয়া না করে একে অন্যের সম্মুখীন হয়। ১০ বা ১০০ জনের দলে বিভক্ত হয়ে দুই পক্ষের এই যুদ্ধ চলে। একসময় সেই দুর্গম অঞ্চল থেকে বেরিয়ে বর্ধমানে উভয় দল কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেনাবাহিনী মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে মারাঠাদের পরাজিত করলে তারা হার মেনে পালিয়ে যায়।

সৈয়দ নূর ও সর আন্দাজ খান নিহত[৫] : এই বিজয়ের পর নবাব জোর করে অভিযান চালিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে বহু শত্রুসেনা হত্যা করেন। তিনি বারবাটি দুর্গের দুই ক্রোশের মধ্যে পৌঁছে যান। সর আন্দাজ খানের সঙ্গে

৩. এসব বর্ণনা সত্য হলেও ঘটনাগুলো অনেক পরবর্তীকালের।

৪. এ ঘটনা *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৬৭) বিশদভাবে বর্ণিত আছে এবং গ্রন্থকার *তারিখ* থেকে যে তা নিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এসব ঘটনা আরও পরবর্তীকালের।

৫. এই ঘটনাও অনেক পরবর্তীকালের। *তারিখ*-এও (*তারিখ-ই*, পৃ. ৮৮-৯০) তা বর্ণিত হয়েছে। তবে নারকেলের খোলের ভেতরে পত্র প্রেরণের কথা সেখানে নেই। ঘটনার বর্ণনা দেখে মনে হচ্ছে, করম আলি খান ঘটনার ক্রমবিকাশ ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পেরে কিছু অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন বর্ণনা তুলে ধরেছেন যত্রতত্র। এ সম্বন্ধে *তারিখ*-এর বর্ণনা দ্র.।

একমত হয়ে সৈয়দ নূর হাবিব উল্লাহ্ খানের ভয়ে এক ব্রাহ্মণের মাধ্যমে গোপনে নারকেলের খোলের মধ্যে ভরে নবাবকে এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করেন, 'আপনি যদি দুর্গে আসেন এবং আপনার এই ক্রীতদাসদের অপরাধ মার্জনা করেন, তাহলে আমরা সানন্দে এই দুর্গ আপনার কাছে সমর্পণ করব।'

পত্র পেয়ে বিলম্ব না করে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে আলিবর্দি খান দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে একটি পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। সৈয়দ নূর তাঁর ওয়াদা রক্ষা করে দুর্গ থেকে একাকী বের হয়ে আসেন। তিনি আলিবর্দির সঙ্গে দেখা করে দুর্গ সমর্পণ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুমতি নিয়ে দুর্গে ফিরে যান। [তাঁদের মধ্যে এরকম কথাবার্তা হয় যে,] পরদিন সর আন্দাজ খান মালপত্র নিয়ে নবাবের শিবিরে এসে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন এবং সৈয়দ নূর নিজে এই দুই ব্যক্তির সামনে উপস্থিত থাকবেন। সে সময় একটি ছোট তাঁবুতে উপবিষ্ট নবাব সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করবেন—এরকমই ইচ্ছা ছিল তাঁর। তিনি সৈয়দ নূর ও সর আন্দাজ খানের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। মালপত্র ও রসদ নগরে পাঠানোর জন্য বোঝাই করা হচ্ছিল।

সৈয়দ নূর ও সর আন্দাজ খান উড়িষ্যাতে অনেক অত্যাচার করেছিলেন বলে আলিবর্দি সবিস্তারে জানতে পারেন। সর আন্দাজ খানকে হত্যা করার জন্য আলিবর্দি সিরাজ-উদ-দৌলাকে মোতায়েন করেছিলেন। সৈয়দ নূর আলিবর্দির কাছে আগমন করলে, তিনি তাঁকে সর আন্দাজ খান কোথায় সেই প্রশ্ন করেন। সৈয়দ নূর জানান যে, সর আন্দাজ খান কাছাকাছি জায়গাতেই আছেন। অল্পক্ষণ পরই তিনি আসবেন। এ কথা শুনে আলিবর্দি সৈয়দ নূরকে সর আন্দাজের কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে প্রথমে সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে দেখা করার পর তাঁকে আলিবর্দির কাছে আসার জন্য সংবাদ দিতে বলেন। সর আন্দাজ খান সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যরা তাঁর মস্তক ছিন্ন করে[৬] এবং এভাবে হাজারিকে পরাভূত করে। সৈয়দ নূর নিজেকে সাহসী ব্যক্তিদের অন্যতম বলে মনে করতেন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করে নিজেই স্থাণুবৎ হয়ে গেলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'মেওয়াতিদের' কাছে সোপর্দ করা হয়।[৭]

আলিবর্দি দুর্গের নিকটবর্তী হলে দুর্গের অধিবাসীরা [দুর্গ সমর্পণে] আপত্তি

---

৬. সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশে সর আন্দাজ খানকে হত্যা করার প্রায় অনুরূপ বর্ণনা *তারিখ*-এও (*তারিখ-ই*, পৃ. ৯০) আছে। এ কাজটা যে অত্যন্ত গর্হিত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৭. *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৯০-৯১) সৈয়দ নূর ও ধরমদাসকে বন্দী করার কথা আছে, কিন্তু হত্যা করার কথা নেই।

করে। সুদীর্ঘ আলোচনা ও নতুন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর দুর্গের অধিনায়কগণ প্রতিবন্ধকতা তুলে নেন এবং আনুগত্য স্বীকার করতে নবাবের কাছে এগিয়ে আসেন। দুর্গটি নবাবের অধিকারে আসে। সেই রাতেই নবাবের আদেশে মেওয়াইটরা সৈয়দ নূরকে গলাটিপে হত্যা করে এবং পরদিন প্রচার করা হয় যে, তাঁর সম্মানে আঘাত লাগার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

আলিবর্দির কটক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মারাঠাদের ভয়ে কেউ এই দুর্গের দায়িত্ব নিতে সম্মত হননি। মির্জা হাবিব বেগ কিন্তু দুদিনের রাজত্বের জন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হন। দুর্গের ভার দুর্গাধিপতি ও সুবার ভার সুবাদারের ওপর অর্পণ করে আলিবর্দি বাঙলায় ফিরে যান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইকরাম-উদ-দৌলার বিয়ে ও অন্যান্য ঘটনা

হয়বত জঙের[১] মধ্যম পুত্র ইকরাম-উদ-দৌলার সঙ্গে আতাউল্লাহ খান সাবিত জঙের[২] কন্যার বিয়ে হয়। এ বিয়েতে উঁচু ও নিচু সর্বস্তরের মানুষকে বস্ত্র উপহার দেওয়ার ব্যয় ছাড়াও শুধু গন্ধদ্রব্য, আলোকসজ্জা ও আতশবাজির জন্যই ব্যয় হয় ১২ লাখ টাকা। এই উৎসব চলে তিন মাস ধরে। ১ লাখ পদাতিক সৈন্য ও কোটি প্রজা দিনরাত এই আনন্দ-উৎসব ও সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ[৩] করে।

সফদর জঙের আগমন ও প্রস্থানের কিছু বর্ণনা: [বর্ষাশেষে] সূর্য পুনরায় উদিত হলে পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো আলিবর্দি হাবিব উল্লাহ খান সৃষ্ট গোলযোগের প্রতিবিধানে মনোযোগী হন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি

---

১. আজিমাবাদের নায়েব সুবাদার জয়েন-উদ-দীন ও আলিবর্দির কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্রের সংখ্যা ছিল তিন। তাঁরা ছিলেন: ১. নবাব সিরাজ–উদ-দৌলা, ২. ইকরাম-উদ-দৌলা ও ৩. মির্জা মেহদি। আরবি শব্দের উচ্চারণ 'ইকরাম'। স্যার যদুনাথ 'আকরাম' উচ্চারণ দিয়েছেন। শিরোনামেও তা-ই। তবে পাদটীকাকার সঠিক উচ্চারণ দিয়েছেন।

২. আতাউল্লাহ খান সাবিত জং ছিলেন হাজি আহমদের কনিষ্ঠ কন্যা রাবেয়া বেগমের স্বামী। তিনি ছিলেন নবাব সুজা-উদ-দীনের সম্ভ্রান্ত বংশীয় দূরসম্পর্কের ভাই (cousin)। তিনি রাজমহল, ভাগলপুর ও অন্যান্য স্থানে ফৌজদারের চাকরি করেছিলেন। হয়েছিলেন অগাধ সম্পদের অধিকারী। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে সিরাজের বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। কিন্তু কন্যাটি হঠাৎ মারা গেলে সেই বিয়ে হতে পারেনি। পরে সিরাজের দ্বিতীয় ভাই আকরাম-উদ-দৌলার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার বিয়ে হয়। কিন্তু এই বিয়ে অনেক দিন পরের ঘটনা। এ বিষয়ে *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৬০) যথাস্থানে বর্ণিত আছে।

৩. এসব জাঁকজমকের বর্ণনা *তারিখ*-এও আছে। খুব সম্ভব সেখান থেকেই এ বর্ণনা গৃহীত।

দেন। [দিল্লির] সম্রাট মোহাম্মদ শাহর কাছে এ মর্মে তিনি পত্র লেখেন যে, 'আপনার এই বৃদ্ধ গোলাম মারাঠাদের শাস্তি বিধানের জন্য হয়বত জংকে বিহার থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। ফলে সেই সুবা এখন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। নবাব সফদর জঙের অবস্থান বিহার প্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চলে। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন পাটনার নিকটবর্তী কোনো জায়গায় এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই আদেশ আপনি তাঁকে দিন। তাতে মনের শান্তি বজায় রেখে আমি এই কাফেরদের প্রতিহত করতে পারব।'[৪]

বিহার সুবা পাহারা দেওয়ার জন্য সম্রাট সফদর জংকে আদেশ প্রদান করলে তিনি অতিশয় জাঁকজমকের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন এবং বিহার সুবাকে তাঁর নিজের রাজ্য বলে ধরে নিয়ে সেখানকার রাজস্ব ও প্রশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দেন। মারাঠাদের বিতাড়িত করার কাজে আলিবর্দি তখন উড়িষ্যা রাজ্যে। এই সংবাদ শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্র আলিবর্দি মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত রেখে কালবিলম্ব না করে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সফদর জংকে এই মর্মে পত্র লেখেন যে, মারাঠাদের প্রতিহত করার কাজে তিনি সফলকাম হয়েছেন। ফলে তাঁর আর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। অতএব সফদর জঙের পক্ষে নিজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করাই বিধেয়।

এই পত্র পেয়ে সফদর জং দ্রুত তাঁর রাজ্যে ফেরার উদ্যোগ নেন। কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পরই আলিবর্দি সফদরের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পান।[৫]

শোন নদীর তীরে মারাঠাদের সঙ্গে (আলিবর্দির) যুদ্ধ[৬] : সফদর জং পাটনা দুর্গ থেকে দুটি কামান নিয়ে গেছেন শুনে আলিবর্দি তা দেখেও না দেখার ভান করেন এবং (বিহারের দিকে) ধীরগতিতে অগ্রসর হন। তিনি পাটনা উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে হেদায়েত আলি খানকে[৭] বহিষ্কার করেন। হেদায়েত আলি

---

৪. *তারিখ* ও *সিয়ার*-এর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে, এ ঘটনা অনেক আগের এবং করম আলি বর্ণিত সময়ে নয়। এ সম্বন্ধে *সিয়ার*-এর বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১-৪০৬) দ্র.।

৫. এ সম্পর্কে *সিয়ার*-এর বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬) বেশি বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য। করম আলির বর্ণনায় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার সবকিছুর তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল বাদশার কাছে।

৬. ওই যুদ্ধ অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। সফদর জঙের আজিমাবাদে আগমনের অনেক আগের ঘটনা। গ্রন্থকার মোটেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি।

৭. সৈয়দ হেদায়েত আলি খান তবাতবায়ি ছিলেন *সিয়ার* রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবায়ির পিতা। তিনি বৈবাহিক সূত্রে আলিবর্দির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি আলিবর্দির এক ভগিনীর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শাহজাদা আলি গওহরের (পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জয়েন-উদ-দীন তাঁর

খান ছিলেন সফদর জঙের বন্ধু। মারাঠারা শোন নদীর তীরে সমবেত হয়েছে শুনে আলিবর্দি দ্রুতগতিতে সেদিকে অগ্রসর হয়ে কাফেরদের সম্মুখীন হন। শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে তাঁর সেনাবাহিনীকে তিন দিন খাদ্যদ্রব্য ছাড়াই থাকতে হয়েছিল। তখন (তাঁর) বীরের দল শত্রুদের আক্রমণ করে। মারাঠারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এ যুদ্ধের পর আলিবর্দি তাঁর সৈন্যদের তাদের কাজের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কৃত করেন।

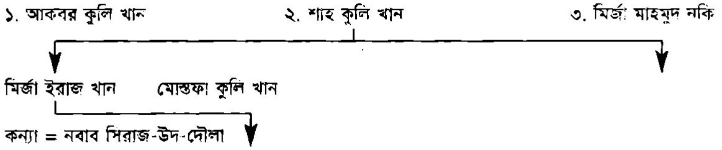
আলিবর্দি ১১৫৮ হিজরি (১৭৪৫-৪৬ খ্রি.) সনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার বিয়ে[৮] সম্পন্ন করেন। পূর্ববর্তী বিয়ের (ইকরাম-উদ-দৌলার) চেয়েও এই বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেক বেশি জাঁকজমক হয়। তখন বর্ষাকাল। (তা সত্ত্বেও) প্রতিটি রাত ছিল শবে বরাতের রাতের মতো [আলোকোজ্জ্বল] ও প্রতিদিন ছিল নববর্ষের দিনের মতো [আনন্দমুখর]।

শ্বশুরের সাহায্যার্থে উড়িষ্যা যাওয়ার সময় সৈয়দ হেদায়েত আলির কাছে আজিমাবাদের শাসনভার ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৪০০) বিশদ বর্ণনা আছে।

জয়েন-উদ-দীনের উড়িষ্যা অঞ্চলে অবস্থানকালে সফদর জং (আবুল মনসুর খান) আপত্তিজনক ব্যবহার করেন। তাঁর হাতি ও কামান নিয়ে যান। এসব ঘটনার কথা আলিবর্দি খানের কানে গেলে তিনি হেদায়েত আলি খানকে এ ব্যাপারে সফদর জঙের সহায়তাকারী বলে মনে করে তাঁর প্রতি বিরক্ত হন। *সিয়ার*-এর মতে হেদায়েত আলি খান ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দলবলসহ দিল্লিতে সম্রাটের দরবারে চলে যান। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আলিবর্দি তাঁকে আজিমাবাদ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। *সিয়ার*-এর বর্ণনা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

৮. সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইরাজ খানের কন্যার সঙ্গে সিরাজ-উদ–দৌলার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সিরাজের এই বেগমের নাম পাওয়া যায় না। সিরাজ-উদ-দৌলার অতি পরিচিত স্ত্রী ছিলেন বেগম লুৎফ-উন-নিসা। তাঁর সম্পর্কে পরে বর্ণনা আছে। ইরাজ খানের বংশপরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো :

মোস্তফা কুলি খান (আজিম-উশ-শানের প্রধানমন্ত্রী)



কিন্তু গ্রন্থকার এখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা মোটেই রক্ষা করেননি। হেদায়েত আলি খান আজিমাবাদ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের দিকে। গ্রন্থকার এখানে সিরাজের বিয়ের যে কথা বলেছেন, তা ঘটেছিল ১৭৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে।

সপ্তম অধ্যায়

বাবর জঙের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বিদ্রোহ ঘোষণা[1]

বিদ্রোহী বাবর জং ও হয়বত জঙের হাতে তাঁর পরাজয় : আলিবর্দির অনুগ্রহে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাবর জং উচ্চতম পদ ও ক্ষমতা লাভ করেন। বিশ্বের কাছে তিনি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন। তাঁর পদোন্নতিতে শমশির খান ও সরদার খান অসন্তুষ্ট হন[2] এবং গোপনে তাঁর মনে সন্দেহের বীজ বপন করে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

তাঁদের প্ররোচনায় তিনি হয়বত জংকে অপসারণ করে তাঁর জায়গায় বিহারের নায়েব নাজিমের পদ দাবি করেন। এটি সম্ভব ছিল না বলে তাঁর বিদ্বেষ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যে, একদিন প্রাতঃকালে প্রচলিত সময়ের আগে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক লোক নিয়ে তিনি নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হন। গুপ্তচরেরা নবাবকে [পূর্বাহ্ণেই] সংবাদ দিয়ে রেখেছিল যে, মোস্তফা খান সেদিন দরবারে

---

১. গোলাম মোস্তফা খানের পদত্যাগ ও বিদ্রোহ ঘোষণা অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৫০-৫৫) তা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। *সিয়ার*-এ এ ঘটনার আরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯-৬৯)। এ যুদ্ধ যে ১৮৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পরের ঘটনা, তা-ও উল্লেখিত আছে *সিয়ার*-এ। আলিবর্দির দরবারের ঘটনার বিবরণ *সিয়ার* রচয়িতা *তারিখ* রচয়িতা ইউসুফ আলির বর্ণনা থেকে নিয়েছিলেন বলে গোলাম হোসেন বলেছেন। তবে আজিমাবাদের যুদ্ধের সময় গোলাম হোসেন খান সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯)।

২. মোস্তফা খানের সঙ্গে শমশির খান ও সরদার খানের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুধু আলোচ্য গ্রন্থেই দেখা যায়, অন্য কোনো সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ নেই।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন। এ কারণে বিজ্ঞ গোলাম হোসেন খান আরজ বেগি নানান শ্রুতিমধুর বাক্যালাপ করে তাঁকে দরবারকক্ষের বাইরে এক ঘণ্টা আটকে রাখেন। সেই সঙ্গে দরবারে নিত্য হাজিরা দানকারী সভাসদদের[৩] সেখানে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। সেই কালের শাসনকর্তাদের মধ্যে সুমধুর বাগ্মিতার জন্য আলিবর্দিও বিখ্যাত ছিলেন। মোস্তফা খান তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে নবাব তাঁর সঙ্গে এমন আকর্ষণীয়ভাবে ব্যবহার করতে থাকেন যে, বৃদ্ধ লোকটি (মোস্তফা খান) অবাক হয়ে যান এবং অন্যান্য সভাসদ দরবারে উপস্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির কোনো উপায় খুঁজে পাননি।

পরদিন অপরাহ্ণে[৪] মোস্তফা খান তাঁর অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দরবারে আসেন। আলিবর্দি তাঁকে দর্শন না দিয়ে এড়িয়ে যান। বাবর জং অহংকারে প্রকাশ্যে দরবারগৃহ ত্যাগ করে চলে যান। অকল্যাণকারীদের প্ররোচনায় তাঁর মনে আরেকটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধে ওঠে। সমুদয় আফগান সেনানায়ককে একত্র করার জন্য তিনি একটি দলিল[৫] তৈরি করেন। ফলে সুবাদারের পদ থেকে আলিবর্দিকে অপসারণ করা যাবে বলে তিনি ধারণা করেন এবং আফগান সেনানায়কদের সেই দলিলে তাঁদের মোহর অঙ্কিত করার জন্য প্ররোচিত করেন। তাঁর ধৃষ্টতা ক্রমে এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শমশির খান ও সরদার খান সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও এই দলিলে ওমর খানের মোহর অঙ্কিত করার জন্য নিয়ে গেলে শেষোক্ত ব্যক্তি নবাবের প্রতি তাঁর আনুগত্য হেতু তা ছিঁড়ে ফেলেন। শুধু তা-ই নয়, সব আফগানকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করেন। এমনকি গালিগালাজের হাত থেকে শের শাহকেও বাদ দেননি। আলিবর্দির ক্রোধ সমগ্র আফগান সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ হতে পারে ভেবে শমশির খান ও সরদার খান সাবধানতা অবলম্বন করে তাঁদের গৃহে নীরবে ফিরে যান। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাবর জংকে দোষী করা। কিন্তু তাতে তাঁরা সফলকাম হননি।

---

৩. স্যার যদুনাথ প্রদত্ত ইংরেজি পাঠে 'Courtiers' শব্দের পরে বন্ধনীতে 'মুজরাইন' (mujrain') শব্দ আছে। আরবি থেকে ফারসি ভাষায় গৃহীত 'মিজরায়ি' (مجرائی) শব্দের আভিধানিক অর্থ: 'One who pays his respects', 'servants', 'ministers' or the like। এখানে মিজরাইন ব্যবহৃত বহুবচনে, অর্থাৎ সভাসদগণ অর্থে।

৪. ইংরেজি 'evening' শব্দের পরে বন্ধনীতে (asar/আসর) শব্দ আছে। আরবি আসর (عصر) শব্দের এক অর্থ afternoon prayer।

৫. ইংরেজি 'menifesto' শব্দের পর বন্ধনীতে mahazar শব্দ আছে। আরবি মহজর (محاضر) শব্দের এক অর্থ দলিল।

আফগানদের মধ্যে বিভেদ তাঁর সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে বলে মনে করে আলিবর্দি পদত্যাগপত্র দাখিলকারী বাবর জংকে পদচ্যুত করেন[৬]। সঙ্গে সঙ্গে জগৎশেঠের মাধ্যমে বকেয়া বেতন হিসেবে তাঁর পাওনা ৯ লাখ টাকা তাঁকে পরিশোধ করে দেন। শুধু তা-ই নয়, সম্মানের সঙ্গে তাঁকে তাঁর গৃহেও পাঠিয়ে দেন। কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে আর সব আফগানের সহযোগিতা না পেয়ে বাবর জং মুর্শিদাবাদে তাঁর পরিকল্পনা সফল করতে পারেননি বলে হয়বত জংকে পাটনার [নায়েব] সুবাদারি থেকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে তিনি সেদিকে অগ্রসর হন। বড় ধরনের একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে নবাব তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন।[৭] হয়বত জং তখন ভুয়ানরাহ মহলে অবস্থান করছিলেন। বাবর জঙের শত্রুতামূলক মনোভাব ও যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে পাটনা অভিমুখে তাঁর যাত্রা করার কথা শুনে আলিবর্দি হয়বত জংকে কোনো রকমেই তাঁকে (মোস্তফা খান) বাধা প্রদান না করার জন্য চিঠি লেখেন। এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়বত জং রাগ করে এই বলে উত্তর দেন যে, 'আমি যদি তাঁর অভিপ্রায়ে বাধা না দিই এবং এই ভুল পথ থেকে ভ্রমণকারীকে ঠিক পথে আনতে না পারি, তাহলে আমি কী করব! সে ক্ষেত্রে আজিমাবাদ থেকে আমাকে সরে আসতে হবে এবং এই সুবাকে তাঁর হাতে দান হিসেবে তুলে দিতে হবে। এই ভৃত্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

এ সময় এই নবাব হয়বত জঙের কাছে সর্বসাকল্যে মাত্র ১ হাজার ৪০০ সৈন্য এবং বাবর জঙের অধীনে ছিল ২০ হাজার সৈন্য। বাবর জঙের বিরুদ্ধে হয়বত জঙের যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে আলিবর্দি বারবার তাঁকে পত্র পাঠিয়ে বলেন, 'বাবর জঙের সঙ্গে ইউরোপীয় গোলন্দাজ বাহিনী আছে এবং তাঁর ব্যক্তিগত বীরত্বের কথাও তোমার জানা আছে। [অতএব] তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরো না। আর এসব সত্ত্বেও তুমি যদি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে সসৈন্যে আমি না আসা পর্যন্ত কেবল পরিখার ভেতরে থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যাও।'

হয়বত জং রাজ্যের সাহসী ব্যক্তিদের কাছে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে চারদিকে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি নিজে [পাটনার পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত] গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন এবং আলিবর্দির নির্দেশমতো পাটনা দুর্গের নিকটবর্তী জাফর খানের বাগানে পরিখা খনন করে

---

৬. করম আলির বর্ণনা এখানে অসংলগ্ন এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে তিনি হঠাৎ করে বিভিন্ন ঘটনা একসঙ্গে তুলে ধরেছেন। ধারাবাহিকতা রক্ষা না করলেও তিনি যেসব তথ্য দিয়েছেন, সেগুলো অবশ্য গালগল্প না হয়ে সত্য বলেই মনে হয়।

৭. এমন একটি উক্তি *তারিখ*-এও (*তারিখ-ই*, পৃ. ৫৩) আছে। কিন্তু এর অব্যবহিত পরে আলিবর্দি কোথায় গেলেন, সেই কথা *তারিখ* বা বর্তমান গ্রন্থে নেই।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

বাবর জং তাঁর অভিযানের পথে বহু লোককে হত্যা করেন। ধ্বংস করেন গ্রাম-শহরসহ বহু জায়গা। লুটতরাজও চালান। পাশাপাশি রাজমহল থেকে জোর করে সরকারি অর্থ ও কয়েকটি কামান নিজ অধিকারে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। মুঙ্গের পৌঁছে তিনি তা অধিকার করার প্রয়াস চালান। সাহসী লোকের মতো দুর্গাধিপতি হাসান বেগ খান তাঁকে বাধা দেন। দুর্গ থেকে গোলাবর্ষণ করা সত্ত্বেও বাবর জঙের সৈন্যরা দুর্গপ্রাচীরের কাছে চলে আসে। দুর্গে প্রবেশ করে তা অধিকার করে দুর্গাধিপতি ও তাঁর তিন পুত্রকে বন্দী করে। বাবর জঙের সহোদর ভাই আবদুর রসুল খান[৮] সেই সময় হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। দুর্গের ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে তিনি নিহত হন।

মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করার পর বাবর জং পাটনা (আজিমাবাদ) অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এ কথা শুনে আলিবর্দির নির্দেশে হয়বত জং ও তাঁর সঙ্গী যাতে যতটা সম্ভব যুদ্ধ পরিহার করেন, সে কারণে বাবর জঙের কাছে মির মর্তুজা ও আসকর খানকে দূত হিসেবে পাঠিয়ে তিনি এ কথা জানান যে, 'আপনি আলিবর্দি খানের সঙ্গে এবং তিনি আপনার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন, তা আপনার ও তাঁর জানা আছে। এ ব্যাপারে আমি শক্তিহীন ও আমার কোনো অবদান নেই। আপনার ভ্রমণের ব্যয় ও আপনার ইচ্ছামাফিক দ্রব্যাদির জন্য আমি ২ লাখ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।'

এ বার্তা শ্রবণ করে বাবর জং অভদ্রভাবে উত্তর দেন, 'পত্র বা সংবাদাদি প্রেরণের সময় এটা নয়। আমার দুধারী তরবারি আমার কাজ [অতীতে] করেছে এবং [এখনো] করবে।'

হয়বত জং এই সংবাদ পেয়ে আগের চেয়েও বেশি শক্তি সংগ্রহ করে তাঁর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

---

৮. আবদুর রসুল খান ছিলেন মোস্তফা খানের সহোদর ভ্রাতার পুত্র, সহোদর ভ্রাতা নন। তিনি ছিলেন উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার ও একজন যোগ্য সেনাপতি। মোস্তফা খানের পদত্যাগের পর তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর চাচার সঙ্গে যোগদান করেন এবং দৈবক্রমে এখানে নিহত হন। তিনি ছিলেন একজন বীর ও নীতিবাদী লোক।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে হাসান বেগ খানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। *তারিখ* ও *সিয়ার*-এ মুঙ্গের দুর্গের অধিপতির কথা বলা হলেও হাসান বেগ খানের নাম সেখানে নেই এবং মোস্তফা খানের দুর্গ অধিকার করার কথা থাকলেও দুর্গরক্ষক বা তাঁর পুত্রদের বন্দী করার কথা নেই। এই হাসান বেগ খানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিনি ফকির উল্লাহ বেগ খান, নুর উল্লাহ বেগ খান ও গোলাম হোসেন আরজ বেগির মতো আলিবর্দির ভৃত্যজাতীয় কেউ হতে পারেন, যদিও তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে সঠিকভাবে কিছু বলার উপায় নেই।

মোস্তফা খান হয়বত জঙের পরিখা থেকে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে আগমন করলে তিনি (হয়বত জং) হাজি আলম খানকে শান্তি স্থাপনের জন্য দূত হিসেবে (আবারও) প্রেরণ করলে বাবর জং উদ্ধতভাবে উত্তর দেন, 'পথভ্রষ্টদের (শিয়াদের) ও হিন্দুদের সৈন্য আমার সামনে থাকলে আমার ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ করা।'

এসব কথা শোনামাত্র আবদুল আলি খান অতিশয় আনন্দিত হন এবং প্রবল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা[৯] সহকারে হয়বত জঙের কাছে নজর[১০] প্রদান করে তাঁর বিজয় আসন্ন ভেবে বলেন, 'এত দিন আমার ধারণা ছিল, এই কুকুরটির শত্রুতা আমাদের বিরুদ্ধেই ছিল। এখন আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, সে আল্লাহর দুশমন এবং ধর্মীয় যোদ্ধারা [গাজিরা] অবশ্যই তাকে হত্যা করবে।...মোহাম্মদ ও আলির নাম এবং রসুলের সম্মানের কথা যখন আমাদের মনের মধ্যে আছে, তখন আমাদের মনে কী করে ভয় থাকতে পারে!'

তারা (সৈন্যরা) সারা রাত পাহারা দিল। ১১৫৮ হিজরি সনের সফর মাসের ১৮ তারিখে (প্রকৃতপক্ষে ১১৫৮ হিজরি সনের ২১ সফর বৃহস্পতিবার দিন, ১৪ মার্চ ১৭৪৫ খ্রি.) হয়বত জং হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে পরিখাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। কেয়ামতের দিনের মতো বিশ্বাসীদের অসংখ্য শত্রু[১১] ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো অনবরত আসতে থাকলেও আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়বত জং মোটেই ভীত হননি। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। একদল সৈন্যের সঙ্গে[১২] বাবর জঙের তাঁবু ও তাদের নিশানসমূহ দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও এবং তারা আমাদের পরিখার পাশ দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে, আজ আর লড়াই হবে না। তারা যখন

---

৯. ইংরেজি পাঠে বন্ধনীতে 'তসুব' (tassub) শব্দ আছে। যথাযথ বানানের অভাবে এর সঠিক অর্থ বের করা যায়নি।

১০. ইংরেজি পাঠে বন্ধনীতে 'নজর' (nazar) শব্দ আছে। আরবি নজর (نذر) শব্দের অন্যান্য অর্থের মধ্যে একটা অর্থ—'a present or offering from an inferior to a superior'। এখানে বোধ হয় সে অর্থেই তা ব্যবহৃত। আবদুল আলি খান ছিলেন, *সিয়ার*-এর মতে (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬), আলিবর্দি খানের এক ভগিনীর পুত্র এবং *সিয়ার* রচয়িতার মাতা ছিলেন আবদুল আলি খানের সহোদর। এ অনুসারে তিনি ছিলেন *সিয়ার* রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেনের আপন মামা এবং শ্বশুরও। এ যুদ্ধের সময়ই সেই বিয়ে হয়।

১১. গ্রন্থকার ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। মোস্তফা খান ছিলেন সুন্নি মতাবলম্বী। গ্রন্থকার তাঁর সুন্নি সৈন্যদের 'বিশ্বাসীদের শত্রু' (enemies of the faith) বলে অভিহিত করেছেন।

১২. বন্ধনীতে ফারসি পাঠ 'দস্তাহ' (dastah) আছে। ফারসি দস্তাহ (دسته) শব্দের অর্থ সেনাবাহিনী।

এ ধরনের কথা বলছিল, তখন তার পতাকা ও নিশানসহ বাবর জং আফগান ও তার অনুগত একদল সৈন্য এসে উপস্থিত হলো এবং আমাদের পরিখার সম্মুখবর্তী হয়েই অশ্বপৃষ্ঠে থাকা বাবর জং দিওয়ান কিরাত চাঁদের অধীন (সৈন্যদের) পরিখা আক্রমণ করে বসে। পরিখা অতিক্রম করে তিনি দিওয়ান কিরাত চাঁদ ও তাঁর পার্শ্ববর্তী লোকটিকে আহত করে হয়বত জঙের নিকটবর্তী হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে তির বর্ষিত হওয়ার ফলে বাতাস-আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। একদল আফগান সুশৃঙ্খলভাবে শিবির লুণ্ঠনের কাজ শুরু করে দিল।

সামান্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে হয়বত জংকে তাঁর সামনে উপস্থিত দেখে বাবর জং তাঁকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। আফগানরা তাদের ঘোড়াগুলো ছুটিয়ে সমতল ভূমিতে নিয়ে এল। হয়বত জঙের হাতির সামনে পয়সাভর্তি দুটি কামান হাজি সাহেবের অধীনে ছিল। হাজি সাহেব বারবার সেই কামান দেগে বাবর জঙের প্রায় তিন শ বিখ্যাত সেনানায়ক ও সাহসী সৈনিককে হত্যা করেন।[১৩] বিশ্বাসীদের শত্রুদের[১৪] বিরুদ্ধে অনবরত বন্দুকের গুলি ছোড়া হচ্ছিল। কিছুসংখ্যক ভলিয়া বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে যশোবন্ত নাগর বন্দুকযুদ্ধ করেই যাচ্ছিলেন। শত্রুপক্ষের সেনাপতিদের প্রতি নিক্ষিপ্ত সেসব গুলিতে তাদের অনেকেই নিহত হন। শেষ পর্যন্ত বাবর জঙের নিজের নিহত বা বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তার অবস্থা দেখে তার গোত্রের আফগানরা যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াল এবং তার হস্তীর লাগাম ধরে পরিখা অতিক্রম করে পালিয়ে গেল। বিজয়ী হয়বত জং পরিখার সামনে গিয়ে দুর্গের বিধ্বস্ত দেয়াল মেরামতের আদেশ দিলেন এবং আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করার জন্য ফিরে গেলেন তাঁবুতে।

বাবর জঙের একজন সেনাপতি ছিলেন হাকিম শাহ। তিনি জীবিত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় জানতে পারেন যে, আউদল শাহ ও আয়মন শাহ যুদ্ধে নিহত হয়ে পরিখায় পড়ে আছেন। তিনি একাই ফিরে আসেন এবং পরিখায় অবস্থানরত লোকদের আক্রমণ করে বীরের মতো যুদ্ধ শেষে পরিখার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হলে নামদার খানের হাতে নিহত হন। শত্রু-মিত্র সবাই তাঁর জন্য একইভাবে শোক পালন করে।

---

১৩. ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এই যুদ্ধের সময় যে হাজি আহমদের বয়স অন্তত ৮০ বছরের ওপরে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন দেখে তাজ্জব হতে হয়।

১৪. শিয়া মতাবলম্বী গ্রন্থকার শিয়া ছাড়া আর সবাইকে ‘বিশ্বাসীদের শত্রু’ বলে মনে করতেন।

এক সপ্তাহকাল ধরে বাবর জং আমাদের পরিখার সামনে শিবির স্থাপন করে ক্রমাগত কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকেন। পরের সপ্তাহে ২৫ সফর বৃহস্পতিবার দিন (প্রকৃতপক্ষে ২৮ সফর, ২১ মার্চ ১৭৪৫ খ্রি.) তিনি আবারও বের হয়ে বজ্র ও বাতাসের গতিতে (আমাদের) পরিখার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি আহমদ খান ও শেখ জাহান ইয়ার (খানের) পরিখা দুটি আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য নিয়োজিত করেন। হয়বত জঙের বিপরীতে এসে তাঁর লোকজনকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত দেখে বাবর জং নির্ভয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। দিওয়ান কিরাত চাঁদ ও মহারাজ রামনারায়ণ বন্দুক-কামানসহ অগ্রসর হয়ে তাঁর অগ্রগতিতে বাধা দেন। দৈবক্রমে বন্দুকের একটি গুলি তাঁর (বাবর জঙের) চোখে লাগলে তিনি অন্ধ হয়ে তাঁবুতে ফিরে যান। গ্রন্থকার আরও জানতে পারেন যে, প্রথম আক্রমণের সময়ই তাঁর চোখে গুলি লেগেছিল। সে যা-ই হোক, হয়বত জং বিজয়ী হয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। আলিবর্দি রণস্থল থেকে মাত্র দুদিনের পথের দূরত্বে ছিলেন। হয়বত জং বিজয়ের সংবাদ আলিবর্দিকে প্রেরণ করেন।

কয়েক দিন পর মুহিব-আলিপুরে আলিবর্দি তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করেন। চুনার দুর্গে যাওয়ার সময় বাবর জং পথে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর পেছনে ধাওয়া করে হয়বত জং এখানে আসেন। শোন নদীর তীর ধরে বাবর জংকে অনুসরণ করে অবশেষে আলিবর্দি তাঁর রাজধানীতে ফিরে আসেন।[১৫]

রঘুজি দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে এসেছেন শুনে তাঁর ভ্রাতা হাজি সাহেব ও (জামাতা) হয়বত জঙের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আলিবর্দি বাঙলা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

বাবর জঙের দ্বিতীয়বারের আক্রমণ ও তাঁর নিহত হওয়ার বর্ণনা : নাম ও সুখ্যাতি অর্জনের আগ্রহে বাবর জং আবারও একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং আগের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হন। তিনি পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তাঁকে মোকাবিলা করার জন্য হয়বত জং নগর থেকে বের হয়ে আসেন। শোন নদীর তীরে দুই সৈন্যদল একে অন্যের মুখোমুখি হয়। কামান ও বন্দুকের গোলাগুলি ব্যবহার করা সত্ত্বেও তুমুল লড়াইয়ের পর হয়বত জঙের সৈন্যদল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নবাবের [হয়বত জঙের] নিজস্ব কামান-বন্দুক

---

১৫. *তারিখ*-এর বর্ণনাতে (*তারিখ-ই*, পৃ. ৫৫) কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় *সিয়ার*-এর বিস্তারিত বর্ণনাতেও (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯-৬৯)।

বহনকারী 'খাস বরদার'[১৬] দলের দারোগা খাদেম হোসেন খান আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। আমাদের সেনাদলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁর শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে বাবর জং সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকেন। হয়বত জঙের কাছাকাছি জায়গায় এসে পড়লে বন্দুকের একটি গুলি বাবর জঙের বুকে লাগে এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর মাহুত হস্তীটিকে রণক্ষেত্র থেকে নিয়ে চলে যান। (কিন্তু) তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং হয়বত জংকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। এ সময়ে রহম খান, করম খান, আবদুল আলি খান ও সৈয়দ মেহদি নিসার খান[১৭] বাবর জঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেন। হয়বত জং বাবর জঙের পার্শ্বদেশ লক্ষ্য করে দুটি তির নিক্ষেপ করেন। ফলে তাঁর দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যু হলে আফগান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হয়বত জং তাঁর বিজয়লাভের সংবাদ আলিবর্দির গোচরে আনেন। এত বড় বিজয়লাভের পরও হয়বত জং পরাজিত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন বা বাবর জঙের দ্রব্যাদি লুট করতে যেতে পারেননি। মরহুম বাবর জঙের নেতাহীন বাহিনী নদী অতিক্রম করলে হয়বত জং রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং ভালোভাবে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদের পুরস্কৃত করেন।

রঘুজির বিরুদ্ধে আলিবর্দির যুদ্ধ ও রঘুজির পলায়ন: বিরাট একটি সেনাবাহিনী নিয়ে রঘুজি দ্বিতীয়বারের মতো বাঙলা সীমান্ত অতিক্রম করলে আলিবর্দি তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন। বসন্তকালের দিন ও রাত যখন সমান থাকে, আলিবর্দি তখন একটি শক্তিশালী সেনাদল নিয়ে শত্রুর অগ্রগতির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করার জন্য অগ্রসর হতে থাকেন। বাঙলায় প্রবেশ করে রঘুজি বহু স্থানে লুটতরাজ করেন এবং সেই সব স্থানকে আলোহীন করে ফেলেন। বর্ধমান চাকলায় নবাবের সৈন্যরা তখন মনের স্বস্তিতে বিশ্রামে ছিল। রঘুজি তাঁর সমুদয় বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর বহুমুখী আক্রমণ চালান। সেই আক্রমণের জবাব দেওয়ার জন্য তাঁর সৈন্যদল নিয়ে আলিবর্দি অবিলম্বে অশ্বারোহণে নির্গত হন। শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও তিনি তাদের

---

১৬. স্যার যদুনাথ 'খাস বরদার' (خاص بردار) শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন, শাসনকর্তার নিজস্ব অস্ত্র বহনকারী (Porter of the ruler's own weapons)। অন্যান্য অর্থের মধ্যে এটিও এ শব্দের এক অর্থ। এই দলের অধিনায়ক খাদেম হোসেন খান ছিলেন মির মোহাম্মদ জাফর খানের আপন বোনের সতিনের পুত্র। কিন্তু খাদেম হোসেন মির জাফরকে নিজের আপন মামা বলেই পরিচয় দিতেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন বহু দুষ্কর্মের সাথি।

১৭. সৈয়দ মেহদি নিসার খান ছিলেন *সিয়ার* রচয়িতার আপন চাচা ও যুবরাজ সিরাজ-উদ-দৌলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

পরাজিত করেন। যেসব শত্রুসৈন্য তরবারির হাত থেকে নিস্তার পায়, তারা পালিয়ে যায় মেদিনীপুরের দিকে।

আলিবর্দি তাঁর সেনাদলকে নতুন করে বিন্যস্ত করে রঘুজির ওপর চড়াও হন এবং তাঁর বন্দুক কামান দিয়ে তাঁকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন। রঘুজির ৬ কি ৭ হাজার সৈন্য নিহত হলে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু লুটতরাজের আগ্রহে তিনি পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হন। আলিবর্দি তাঁর সেনাবাহিনী ও বন্দুক-কামানসহ তাঁকে ধাওয়া করেন। ভাগলপুর থেকে শোন নদীর তীর পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব ছিল ১৫ মঞ্জিলেরও বেশি। এ জায়গাতেও দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলতেই থাকে। এতে প্রতিদিন নিহত হতে থাকে হাজার হাজার সৈন্য। শোন নদীর তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে সার্বিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। রঘুজি পরাজিত হয়ে কটকের দিকে পলায়ন করেন। আলিবর্দি উড়িষ্যার সীমানা পর্যন্ত ধাওয়া করে রঘুজিকে তাঁর রাজ্যের সীমানা থেকে বের করে দেন। সেই রাজ্যে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন।[১৮]

---

১৮. *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৫৮-৬০) বর্ণিত এই যুদ্ধের কথাই খুব সম্ভব করম আলি তুলে ধরেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

আলিবর্দির মির জাফর খানকে উড়িষ্যা প্রেরণ—তার পরপরই আতাউল্লাহ্ খানকে সেখানে প্রেরণ

১১৬০ হিজরি (১৭৪৭ খ্রি.) সনে আলিবর্দি মির মোহাম্মদ জাফর খানকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন। শমশির খান[১], সরদার খান ও ভলিয়াদের বখশিকে তাঁর অধীনে দিয়ে সেখানে তিনি প্রেরণ করেন তাঁদের। তাঁরা বর্ধমানে পৌঁছালে মারাঠা বাহিনী অগ্রসর হয়ে তাঁদের বেষ্টন করে ফেলে। তাদের রসদ ও পানি সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই সংবাদ পেয়ে আলিবর্দি আতাউল্লাহ খান (সাবিত জং) ও ফকির উল্লাহ বেগ খানের সঙ্গে কয়েক হাজার মণ খাদ্যশস্য তাঁদের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। কর্নেল ক্লাইভ (সাবিত জং) সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে মির জাফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। আলিবর্দিকে অপসারণের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন মির

১. ১১৬০ হিজরি (১৭৪৭-৪৮ খ্রি.) সনের এই ঘটনার আগে এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাবলির পর দুই বছরের অধিককাল ধরে আরও যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলোর বর্ণনা না দিয়ে গ্রন্থকার এখানে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাহীন এক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে *তারিখ*-এর ৬৩-৬৭ এবং ৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত অনেক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করম আলি খান এখানে মাত্র দেড় পৃষ্ঠায় (য. না., পৃ. ৪২-৪৩) তুলে ধরেছেন। তাঁর সেই বর্ণনায় কিছু অসংগতি আছে। তবে কিছু নতুন তথ্যও পাওয়া যায়। সেগুলো সত্য বলেই মনে হয়।

জাফরের সঙ্গে।[২] তাঁরা কয়েকজন সেনাপতিকে অর্থ, অন্য কয়েকজনকে ভূসম্পত্তি ও সম্পদ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেন। প্রলুব্ধ হয়ে তাঁরা শপথও গ্রহণ করেন। তাঁদের একাত্মতার ব্যাপারে তাঁরা গভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করেন। সাবিত জঙের অনুসারী আলি আসগর কোবরা[৩] শয়তানের মতো, এমনকি শয়তানের চেয়েও ক্ষতিকরভাবে তাঁদের মনে মিথ্যা সন্দেহের সৃষ্টি করে সাবিত জঙের সৈন্যদের নবাবের প্রতি আনুগত্য থেকে সরিয়ে আনেন। হাবিব উল্লাহ খান এবং মারাঠাদেরও দলভুক্ত করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। ফকির উল্লাহ বেগ খান ও নুর উল্লাহ বেগ খান এই ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে আলিবর্দিকে তা জানিয়ে দেওয়ার পর যথাসত্বর সম্ভব তাঁকে সেখানে আসার জন্য সংবাদ দেন। আলিবর্দি হায়দর আলি খান, দওয়ার কুলি খান ও সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট অংশ নিয়ে অবিলম্বে যাত্রা করেন। নবাবের আগমনবার্তা বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র চুরমার করে দেয়। তাদের ষড়যন্ত্র ভন্ডুল হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা একসঙ্গে বসে মন্ত্রণা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আলিবর্দির সেনাবাহিনীতে তাঁরা যোগ দেবেন এবং তিনি যেখানে যাবেন, সেখানেই তাঁরা তাঁর সঙ্গী হবেন। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান কর্নেল ক্লাইভ (সাবিত জং)[৪] অতিশয় নম্র ও বিনীতভাবে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু নবাবের কাছ থেকে তফাতে আসার পর তাঁর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই তিনি মুর্শিদাবাদে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি শাহামত জং ও বেগমদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এই বলে যে, নুর উল্লাহ বেগ খান তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁর কাছ থেকে নবাবের মনকে বিষিয়ে তুলেছেন, এবং তা করা হয়েছে তিনি কোনো অন্যায় না করা সত্ত্বেও।

গোলমাল মিটিয়ে ও বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে আলিবর্দি জলেশ্বর পরগনা থেকে রাজধানীতে ফিরে এসে নিশাতাগ [প্রাসাদে] বাস করতে থাকেন। শাহামত

---

২. মির জাফরের সঙ্গে আতাউল্লাহ খানের এই ষড়যন্ত্রের কথা *তারিখ*-এ নেই, যদিও *সিয়ার*-এ এ সম্বন্ধে বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪) আছে। করম আলির বর্ণনা যে সত্য, তাতে সন্দেহ নেই।

৩. এই মির আলি আসগর কোবরা সম্পর্কে *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০-২৫) সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। তিনি যে একজন ভণ্ড পীর ও ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন, তা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর পরম সৌভাগ্য যে, আলিবর্দি তাঁকে হত্যা না করে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন।

৪. আতাউল্লাহ খান সাবিত জং ছিলেন হাজি আহমদের কন্যা রাবেয়া বেগমের স্বামী। তাঁর পরিবারের সদস্যদের জোর সুপারিশে আলিবর্দি তাঁকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

জঙের সুপারিশে সাবিত জঙের অপরাধ বাহ্যত ক্ষমা করলেও তাঁর প্রতি তিনি তেমন আস্থা রাখতেন না। সাবিত জঙের সমর্থক আলি আসগর কোবরা[৫] ও ফকির খান আফগানকে তিনি রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। জীবন নিয়ে পালাতে পেরেছেন বলে তাঁদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁদের বহিষ্কারের কয়েক মাস পর ১১৫১ হিজরি (১৭৪৮ খ্রি.) সনে তিনি শমশির খান, সরদার খান, মুরাদ শির খান ও ভলিয়াদের বখশিকেও[৫] পদচ্যুত করেন। কারণ, তাঁদের বেতনের হিসাবে প্রতারণা ধরা পড়ে। নিজেদের গৃহে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবেই বিনা যুদ্ধে মস্ত বড় এক অনিষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়।

হয়বত জং নিহত : শমশির খান ও সরদার খান দারভাঙ্গাস্থ তাঁদের নিজের গৃহে ফিরে গেলে[৬] হয়বত জঙের[৭] মাথা বোকামিতে ভরা এক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হয়। খুব সাহসী যোদ্ধা মনে করে হয়বত জং তাঁদের তাঁর কাছে চলে আসার ও তাঁর অধীনে চাকরি করার আমন্ত্রণ জানান। এ কথা জানতে পেরে আলিবর্দি বারবার তাঁকে পত্র লিখে জানান যে, এই সেনাপতিরা অবাধ্য হয়ে গেছেন এবং চাকরিতে তাঁদের [পুনরায়] নিয়োগ করা তেমন ফলপ্রসূ কিছু হবে না। হাজি সাহেবও তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। আফগানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের মনোভাব জানার জন্য হয়বত জং তাঁর বিশ্বাসী অনুচর আশকর খানকে প্রেরণ করেন। হয়বত জং আফগানদের তাঁর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও তাঁর সেনাবাহিনীতে চাকরি নেওয়ার

---

৫. এই ঘটনা কিছু পরবর্তীকালে ঘটেছিল। কিন্তু তার আগে আলিবর্দি উড়িষ্যার নবনিযুক্ত নায়েব সুবাদার ও সেনাবাহিনীর বখশি মির মোহাম্মদ জাফর খানকে যে পদচ্যুত করেছিলেন, সেই বর্ণনা এখানে নেই।

৬. শমশির খান, সরদার খান ও অন্যান্য আফগান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাঠাদের সঙ্গে আলিবর্দির বিরুদ্ধে তাঁদের ষড়যন্ত্রের মোটামুটি বিশদ বর্ণনা *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ৬৭-৭০) এবং *সিয়ার*-এও আছে। এখানে করম আলি অতি সংক্ষেপে সে কথা উল্লেখ করেছেন। আগের বহু ঘটনার উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই।

৭. মির্জা মোহাম্মদের বংশধরদের মধ্যে আলিবর্দি ছাড়া একমাত্র জয়েন-উদ-দীনের চরিত্র উল্লেখযোগ্য ছিল বলে দেখা যায়। কিন্তু *সিয়ার*-এর বিশদ বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩১) ও *তারিখ*-এর সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বর্ণনা (*তারিখ-ই*, পৃ. ৭০-৭১) থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। প্রয়োজনবোধে সরফরাজ খানের সঙ্গে আলিবর্দি যে আচরণ করেছিলেন, সেরকম কিছু করার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিনিময়ে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তার পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলারও প্রায় অনুরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। সে যুগটাই বিশ্বাসঘাতকতার ছিল বলে দেখা যায়।

জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই প্রতারকের দল কোরআন[৮] হাতে নিয়ে বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করে।

তারা গঙ্গা নদীর ওপারে গেলে হয়বত জং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে প্রথমে একাই নৌকা করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তাদের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন ও তাদের প্রতিশ্রুতি আদায় করে তিনি তাদের নদীর এপারে আসার আদেশ দেন। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মিলে এই প্রতারকদের ১০ কি ১২ হাজারের একটি সৈন্যদল গঙ্গা নদী অতিক্রম করার পর হয়বত জঙের নির্দেশমতো জাফর খানের বাগানে এসে অবস্থান গ্রহণ করে।

কর্নেল ক্লাইভ (সাবিত জং) তাঁর ব্যর্থ উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এই জঘন্য ব্যক্তিদের আগমন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করবে—এ আশায় তিনি একজন গৃহভৃত্যের মারফত এই মর্মে পত্র দেন যে, সাক্ষাৎকারের সময় যেন হয়বত জংকে হত্যা করা হয়। এরপর আলিবর্দিকে খতম করা সহজ কাজ হবে।[৯] এই বিশ্বাসঘাতকেরা দেখতে পেল যে, বিনা যুদ্ধেই অতি কাম্য এই দেশ তাদের অধিকারে এসে যাবে।

সাক্ষাতের দিন এই প্রতারকদের মনে প্রতীতি জন্মানোর জন্য হয়বত জং [তাঁর দেহরক্ষী সৈন্যদল ছাড়াই] মনে স্বস্তি নিয়ে মসনদে উপবিষ্ট হন। আফগানরা তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়। সরদার খান ও ভলিয়াদের বখশি একদল সৈন্য নিয়ে দুর্গের বাইরে থাকেন। মুরাদ শির খান ২ হাজার সৈন্য নিয়ে [নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের অজুহাতে] '৪০ স্তম্ভ' ('চিহিল সেতান') অট্টালিকায় প্রবেশ করেন এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা না দেখে হয়বত জংকে হত্যা করেন।[১০]

আফগানরা হাজি সাহেবের অনুসন্ধান করে। ৯০ বছর[১১] বয়স্ক এই বৃদ্ধ লোকটি পায়ে হেঁটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আফগানরা তাঁকে ধরে ফেলে এবং বন্দী করে রাখে। তাঁকে এত যন্ত্রণা দেওয়া হয় যে, এর ফলে ১৫

---

৮. পবিত্র কোরআন হাতে নিয়ে শপথ করা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় মুসলিম শাসক ও সেনাপতিদের মধ্যে ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছিল বলে দেখা যায়। তাঁদের কেউই সেই শপথ পালন করেননি বলেও দেখা যাচ্ছে।

৯. আতাউল্লাহ খান সাবিত জং সম্পর্কে এই বর্ণনার সমর্থন *সিয়ার*-এও পাওয়া যায়। কিন্তু *তারিখ* রচয়িতার মতে, (*তারিখ-ই*, পৃ. ৮২-৮৩) এসব অভিযোগ ছিল মিথ্যা। *রিয়াজ*-এও অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ মোটেও মিথ্যা ছিল না। বিবেকবর্জিত আতাউল্লাহ খান বরাবরই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন।

১০. এখানে বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। *তারিখ* ও *সিয়ার*-এর বর্ণনা বিশদ।

১১. ঘটনার সময় হাজি আহমদের বয়স ৯০ বছর ছিল বলে বলা হলেও অন্যান্য স্থানের বর্ণনার সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ মনে হয় না।

দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু। আফগানরা সব নাগরিককে অত্যাচার করে। তাদের প্রতি অসম্মান দেখিয়ে জোর করে আদায় করে টাকা। তাদের প্রতিনিধিরাও জনগণের সীমাহীন অত্যাচার ও নিষ্পেষণ চালিয়ে অর্থ আদায় করে। উঁচু-নিচু সর্বস্তরের মানুষের কান্নায় আকাশ ভরে ওঠে।...আফগানরা তাদের আত্মীয়স্বজন ও গোষ্ঠীর লোককে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। চারদিক থেকে তাদের আগমনের ফলে এখানে প্রায় ১ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটে।

আলিবর্দির পাটনা অভিযান ও সরদার খান নিহত[১২] **:** ১১৬১ হিজরি (১৭৪৮ খ্রি.) সনে আলিবর্দি মারাঠাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বের হন। [পথিমধ্যে] হয়বত জঙের হত্যা, নবাবের ভ্রাতা ও কন্যার বন্দিদশার সংবাদ পেয়ে কৌশল হিসেবে নিরুপায় কান্নায়[১২] তিনি ভেঙে পড়েন। তাঁর সেনাপতিরা ঘটনার কথা শুনে এবং আলিবর্দির অবস্থার এত পরিবর্তন দেখে বলেন, 'এ ধরনের বিপদ থেকে আরও অনেক বিপদ জনগণের ওপর আসবে। এখন ব্যবস্থা গ্রহণের সময়, কান্নার সময় নয়।'[১৩]

আলিবর্দি তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের, তাঁদের মধ্যে অনেক আফগানও ছিলেন, প্রকৃত মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য বলেন, 'হয়বত জঙের মধ্যে আমার যে বাহুটি ছিল তা ভেঙে গেছে। আমার সেনাবাহিনীর বড় ধরনের বকেয়া বেতন পড়ে আছে। আমার রাজকোষে কোনো অর্থ নেই। অথচ কত বড় সংগ্রাম আমার সামনে উপস্থিত। এই অবস্থার প্রতিকার খুবই কঠিন হবে বলেই মনে হয়।'[১৩]

উঁচু-নিচু সবাই মনেপ্রাণে আলিবর্দির ভক্ত ছিলেন বলে তাঁদের সবাই একবাক্যে বললেন, 'আমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায় তা করতে আমরা কুণ্ঠিত হব না। আপনার কারণে আমাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে আমরা প্রস্তুত।'

প্রত্যেক সৈনিক ও প্রজা তাদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ প্রদানের কথা বলে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। জগৎশেঠ ছিলেন দেশের সবচেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী মহাজন। তিনি ৬০ লাখ টাকা আলিবর্দির হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

---

১২. এই অভিযানের বর্ণনা এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত। *সিয়ার* ও *তারিখ*-এর বর্ণনা থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। গ্রন্থকার ছিলেন তখন ১১/১২ বছরের বালক। নিশ্চয়ই তিনি *তারিখ, সিয়ার* ও অন্যান্য সূত্র থেকে তাঁর রচিত ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। সব কথা সঠিকভাবেও বলেননি। তবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, আলিবর্দির চরিত্রের একটা দিক, অর্থাৎ তাঁর নিপুণ অভিনয়পটুতা তিনি তুলে ধরেছেন। 'কৌশল হিসেবে তিনি নিরুপায় কান্নায় ভেঙে পড়েন'—এই উক্তির ভেতর দিয়েই তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

১৩. *সিয়ার* ও *তারিখ*-এ এ সম্পর্কে অন্য রকম বর্ণনা আছে।

'বর্তমানে শুধু এ টাকাই আমার গৃহে আছে।'[১৪]

আলিবর্দি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'এ পরিমাণ টাকা বর্তমানে আমার রাজকোষেই আছে। আমার আপাতত আপনার টাকার প্রয়োজন হবে না।'

পাটনা-আজিমাবাদ পুনরায় অধিকার করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ায় নবাব মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রেখে মনকরা থেকে পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হন।[১৫] তাঁর সৈন্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করলে সৈন্যরা তাতে উৎসাহিত হয়।

মির্জা দওয়ার কুলি[১৬] বেগের পুত্র বাহাদুর আলি খান ছিলেন আলিবর্দির বিশ্বস্ততম উপদেষ্টাদের অন্যতম। তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীও। এ সময় নবাব তাঁকে 'জিনসি' গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগার পদে নিয়োগ দেন। নবাবের বাহিনী পাটনা অভিমুখে কয়েক মাইল অগ্রসর হলে অনেক সেনাপতি বহু সৈন্যসহ যোগ দেন তাঁর সঙ্গে।

এ চার মাসে আফগানরা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মিলিয়ে প্রায় ২ লাখ লোকের একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আলিবর্দির অভিযানের কথা শুনে তারা আতঙ্কিত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে পড়ে। হাবিব উল্লাহ খান আফগানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'যাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, আপনাদের সেই প্রতিদ্বন্দ্বী একজন মহাবীর। আপনাদের সৈন্যসংখ্যা নিয়ে আপনারা খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী ও গর্বিত হবেন না।'

এসব কিছু বলার পরও তিনি আফগানদের সঙ্গে যোগ দেন।

মারাঠারা আলিবর্দিকে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে দেয়নি। তাদের [সৃষ্ট সম্ভাব্য] বিপদ এড়িয়ে তিনি নদীর তীর ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় রাজা সুন্দর সিংহের কাছ থেকে তিনি যে পত্রের জবাব পান, তাতে লেখা ছিল, 'আপনি যদি অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে আপনার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

রাজা সুন্দর সিংহ ছিলেন একজন মহান আমির।[১৭] আলিবর্দি মুঙ্গের পৌঁছালে

---

১৪. *সিয়ার* ও *তারিখ*-এ জগৎশেঠের মোটা অঙ্কের অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাবের কথা আছে, কিন্তু ৬০ লাখ টাকার কথা নেই।

১৫. *তারিখ*-এও অনুরূপ বর্ণনা আছে (*তারিখ-ই*, পৃ. ৭৪)।

১৬. মির্জা দওয়ার কুলি বেগ যে আলিবর্দির অন্যতম গৃহভৃত্য ছিলেন এবং দিল্লি থেকে যে হাজি আহমদের সঙ্গে উড়িষ্যা এসেছিলেন, সে কথা গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে।

১৭. উত্তর-পশ্চিম বিহার প্রদেশের এই সামন্ত নৃপতি ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী ও নবাবের অনুগত। তিনি গয়া অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। আগেও তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মিলিয়ে ১৫ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। আলিবর্দির অভিযানের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাছে নবাবের সৈন্য পূর্ণিয়া উপস্থিত হয়ে তাঁর রাজ্য বিনষ্ট করে—এই ভয়ে পূর্ণিয়ার ফৌজদার সাইফ খান[১৮] ১৮ সাবধানতা অবলম্বন করে শেখ দীনের অধীনে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঙ্গার দিকে (নবাবের সাহায্যার্থে) প্রেরণ করেন। আফগানদের একটি সেনাদল সেদিকে মোতায়েন ছিল। আলিবর্দি এক রাতে সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালালে তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং যোগদান করে কাছেই অবস্থানরত শমশির খান ও সরদার খানের সঙ্গে।

পাটনা থেকে দুই মঞ্জিল দূরে অবস্থিত সরাইরানিতে দুই বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সেখানে অবস্থিত একটি নালা অতিক্রম করে আফগানরা তাদের বিশাল বাহিনী বিন্যস্ত করে। আলিবর্দি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সওলত জংকে বাম দিকের বাহিনী দেওয়া হয়। ফকির উল্লাহ বেগ খান ও [দস্তি গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা] হায়দর আলি খানকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক করা হয়। বাম পাশের সমগ্র বাহিনীকে বখশি মির মোহাম্মদ জাফর খান ও রাজা সুন্দর সিংহের অধীনে রাখা হয়। নবাবের নিজের অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়কেরা ছিলেন রহম খান, দোস্ত মোহাম্মদ খান, ওমর খান ও বাহাদুর আলি খান। শেখ জাহান ইয়ার খানকে শিবির ও মালপত্র রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। ডান পাশের সমুদয় বাহিনী ছিল নদীর দিকে।

প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের আগে কামান-বন্দুকের গোলাগুলি নিক্ষেপের মাধ্যমে লড়াই শুরু হয়। নবাব ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময়ে প্রায় ১ লাখ মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য ঘুরে ঘুরে [পশ্চাতে অবস্থিত] নবাবের শিবির লুণ্ঠন করে। নবাবের যেসব সৈন্য আফগানদের তরবারির ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য পালিয়ে আসছিল, তারা দৈবক্রমে একে অন্যকে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল।

সদর-উল-হক খানের মাধ্যমে আলিবর্দি ফকির উল্লাহ বেগ খান ও হায়দর আলি খানকে আফগান বাহিনীর ডান দিকে যাওয়ার আদেশ দেন। তবে নদী থেকে বেশি দূরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে ফকির উল্লাহ বেগ খান মনে করলেন। কিন্তু হায়দর আলি খান আদেশটি সংগত মনে করে তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে শত্রুদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে

---

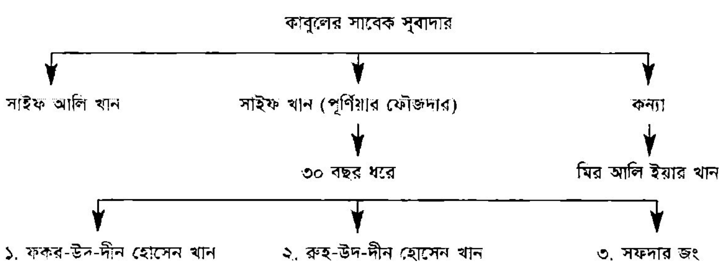
১৮. নবাব সাইফ খান ছিলেন পূর্ণিয়ার ফৌজদার। সম্ভ্রান্ত-বংশীয় এই ফৌজদার আইনত নবাবের অধীন হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে বলতে গেলে স্বাধীনভাবেই পূর্ণিয়ার শাসক ছিলেন। *সিয়ার* (২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬)-এর বর্ণনা মতে, তাঁর বংশলতিকা নিচে দেওয়া হলো।

শুরু করেন। বাহাদুর আলি খান পূর্ণ বিক্রমে গুলি বর্ষণ করতে থাকেন। একপর্যায়ে কামানের একটি গোলার আঘাতে সরদার খান নিহত হন। তাদের এত বড় নেতা হারানো সত্ত্বেও আফগানরা তরবারি ও ধনুক নিয়ে হায়দর আলি খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। কিন্তু হায়দর আলি খান বিদ্যুৎ-গতিতে তাদের ওপর এমন প্রবলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, আফগানরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃঢ়তা হারিয়ে পলায়নপর হয়ে ওঠে।

আফগানদের কম্পমান অবস্থা দেখে আলিবর্দি ওমর খান ও দোস্ত মোহাম্মদ খানকে আক্রমণ করার আদেশ দেন। এই দুই বীর তাঁদের সৈন্যসহ ত্বরিতগতিতে আফগানদের আক্রমণ করতে যান। কিন্তু অস্ত্র চালনা করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, আফগান বাহিনীর পরাজয় অত্যাসন্ন। তারা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে। দোস্ত মোহাম্মদ খান মুরাদ শির খানের মস্তক ছিন্ন করেন। মির্জা হাবিব বেগ শমশির খানের মস্তক ছিন্ন করে এনে আলিবর্দির পদতলে নিক্ষেপ করেন। নবাবের সৈন্যদলের শেখ জাহান ইয়ার খানের পৌত্র করিম বখশ ছাড়া আর কেউ মারাত্মক আঘাতের শিকার হননি। আফগানদের বিরাট বাহিনীর পরাজয় দেখে মারাঠারা তাদের তরবারি বা বর্শা ব্যবহার না করে তারা যে লুণ্ঠিত দ্রব্য অধিকার করেছিল, তা নিয়ে পালিয়ে যায়।

এই বিজয় লাভের জন্য আলিবর্দি [মাটিতে] হাঁটু গেড়ে বসে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর হারেমের মহিলা ও হয়বত জঙের শিশুসন্তানদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। আফগানরা বন্দী হিসেবে তাঁদের শিবিরে এনে রেখেছিল। আফগানদের বন্দিশিবির থেকে অন্যান্য বন্দীকেও মুক্ত করা হয়।

পূর্ণিয়ার সাবেক উমদাত-উল-মুলক আমির খান আলমগিরির বংশলতিকা :



নবম অধ্যায়

নবাব আলিবর্দির পাটনা থেকে বাংলায় আগমন ও সিরাজ-উদ-দৌলার পাটনায় পলায়ন

পাটনায় পৌঁছার পর আলিবর্দি পরাজিত অন্য মানুষজনের মতো আফগান সেনানায়কদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার করেননি, বরং এসব বিধবার জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু ভূমি রাজস্ব তিনি বরাদ্দ করেন। সিরাজ-উদ-দৌলা শমশির খানের কন্যাকে নিজের হারেমে নিতে চেয়েছিলেন। আলিবর্দি তাঁকে নিজের কন্যা বলে অভিহিত করে একজন বিশ্বাসী লোকের হেফাজতে তাঁকে নিজ গৃহে পাঠিয়ে দেন। সওলত জং বিহারের সুবাদারি প্রার্থনা করলে আলিবর্দি তা প্রত্যাখ্যান করে রাজা জানকীরামকে সে পদে নিয়োগ করেন। তিনি (জানকীরাম) তাঁর পুত্রের মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ উপদেষ্টা, সাহসী ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তা। সে যুগে সেই পরিবারে তাঁর মতো আর কেউ ছিলেন না।

সাইফ খানের মৃত্যুসংবাদ[১] শুনে আলিবর্দি সওলত জংকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার পদে নিযুক্ত করেন। রাজা সুন্দর সিংহ নিজের জীবন বিপন্ন করেও আন্তরিকতার সঙ্গে আলিবর্দির খেদমত করেন। আলিবর্দি তাঁকে 'নওবত'-এর অনুমতি ও অন্যান্য অনুগ্রহ প্রদান করেন। নবাবের নবনিযুক্ত সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অনুপস্থিত। গ্রন্থকারের পিতাকে[২] নবাব

---

১. পূর্ণিয়ার ফৌজদার সাইফ খান দীর্ঘ ৩০ বছর সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। গ্রন্থকার তাঁর সম্পর্কে কোনো বর্ণনা না দিয়ে তাঁর মৃত্যুর কথাই শুধু বলেছেন। সাইফ খানের পুত্রকে বঞ্চিত করে নিজের জামাতাকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্তি আলিবর্দির স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতার নগ্ন দৃষ্টান্ত।

২. এখানেও গ্রন্থকারের পিতার নামের উল্লেখ নেই।

সেই বাহিনী পরিদর্শন করার দায়িত্ব প্রদান করেন। সেনানায়কগণ সেসব নবনিযুক্ত সৈন্যকে তালিকাভুক্ত করার জন্য হাজির করার কাজ পিছিয়ে দিতে থাকেন এবং এ কাজে ধীরগতি সুবিধাজনক হবে বলে মনে করে আমার পিতা আদেশ পালনে বিলম্ব করে সময় কাটাতে থাকেন।

আলিবর্দি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করা কর্তব্য মনে করে নাসির আলি খান আমিনকে এই কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। অভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও এই কাজ সম্পাদন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ, নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল বৃষ্টিবিন্দু বা সাগরের ঊর্মিমালার চেয়েও বেশি। রাগ করে আমার পিতা সৈন্যদের এক বস্তাভর্তি তালিকাসংবলিত কাগজ নাসির আলি খানের গৃহে পাঠিয়ে দেন। নাসির আলি সৈন্যদের পরিদর্শন করে তালিকা প্রস্তুত করার চেষ্টা চালান। কিন্তু কেউ তাতে সম্মত হননি, বরং কেউ কেউ মনে কষ্ট পান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শেখ জাহান ইয়ার চাকরি ছেড়ে দিয়ে (নবাবের) অনুমতি নিয়ে নিজ গৃহে চলে যান। ফকির উল্লাহ বেগ খান ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়ে তাঁর সৈন্যদের হাজির করার দায়িত্ব থেকে রেহাই পান। একইভাবে[৩] ওমর খান, রহম খান প্রমুখ, সেই সঙ্গে আবদুল আলি খান বিহারের সুবা থেকে নির্বাসিত হন। আফগানদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব ও সাবিত জঙের সঙ্গে তাঁদের যোগসাজশ ছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

এভাবে বিহারের শাসনব্যবস্থার সমাধান করে এবং সেনাবাহিনী ও জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করে আলিবর্দি বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। নাগরিকদের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যেই তিনি সেখানে উপস্থিত হন।

যেসব লোক যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই গ্রন্থের রচয়িতাকে ঘোড়াঘাটে ফৌজদার[৪] পদে নিযুক্ত করা হয়। আতাউল্লাহ খানকে (সাবিত জং) বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়।[৫] এবারও শাহাম্মত জং ও বেগমেরা তাঁর জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। সাবিত জঙের বিবি ও হাজি সাহেবের চতুর্থ কন্যা রাবেয়া বেগম গর্ভবতী—এই অজুহাতে এসব মান্যগণ্য ব্যক্তি সন্তান প্রসবের পর তাঁকে পাঠিয়ে

---

৩. এ বাক্য ও পরবর্তী বাক্য বিভ্রান্তিকর বলে মনে হচ্ছে। আলিবর্দির ভাগনে আবদুল আলি খান মতানৈক্যের কারণে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বলে *সিয়ার*-এও উল্লেখ আছে (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১)। কিন্তু ওমর খান এবং রহম খান রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এমন বর্ণনা সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থে নেই।

৪. গ্রন্থকারের বয়স তখন ১২-১৩ বছরের বেশি ছিল না। এতে গুণের কদর নয়, আলিবর্দির স্বজনপ্রীতির দৃষ্টান্তই পাওয়া যাচ্ছে।

৫. পরিবারের সুপারিশ এবার আর নিকৃষ্ট প্রকৃতির সাবিত জংকে রক্ষা করতে পারেনি।

দেওয়া হবে বলে কিছুদিনের সময় প্রার্থনা করেন। এতে নবাব উত্তর দেন, 'এক্ষুনি এই নগর পরিত্যাগ করো, নইলে আমি নিজের হাতে তার পেট কেটে সন্তান বের করে আনব।'

সাবিত জঙের আর কোনো উপায় থাকে না। অনুতাপ ও ক্রন্দনের পর তাঁকে বাঙলা পরিত্যাগ করে অযোধ্যা যেতে হলো। সেখানে যাওয়ার কিছুদিন পর সেই রাজ্যের নায়েব সুবাদার রাজা নউল রায়ের সঙ্গে তিনি আফগানদের হাতে নিহত হন। তাঁদের নিজস্ব রক্ষীদল দিয়ে আফগানরা তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্পদসহ আলিবর্দির কাছে পাঠিয়ে দেন। এর মাধ্যমে তাঁরা তাঁর জন্য সাহায্য আশা করেন। আলিবর্দি তাঁকে দেখামাত্র তাঁর (রাবেয়ার) নিজ ভাগিনী বা সিরাজ-উদ-দৌলার জননীর পাশে বসতে আদেশ দিয়ে বলেন, 'আফগানদের নিষ্ঠুরতার কারণে তোমরা দুই বোন একই ধরনের শোকের শিকার হয়েছ!'

সিরাজ-উদ-দৌলার পাটনা পলায়ন ও অন্যান্য ঘটনা[৬] : আলিবর্দি তখন মারাঠাদের দমনের কাজে ব্যস্ত হয়ে এক অভিযানে গিয়েছেন। সৈয়দ মেহদি নিসার খানের প্রভাবে সিরাজ-উদ-দৌলা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেন।[৭] এই অবমাননাকর ঘটনার কথা শুনে আলিবর্দি সৈয়দ মেহদি নিসার খানকে সিরাজের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু তারুণ্যের অহংকার ও বালসুলভ বোকামির ওপর ভর করে সৈয়দ মেহদি নিসার খানকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা আলিবর্দির শিবির পরিত্যাগ করে পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হন। যেদিন সিরাজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যান, সেদিনই বিজ্ঞ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তা গোলাম হোসেন খান আরজ বেগি রাজা জানকীরামকে পত্রযোগে জানান যে, বিনা অনুমতিতে সিরাজ-উদ-দৌলা সৈয়দ মেহদি নিসার খানের সঙ্গে পাটনা যাচ্ছেন। যেভাবেই হোক না কেন সৈয়দ মেহদি নিসার খানকে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাটনাতে সিরাজের আগমনের দুই ঘণ্টা আগেই সেই পত্র রাজা জানকীরামের হস্তগত হয়।[৮] সিরাজ-উদ-দৌলা

---

৬. এ ঘটনা অনেক পরবর্তীকালের। শমশির খান, সরদার খান প্রমুখ আফগানের পরাজয় ও নিহত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। গ্রন্থকার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে এখানে তা খেয়াল-খুশিমতো তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় কিছু নতুন তথ্য আছে। সেগুলো সত্য বলেই মনে হয়।

৭. এটি একটি নতুন সংবাদ। *তারিখ, সিয়ার* ও অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থে সিরাজ-উদ-দৌলার মদে আসক্তির উল্লেখ নেই।

৮. এই তথ্যও *তারিখ* বা অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে নেই। অতিশয় প্রভুভক্ত গোলাম হোসেন আরজ বেগি ছিলেন আলিবর্দির আদি গৃহভৃত্যদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে এ বর্ণনা মিথ্যা না-ও হতে পারে।

যখন সেখানে পৌঁছান, তখন পর্যন্ত রাজা দুর্গরক্ষকদের সাবধান করে দিতে পারেননি। জানকীরাম এ সংবাদ জানার পর সৈয়দ মেহদি নিসার খানকে বন্দী করার জন্য যশোবন্ত নাগরকে প্রেরণ করেন। দলটিকে নগরের কেন্দ্রস্থলে দেখে যশোবন্ত সৈয়দ মেহদি নিসার খান ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের হত্যা করেন। তারপর সিরাজকে অতীব সম্মান ও যত্নসহকারে হাজি সাহেবের বাড়িতে নিয়ে যান। মোস্তফা কুলি খানকে[৯] দিনরাত ২৪ ঘন্টা সিরাজকে দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করে কোনোভাবেই তাঁকে চোখের আড়াল করতে নিষেধ করেন। সিরাজের প্রতি আলিবর্দির অতিশয় স্নেহের কারণে [তাঁর অদর্শনে] তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই পাটনায় এসে তিনি তাঁর দৌহিত্রকে আলিঙ্গন করেন। তাঁকে পিতৃসুলভ উপদেশ দেন। রাজা জানকীরামের প্রতি নবাব অশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁর কটিদেশে ব্যথার কারণে তিনি নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে যাত্রা করেন।

১১৬৩ হিজরি (১৭৪৯-৫০ খ্রি.) সনে সিরাজ-উদ-দৌলা মনসুরাগঞ্জ প্রাসাদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। তা ছিল বিশ্বের এক আশ্চর্যজনক নিদর্শন। বর্তমানে সেই প্রাসাদের কোনো চিহ্নই নেই। বর্তমান শাসনকর্তারা সেই প্রাসাদের ভিত্তিমূল পর্যন্ত খনন করে সেটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

১১৬৪ হিজরি (১৭৫১-৫২ খ্রি.) সনে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মারাঠাদের দূত আসে। কিন্তু হাবিব উল্লাহ খানের অত্যধিক দাবির কারণে সে সন্ধি হয়নি। ফখর-উৎ-তুজারের মাধ্যমে আলিবর্দি হাবিব উল্লাহ খানের কাছে ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন এই বলে যে, 'এ টাকা তাঁর গৃহে পাওয়া গিয়েছিল।' হাবিব উল্লাহ খান ভালো করেই জানতেন যে, এ অর্থ প্রেরণের পেছনে একটা চক্রান্ত ছিল। কিন্তু অর্থলোভে মারাঠা সরদারদের না জানিয়ে গোপনে তিনি সে অর্থ গ্রহণ করেন। মারাঠা নেতারা তাঁদের জন্য নির্ধারিত অর্থ দাবি করায় আলিবর্দি হাবিব উল্লাহ খান প্রদত্ত রসিদ দেখিয়ে বলেন যে, অবশিষ্ট অর্থ পরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ অর্থের কথা জানতে পেরে মারাঠারা হাবিব উল্লাহকে অর্থ অপহরণকারী বলে মনে করে। সেই সঙ্গে তাঁর কর্কশ বাক্যের কারণেও তাঁকে হত্যা করে।[১০] মারাঠাদের হাতে এই হতভাগার নিহত হওয়া ও মারাঠাদের মিত্র

---

৯. এ ঘটনা সম্পর্কে *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ১০১-১০৩) ও *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯) বিশদ বর্ণনা আছে। করম আলির বর্ণনার সঙ্গে এর বেশি মিল নেই। সেসব বর্ণনায় হাজি সাহেবের বাড়ির কথা নেই। মোস্তফা কুলি খান ছিলেন সিরাজের চাচাশ্বশুর। তিনি সে সময় পাটনায় ছিলেন।

১০. এ ব্যক্তির আসল নাম কী ছিল, তা জানা যায়নি। তবে এটি ছিল তাঁর উপাধি। সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালে এই ফখর-উৎ-তুজারের পরামর্শে সিরাজ কলকাতায় লুটপাট

সংঘের অবসান ঘটার সংবাদ পেয়ে আলিবর্দি আল্লাহর কাছে শোকর গুজারি করেন। তিনি উড়িষ্যা থেকে সরে এসে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন।[১১] তাদের তিনি বছরে ১২ লাখ টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল! সৈন্য প্রেরণ করে কোনো যুদ্ধ না করে কেবল মাথা খাঁটিয়েই তিনি এত বড় কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১২]

চালিয়েছিলেন। এ টাকা দেওয়ার ঘটনার কথা অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে নেই। তবে মির হাবিবকে হত্যা করার কথা আছে। কিন্তু তা অবশ্য অনেক পরের ঘটনা।

১১. এখানে গ্রন্থকারের বর্ণনা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে মির হাবিবই মারাঠাদের পক্ষে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন বলে *তারিখ* ও *সিয়ার*-এ উল্লেখ আছে।

১২. নির্লজ্জ চাটুকারিতার দৃষ্টান্ত।

দশম অধ্যায়

১৭৫২ ও ১৭৫৩ খ্রিষ্টীয় সাল[১]

ওমর খানকে[২] দাতব্য ভান্ডার থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁকে নিজের গৃহে গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়। একই বছরে হায়দর আলি খান[৩] ও ফকির উল্লাহ বেগ খান[৪] উভয়েই তাঁদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। হায়দর আলি খানের সরদারির হিসাব-নিকাশ দেওয়ার সময় আলিবর্দি বলেন, 'বন্ধুর চোখ সর্বদাই উজ্জ্বল।'

মির মোহাম্মদ জাফর খানকে বখশির পদ থেকে অপসারিত করে নবাব সেই উচ্চপদ কাবিজ আলি খানকে প্রদান করেন। এক দিন পর তিনি সে ব্যক্তিকেও অপসারিত করে খোয়াজা আবদুল হাদিকে[৫] সে পদে নিযুক্ত করেন।

১১৬৫ হিজরি (১৭৫১-৫২ খ্রি.) সনে আলিবর্দি সিরাজ-উদ-দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। প্রদান করেন তাঁকে রাজ্যের প্রশাসন ও রাজস্বের

---

১. কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা না করে গ্রন্থকার এখানে কতকগুলো বিক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

২. ওমর খান ছিলেন একজন বিখ্যাত আফগান সেনাপতি।

৩. নবাবের 'জিনসি' গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান [দারোগা] ছিলেন সেনাপতি হায়দর আলি খান। তিনি ছিলেন বহুল আলোচিত হোসেন কুলি খানের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতা (cousin)। তাঁদের উভয়কেই কিছুদিন পর সিরাজ-উদ-দৌলা নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এখানে ইংরেজি অনুবাদে সরদারি (sardari) বাঁকা ছাদের অক্ষরে (italic) আছে। এখানে সরদারি (سرداری) শব্দ সেনাপতিত্ব অর্থে ব্যবহৃত।

৪. ফকির উল্লাহ বেগ খান আদিতে ছিলেন আলিবর্দির খানজাদাহ ভৃত্যদের একজন। পরে সেনাপতি হন।

৫. খাজা আবদুল হাদি সামান্য অবস্থা থেকে যোগ্যতা দেখিয়ে বখশির পদ লাভ করেছিলেন।

ক্ষমতা। মেদিনীপুরের ফৌজদারির পদ দেওয়া হয় বিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও সাহসী রাজারাম হরকরাকে। কাজে ছিলেন তিনি তুলনাহীন। সিরাজ-উদ-দৌলার জীবদ্দশায় এ ব্যক্তি মারাঠাদের সব সীমান্তচৌকি থেকে রাজ্যকে পাহারা দিতেন।

একই বছরে শাহাম্মত জং[৬] আলিবর্দি নির্মিত মতিঝিল প্রাসাদে বসবাসের জন্য আগমন করেন। নবাবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ব্যাপারেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি মতিঝিল প্রাসাদকে এমনভাবে আলোকমালায় সজ্জিত করার আদেশ দেন, যা একজন চিন্তাশীল কর্মকর্তার পক্ষে শোভনীয়। কিন্তু আলিবর্দি এ ধরনের সমারোহ পছন্দ করতেন না। সুতরাং আলিবর্দির সম্মানে তিনি এক ভোজসভার আয়োজন করেন। আলিবর্দিকে তিনি সেখানে এসে 'ফাতিহা' পাঠ করার অনুরোধ জানান। সে বাগানে নবাবের আগমনের সময় এত কলরব হয় যে, প্রভাতে সূর্যোদয়ের কালের মতো পাখিরা তাদের নীড় ছেড়ে চলে যায়, সমস্ত মানুষ ঘুম থেকে জেগে ওঠে। উঁচু-নিচু সব স্তরের লোকের সঙ্গে আলিবর্দি বাগানে আসেন। সূর্যাস্তের সময় আলোকমালা ও ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুতকালে প্রদীপগুলো মানুষের চোখমুখ উজ্জ্বল করে তোলে।

এই আনন্দ-উৎসব ও প্রদর্শনীর সময় শাহাম্মত জং ও হাসান কুলি খান নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে আলিবর্দির পদতলে এনে হাজির করেন। কারণ, কিছুদিন আগে আলাইয়ার খানের নাকাড়া বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলার অপরাধে নবাব রুষ্ট হয়ে সিরাজকে তাঁর সামনে আসতে নিষেধ করেছিলেন। সিরাজের অপরাধ ক্ষমা করা হয় এবং নবাব তাঁকে আলিঙ্গন করেন।[৭]

আলিবর্দির সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে সেই বছরই সওলত জং পূর্ণিয়া থেকে আগমন করেন। মতিঝিল [প্রাসাদের] উদ্যানে 'হোলি' উৎসব পালনের ব্যবস্থা করায় শাহাম্মত জং তাঁর প্রিয় ভ্রাতাকে সেই আনন্দ উপভোগ করার জন্য সাত দিন রেখে দেন। গ্রন্থকার সেই আনন্দ-উৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন।[৮]

হোলি আনন্দ-উৎসবের সময় উদ্যানের তিন শতাধিক জলাধার রঙিন পানিতে পূর্ণ করা হয়। এগুলো থেকে চারদিকে 'অ্যাম্বার' (হলুদ রঙের স্বচ্ছ পাথর) ও 'জাফরন' (saffron)-এর স্তূপ আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে ছিল। প্রত্যহ

---

৬. এই বাক্যের মূল ফারসি পাঠ কী ছিল জানা নেই। ইংরেজি পাঠ 'In the same year Shahamat Jang who had come to the Motijhil palace garden–built by the Nawab–for enquiring into the health of Alivordi gave orders for the illumination of the palace...।' পাঠ খুব পরিষ্কার নয় বলে বাংলা অনুবাদও পরিষ্কার করা গেল না।

৭. এটি একটি নতুন তথ্য। সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না।

৮. কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নয়।

প্রভাতে ও অপরাহ্নে পাঁচ শতাধিক পরির মতো তরুণী চমৎকার পোশাক ও অলংকারে শোভিত হয়ে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে উদ্যানের বিভিন্ন কোণ থেকে বের হয়ে আসত।

১১৬৬ হিজরি সনের কিছু ঘটনা[৯]

(৮ নভেম্বর ১৭৫২ থেকে ২৮ অক্টোবর ১৭৫৩ খ্রি.)

[মরহুম নবাব] সরফরাজ খানের পুত্র শুকুর উল্লাহ খানের সঙ্গে শাহাম্মত জঙের (প্রকৃতপক্ষে সওলত জঙের) কন্যার বিয়ের বাগ্‌দান করা হয় কয়েক বছর আগে[১০]। এ বছর তাঁর ভ্রাতার আমন্ত্রণে বিয়ে ও উৎসবের সরঞ্জামাদিসহ সওলত জং পূর্ণিয়া থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন। ভারতীয় রীতি অনুসারে কনের বাড়িতে বরের আগমনকে 'সাচক[১১] দিবস' বলা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলার সহোদর ভ্রাতা ইকরাম-উদ-দৌলাকে শাহাম্মত জং পুত্ররূপে গ্রহণ করে হৃদয়ের সব ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করেন। (সাচকের দিন) তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সেদিনই প্রাণত্যাগ করেন।

বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। আনন্দ-উৎসব শোকে রূপান্তরিত হয়। বিয়ের জন্য প্রস্তুত প্রায় ১ লাখ টাকার দ্রব্যাদি বাজারের লোকজন লুট করে নিয়ে যায়। শোকে কাতর শাহাম্মত জং শয্যা গ্রহণ করেন। তাঁর বাকি জীবন শোকের মধ্যেই কাটে। তিনি শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন শুনে আলিবর্দি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। উঁচু ও নিচু সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের পরিধেয় জামা ছিন্ন করে তাঁর কাছে এসে তাঁর মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

[অবশেষে] শাহাম্মত জং নিজেকে শান্ত করেন। মতিঝিল [প্রাসাদের] উদ্যানে [ইকরাম-উদ-দৌলার] শবদেহ সমাহিত করা হয়। ৩, মতান্তরে ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে সেই সমাধি নির্মিত হয়। সেদিন থেকে শাহাম্মত জং আর কোনো দিন সে উদ্যানে যাননি।

সে বছরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল এরকম : আলিবর্দি খান সংবাদ

---

৯. পাদটীকায় উল্লেখিত ঘটনাবলির মতো এখানেও বিক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনা।

১০. শুকুর উল্লাহ খান ওরফে আকাবাবা ছিলেন প্রয়াত নবাব সরফরাজ খানের এক উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র। নবাবের মৃত্যুদিনে তাঁর জন্ম হলে নবাবের জ্যেষ্ঠা ভগ্নি ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়া নফিসা বেগম তাঁকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করেন। এ বিয়ের উল্লেখ *তারিখ* এবং *সিয়ার*-এও আছে।

১১. প্রকৃতপক্ষে তুর্কি ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় গৃহীত এ শব্দটির উচ্চারণ 'সাচক' (ساچق)। আধুনিক কালের 'গায়েহলুদ' অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থেও এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

পান যে, সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত কলন্তর নামের ঝিলে হরিণ, মোষ ইত্যাদি বন্য শিকারের পশু প্রচুর সংখ্যায় জমায়েত হয়েছে। নৌকায় চড়ে তিনি সেই সব পশু শিকারে যাত্রা করেন। 'নওয়ারা' বিভাগের কর্মকর্তারা নির্ভরযোগ্য নোঙর ও পাল সজ্জিত মজবুত জাহাজ এনে হাজির করেন। গোরাব, স্লুপ, বজরা, সমুয়া, পাতিলা, উলাখ, জালিয়া, ময়ূরপঙ্খি, ঘরদোর, কোষা, চলকর, ভাউলিয়া, পানসুহি, পলওয়ার[১২] ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নৌকার মিলিত সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ২ হাজার। এসব নৌকা সোনার ঝালর দেওয়া অলংকরণ-সজ্জিত ছিল।

সিরাজ-উদ-দৌলাকে সঙ্গে নিয়ে আলিবর্দি এ ভ্রমণ উপভোগ করেন। জনগণ এই মহিমান্বিত দৃশ্য দেখে আনন্দিত হয়। নবাব সেদিকে কয়েক মঞ্জিল অগ্রসর হলে শিকারের সময় কতগুলো অবিশ্বাসী লোক (খাওয়ারিজ)[১৩] আলিবর্দির নোঙর করা নৌকা লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করে।

কিন্তু তাতে তিনি আঘাত পাননি। পরে জানা যায়, সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশে এই নির্বোধ লোকগুলো এ কাজ করেছিল। আলিবর্দি মন্তব্য করেন, 'আমার সব পরিশ্রম এখন তারই হিতের জন্য। কিন্তু সে যখন আমার [জীবনের] মূল্য বোঝে না এবং আমার জীবন যে তারই জন্য এক মহালাভের বলে সে মনে করে না, এর চেয়ে আর ভালো কী হতে পারে যে, তার অভিলাষ পূর্ণ হোক এবং সময়ের উদ্বেগ থেকে আমি মুক্ত হই।'

সে বছরই (১১৬৬ হিজরি, ১৭৫৩ খ্রি.) সনে বিহারে নায়েব নাজিম রাজা জানকীরাম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর 'পেশকার' রাজা রামনারায়ণের হাতে তুলে দেন। তিনি নবাবকে লিখে যান যে, তাঁর পুত্ররা ছিল অযোগ্য। এ কর্তব্য পালনে অক্ষম। অতএব এ দায়িত্ব তিনি রাজা রামনারায়ণকে দিয়ে যান। আলিবর্দি নিজেও রামনারায়ণকে পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর এই নিয়োগ স্থায়ী করেন।

---

১২. বিভিন্ন ধরনের নৌকার তালিকা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এগুলোর অধিকাংশই, যেমন—গোরাব, সমুয়া, পাতিলা, উলাখ, জালিয়া, ময়ূরপঙ্খি, ঘরদোর, কোষা, চলকর, ভাউলিয়া, পানসুহি, পালওয়া ইত্যাদি যে দেশি নৌকা, তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। তবে 'স্লুপ' ইংরেজি sloop এবং বজরা ইংরেজি barge থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়।

১৩. আরবি 'খোওয়ারিজি' (خوارجی) শব্দের অর্থ 'heretics' = অবিশ্বাসী, বিশেষ করে যারা হজরত আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আলিবর্দির নয়নের মণি সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশে এই জঘন্য কাজটি করা হয়েছিল বলে করম আলি উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলিবর্দির আক্ষেপ বড়ই বেদনাদায়ক। এ দৃষ্টান্ত সিরাজের চরিত্রের অন্ধকার দিককে তুলে ধরেছে। আলিবর্দি যে তাঁকে মানুষ করতে পারেননি, তা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। অবশ্য এই ঘটনা যদিও নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক নয়।

একাদশ অধ্যায়

হত্যার চক্রান্ত ১১৬৭ হিজরি (২৯ অক্টোবর ১৭৫৩ থেকে ১৭ অক্টোবর ১৭৫৪ খ্রি.) সনের ঘটনাবলি

হাসান কুলি খানের[১] ওপর আলিবর্দি মনে মনে সন্তুষ্ট ছিলেন না বলে তিনি মির মোহাম্মদ জাফর খানের হিসাব পরীক্ষার জন্য আমার প্রয়াত পিতার[২] নথিপত্র হাসান কুলি খানের কাছে দেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তাঁর কঠিন হিসাব-নিকাশের কারণে সৈনিকেরা উত্তেজিত হয়ে তাঁকে প্রহার করবে। কিন্তু ঝামেলা বা শত্রুতা সৃষ্টির কোনো ইচ্ছাই হাসান কুলি খানের ছিল না। আমার প্রয়াত পিতার পেশকার মির মোহাম্মদের উপদেশ অনুসারে তিনি হিসাব পরীক্ষা শেষে ঘোষণা করেন যে, মির মোহাম্মদ জাফর খানের কাছে সরকারের প্রাপ্য আছে। হাসান কুলি খানের ধ্বংস সাধনে অকৃতকার্য হয়ে আলিবর্দি [এবার] মির মোহাম্মদ জাফর খানকে উৎখাত করার কাজে লেগে যান। মির জাফরের

---

১. *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩) ও *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ১১৫) এই আমিরের নাম হোসেন কুলি খান (حسین قلی خان); কিন্তু এ গ্রন্থে তাঁকে বারবার হাসান কুলি খান (Hasan Quli Khan) বলা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আলিবর্দির জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগমের অবৈধ ও অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি ঘসেটি বেগমকে পরিত্যাগ করে আলিবর্দির তৃতীয় কন্যা ও সিরাজ-জননী আমেনা বেগমের প্রতি আকৃষ্ট হন (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৪, ৫১ পাদটীকা)। সিরাজ-উদ-দৌলা খুব সম্ভব এ কারণেই তাঁকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আলিবর্দি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন সিরাজের ভবিষ্যৎ কণ্টকহীন করার অভিপ্রায়ে। কারণ, *সিয়ার*-এর বর্ণনায় আছে যে, আলিবর্দির মতে একমাত্র হোসেন কুলি খানই যোগ্যতার কারণে সিরাজ-উদ-দৌলার মসনদ অধিকারে সমর্থ ছিলেন।

২. গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকারের পিতা মৃত ছিলেন বলে গ্রন্থকার বারবার উল্লেখ করেছেন।

সৈন্যদের তাঁর কাছ থেকে বকেয়া বেতনের হিসাব চেয়ে সেই বেতন আদায় করে নেওয়ার কথা তিনি প্রকাশ্যে বলেন। সাধারণ সৈনিকেরা [তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে] মির জাফরের জীবন অসহনীয়, এমনকি বিপন্ন করে তুললে শাহাম্মত জং মির জাফরের সেনাদলের বেতন পরিশোধের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি তাঁর জীবন রক্ষা করেন। আলিবর্দি মনে মনে এ প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু দুর্নামের ভয়ে তা মেনে নেন। যে টাকা রিসালদার রসাল সিংহ ও জং বাহাদুরের–যাঁরা কালনতার ঝিলে [আলিবর্দিকে] আক্রমণের মূলে ছিলেন–কাছ থেকে প্রাপ্য বলে হিসাব অনুসারে প্রমাণিত হয়, তা আদায়ের জন্য আলিবর্দি তাঁদের দিওয়ানখানায় আটক করে রাখেন। এই দুই সেনানায়কের সারা দিন এভাবে কাটলে সন্ধ্যার দিকে তিনি রসাল সিংহকে সামনে হাজির করিয়ে বলেন, 'আপনাদের বকেয়া বেতন আদায়ের জন্য কী গন্ডগোলই না আপনি পাকিয়েছিলেন। এখন সরকার আপনার কাছে যে অর্থ পান, তা পরিশোধ করতে বিলম্ব করছেন কেন?'

লোকটির মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছিল বলে তিনি নির্ভীকভাবে এই রূঢ় উত্তর দেন যে, 'আপনার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে যে কাজ আমরা করেছি, তার পুরস্কার আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে চাই এবং আমাদের সঙ্গেও আপনি যে ব্যবহার করেছেন, তার প্রতিদান আপনি তাঁর কাছ থেকেই পাবেন।'

এসব কথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে তাঁকে হত্যা করার জন্য আলিবর্দি আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মির জাফর নামের নবাবের দেহরক্ষীদের একজন এই অবস্থা দেখে রসাল সিংহকে হিংস্রভাবে তাঁর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন। তারপর দুজন একে অন্যের কাঁধ ধরে মাটিতে পড়ে যান। সামনে দাঁড়ানো প্রহরীদের মধ্যে একজন বরকন্দাজ তাঁদের লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে এবং একই গুলির আঘাতে দুজনই নিহত হন। জং বাহাদুরের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে আলিবর্দি তাঁকে মুক্ত করে দেন।[৩]

ওই বছর মির মোহাম্মদ আব্বাস আলি খান নামে মির মোহাম্মদ জাফর খানের এক আত্মীয় হাসান কুলি খানের ভৃত্যদের একজনের হাতে নিহত হন। আলিবর্দি [মনেপ্রাণে] এ দুজন কর্মকর্তার [মির জাফর ও হাসান কুলি খান] মধ্যে একজনের মৃত্যুর পরিকল্পনা করে মির মোহাম্মদ জাফর আলি খানকে এ নিয়ে

---

৩. এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার আলিবর্দির চরিত্রের অন্ধকার দিকই তুলে ধরেছেন এবং সঠিকভাবেই। অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে আলিবর্দির চরিত্রের এই অন্ধকার দিক এত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়নি। পরে আলিবর্দির চরিত্রের এ দিকটির আরও বিশদ বর্ণনা আছে।

হইচই করতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সাহস না থাকায় মির মোহাম্মদ জাফর খান কেবল আব্বাস আলির হত্যাকারীদের ডেকে এনে নিহতদের আত্মীয়স্বজনের হাতে তাঁকে নিধন করার জন্য তুলে দেন।[৩]

এ বছরই সিরাজ-উদ-দৌলা একটি অবিবেচনাপ্রসূত কাজ করেন। এর ফলে একটি গোপনীয় পরামর্শ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পুণ্যাহ[৪] অনুষ্ঠানের দিন সিরাজ-উদ-দৌলা হাসান কুলি খানকে হত্যা করার জন্য বরখোরদার বেগ নামের এক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই কর্মব্যস্ততার দিন রাজস্ব কর্মকর্তা, জমিদার, বণিক, কেরানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেই আহম্মক আলিবর্দিকে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, 'আপনি যদি আদেশ দেন, তাহলে আমি তাঁকে নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিই।'

কথাটা তাঁর শ্রুতিগোচর হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে আলিবর্দি নজর[৫] গ্রহণের ব্যাপারে ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন। তিনি বরখোরদারের দিকে তাকিয়েও দেখেননি। এমন ভাব করেন যে, এতে করেই সে বুঝতে পারবে যে, তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, প্রবাদবাক্যে আছে যে, 'নীরবতা অর্ধসম্মতি'। বোকা লোকটি দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন উত্থাপন করলে নবাব বুঝতে পারেন যে, গোপন কথা প্রকাশিত হয়ে গেছে, কিন্তু কার্য উদ্ধার হয়নি। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বরখোরদারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'দরবার থেকে বের হয়ে যাও।'

দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিদের তিনি কিছু মিষ্টি ও সুন্দর কথা এমনভাবে বললেন যে, প্রত্যেকেই মনে করলেন, এ ব্যবস্থা তাঁরই জন্য গৃহীত হয়েছে। এ ব্যাপারে আর কোনো অনুসন্ধান হয়নি।

এ ব্যবস্থা তাঁদের জন্য করা হয়েছে, এ কথা চিন্তা করে জগৎশেঠ দরবার ত্যাগ করে যেতে চাইলে আলিবর্দি কর্কশভাবে চিৎকার করে বললেন, 'মহোদয়গণ, আসন গ্রহণ করুন। আমি এখনো জীবিত আছি।'

সিরাজ-উদ-দৌলা সম্বন্ধে যা বলা উচিত প্রকাশ্য দরবারে তিনি তা বললেন। অপমানিত হওয়ার কারণে শাহাম্মত জং কিছুদিন দরবারে আসা থেকে বিরত থাকেন। তাঁকে দরবারে ডেকে আনা হলো। আলিবর্দি সিরাজ-উদ-দৌলাকে একজন বালক, অজ্ঞ, আহাম্মক ও পাগল বলে অভিহিত করেন এবং এভাবেই

৪. বাংলা নববর্ষের দিন জমিদাররা যে প্রজাদের কাছ থেকে বকেয়া রাজস্ব আদায় করে থাকেন, সেই প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। নবাবের দরবারেও তা প্রচলিত ছিল। এটিকে পুণ্যাহ বলা হতো। সংস্কৃত পুণ্য শব্দ থেকে উদ্ভূত পুণ্যাহ শব্দের অর্থ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য। শাস্ত্রমতে, প্রশস্ত দিন।

৫. পুণ্যাহর দিন প্রজারা নবাবকে যে অর্থ প্রদান করত, তাকে 'নজর' বলা হতো। তবে এ নজর প্রজাদের বাদশা সুবাদার প্রমুখকে অন্য বিশেষ সময়ও দেওয়ার বিধান ছিল।

শাহাম্মত জঙের মানসিক অবস্থাকে শান্ত করেন। সেদিন থেকে জগৎশেঠ ভ্রাতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এরপর তাঁরা দুভাই আর কোনো দিন একসঙ্গে দরবারে উপস্থিত থাকবেন না।[৬]

১১৬৮ হিজরি সনের ঘটনাবলি (১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১১৬৮ হিজরি সনে [ইরানি] নববর্ষ নওরোজের দিনে সিরাজ-উদ-দৌলা আলিবর্দির কাছ থেকে নিজের গৃহে যাচ্ছিলেন। এ সময় শাহাম্মত জং নির্মিত ইমামবাড়ার ফটকের ভেতর থেকে কয়েকজন বাহলিয়া তাঁকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে। [সেই] গুলি তাঁর পালকির আচ্ছাদন ভেদ করলেও আল্লাহ শাহজাদাকে রক্ষা করেন। এই বন্দুকধারীরা সিরাজ-উদ-দৌলার ঘনিষ্ঠ লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, দোস্ত ও দুশমনকে চিহ্নিত করা যায়নি। নিছক সন্দেহবশত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হয়। কিন্তু কেউ এ অপরাধের স্বীকারোক্তি করেননি। সিরাজ-উদ-দৌলা সে সময় তোপখানার দারোগা ছিলেন। এসব বন্দীর মুক্তির জন্য হাজারিরা এবং একদল সৈন্য তাদের বেতন সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য সিরাজ-উদ-দৌলার বাড়ি ঘেরাও করে, তাঁর বাড়ির ছাদ ও দেয়ালে চড়াও হয়ে তাঁর গৃহে খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তিন দিন পর আলিবর্দি নিজেই সিরাজের বাড়িতে যান। বন্দী লোকদের মুক্ত করে দিয়ে তিনি গোলমাল মিটিয়ে ফেলেন। এ গোলমাল হাসান কুলি খান পাকিয়েছিলেন বলে সন্দেহ করে সিরাজ-উদ-দৌলা আগের চেয়ে আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে তাঁকে শাস্তিদানের সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

---

৬. সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে গ্রন্থকারের বক্তব্য অত্যন্ত খাপছাড়া মনে হচ্ছে। ঘটনার আগাগোড়া কিছু না বলে গ্রন্থকার এখানে এবং এর আগেও যেসব উক্তি করেছেন, তাতে কোনো সামঞ্জস্য নেই। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ই বা হঠাৎ করে কেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, সে কারণও এখানে বা অন্যত্র বর্ণিত হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, জগৎশেঠদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যে, বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল এঁদের পেশা। এঁরা বিনা কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে এঁদের প্রভু নবাব সুজা খানের পুত্র সৎ ব্যক্তি সরফরাজ খানকে সরিয়ে আলিবর্দিকে সুবাদারের গদিতে বসিয়েছিলেন। তাঁরই দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকেও গদিচ্যুত করেছিলেন মির জাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

দ্বাদশ অধ্যায়

হাসান কুলি খানের ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকার কিল্লাদার আহসান-উদ-দীন খানকে হত্যা

সিরাজ-উদ-দৌলার জন্মের পর থেকেই আলিবর্দি তাঁকে তাঁর মন সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁকে নিজের সঙ্গছাড়া করেননি। সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনিক কলাকৌশল, সেই সঙ্গে জনসাধারণের একজন প্রশাসকের যেসব অপরিহার্য মহৎ গুণ থাকা প্রয়োজন, আলিবর্দি সে সম্পর্কে তাঁকে শিক্ষা দেন। কিন্তু সিরাজ যেসব অপকর্ম করেন, সেগুলো আলিবর্দি যেন দেখেও দেখেননি, শুনেও যেন শোনেননি—এমন ভাবই তিনি দেখান। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালান্তর ঝিলে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার উল্লেখ করা যেতে পারে। সিরাজের চলার পথে যেসব কাঁটার অস্তিত্ব আলিবর্দি কল্পনা করেন, তার সবই যেন তাঁর স্নেহময় হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে। সেগুলোকে সরানো তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।...সিরাজের কথা না ভেবে তিনি একমুহূর্তও থাকতে পারতেন না। কিন্তু তাতে কি ভালো ফল হয়েছিল?

[সিরাজের প্রতি] হাসান কুলি খানের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের ধারণা আলিবর্দির হৃদয়ে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। দূরে ও কাছে সর্বত্র তা মানুষের কানে পৌঁছে যায়। আগা বাকেরের[১] পুত্র মোহাম্মদ সাদেক ছিলেন ঢাকার একজন ঊর্ধ্বতন

---

১. মুনশি সলিমউল্লাহ রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালা* গ্রন্থে (পৃ. ৯১) 'বাকের খান কেলান' (باقر خان کلان) অর্থাৎ প্রথম বা জ্যেষ্ঠ বাকের খানের উল্লেখ আছে। দ্র. পৃ. ৯১। তাঁর নামেই যে ঢাকার বিখ্যাত 'বাকরখানি' রুটির নামকরণ হয়েছিল, সে কথাও বলা হয়েছে। তাঁর পৌত্র

কর্মকর্তা। তাঁর কাছে প্রাপ্য ৩ লাখ টাকার জন্য হাসান কুলি খান তাঁকে [মুর্শিদাবাদে] কয়েক মাস বন্দী করে রাখেন। আলিবর্দির ইঙ্গিতে অথবা নিজের দুষ্টবুদ্ধির প্রভাবে তিনি কয়েদখানা থেকে পলায়ন করে নদীপথে দুদিনের মধ্যেই ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। অনতিবিলম্বে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকজন পুরোনো ও নতুন পোষ্যব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি [ঢাকার] দুর্গরক্ষক [কিল্লাদার] আহসান-উদ-দীন খানকে হত্যা করতে যান। উন্মাদ রোগে[২] আক্রান্ত হয়ে আহসান খান তখন জড়বুদ্ধি মানুষের মতো অসহায় অবস্থায় শায়িত ছিলেন।

সে রাতে দুর্গ প্রহরার কাজে নিযুক্ত ছিলেন আরব আলি খান ও তাঁর পুত্র মির

(نبیره = নবিরাহ) আহসান উল্লাহ খান নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সময়ে (১৭১৭-২৭ খ্রি.) হুগলীর ফৌজদার ও নবাবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই আগা বাকেরের বংশধরই (খুব সম্ভব প্রপৌত্র) ছিলেন দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের সময়, অর্থাৎ ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়ী ও পরবর্তীকালে সেখানকার ফৌজদার আগা সাদেক। এঁদের কথা ওয়েবস্টার (Mr. Webster) রচিত *ত্রিপুরা জেলার গেজেটিয়ার* (পৃ. ১০৮) এবং আ. কা. মো. যাকারিয়া সম্পাদিত *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস* (পৃ. ৩৫২) গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এখানে উল্লিখিত আগা বাকের ও আগা সাদেক ভিন্ন ব্যক্তি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের পর উদয়পুরের (ত্রিপুরা রাজ্য) ফৌজদার আগা সাদেক বেঁচে ছিলেন না। তাঁর পুত্র মির্জা ইবরাহিম বেগ ছিলেন বলদাখালের জমিদার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রস্তুত রেকর্ডে তাঁকেই বলদাখালের জমিদার হিসাবে দেখা যায়। তাঁর বংশধরদের বিস্তারিত বর্ণনা কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস* এবং আ. কা. মো. যাকারিয়া সম্পদিত *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস* গ্রন্থে (পৃ. ৩৫২) তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের আগা বাকের ও তাঁর পুত্র আগা সাদেক ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। আজাদ আল হোসায়নি রচিত *নও বাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি* গ্রন্থে (য. না., পৃ. ৪) চট্টগ্রামের যে ফৌজদার বাকের খানের কথা বলা হয়েছে, খুব সম্ভব তিনিই ছিলেন সেই বাকের খান। তাঁর তখন (১৭৫৩-৫৪ খ্রি.) বৃদ্ধ হয়ে পড়ার কথা এবং বৃদ্ধ ছিলেন বলেও সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায়। তিনি ছিলেন সাবেক বাকেরগঞ্জ জেলার বুজুর্গ উমেদপুর পরগনার জমিদার। তিনি প্রভূত সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নামানুসারেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাকেরগঞ্জ জেলার নামকরণ করা হয়েছিল। এখনো (১৯৯৬ খ্রি.) বরিশাল জেলায় তাঁর নামে বাকেরগঞ্জ নামের একটি থানা আছে। সেখানে প্রথমে বাখরগঞ্জ জেলা সদর ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থ অনুসারে আগা সাদেক ও মিরজাই ছিলেন তাঁর দুই ছেলেসন্তান। অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, আগা মেহদি নামের তাঁর এক পুত্র এবং কাতাসিন বেগম নামে তাঁর এক কন্যা ছিলেন। চাখারের বিখ্যাত মজুমদার পরিবার সেই কাতাসিন বেগমেরই বংশধর।

২. ইংরেজি পাঠে বন্ধনীতে 'জন্নুন' (jannun) শব্দ আছে। আরবি 'জন্নুন' (جنون) শব্দের এক অর্থ 'insanity, lunacy, fury, frenzy'—এখানে এ অর্থেই ব্যবহৃত।

মখু। আগা সাদেকের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব থাকার কারণে তাঁরা দুর্গের ফটক খুলে দেন। মর্যাদাহীন এই লোকটি[৩] বিনা অস্ত্র প্রয়োগে দুর্গে প্রবেশ করে শয্যায় শায়িত সেই অসহায় ব্যক্তিকে হত্যা করে। তারপর তার সামনে দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করে সে চিৎকার করে কাছের ও দূরের মানুষকে বলতে থাকে যে, সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশে সে এ কাজ করেছে।[৪] দুদিন পর নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁর (আহসান-উদ-দীন) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে জানতে পারেন যে, জঘন্য এ ব্যক্তি এ কাজ করেছে। অসামরিক কর্মকর্তা ও চাকরিজীবীগণ উত্তেজনা প্রশমনের জন্য একত্র হয়ে দুর্গ ঘেরাও করেন। জঘন্য এই ব্যক্তির দলের লোকজন দুর্গের তোরণ বন্ধ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ধনুকের থেকে তির ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকে। এক প্রহরকাল ধরে যুদ্ধ চলার পর আগা বাকের ও তাঁর পুত্র মিরজাই বন্দুকের গুলিতে নিহত হন।[৫] এরপর মোহাম্মদ সাদেক দরবেশের ছদ্মবেশ ধারণ করে দুর্গের এক কোণ দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যান। এ বিজয়ের পর নগরের লোকজন আগা বাকেরের ছিন্ন মস্তক হোসেন কুলি খানের কাছে প্রেরণ করে। এ ছিন্ন মস্তক আলিবর্দির কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করেন :[৬]

'হে নিহত ব্যক্তি, তুমি কাকে হত্যা করেছিলে যে আজ তুমি নিহত হয়েছ?
যে আজ তোমাকে হত্যা করেছে, কাল সে নিহত হবে।'

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে হোসেন কুলি খান শোকে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর জন্য বহুক্ষণ ধরে ক্রন্দন করেন। তিনি নিজে গিয়ে ওই সব খুনির শাস্তি বিধান করবেন—এ সিদ্ধান্তই সমীচীন বলে তিনি বিবেচনা করেন। তাঁর উত্তম আচারব্যবহারের কারণে বাঙলার উচ্চ-নীচ সর্বস্তরের লোক,

---

৩. আগা সাদেক।

৪. *তারিখ* গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। কিন্তু *সিয়ার*-এর বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩) থেকে জানা যায় যে, সিরাজের আদেশে আগা সাদেক এ কাজ করেছিলেন। সেখানে আছে : 'Seraj-ed-daulah engaged him to return to Dacca in order to kill Husen-ed-din qhan, nephew to Hussen Cooly qhan, and the latters Deputy to Dacca a young man who for some reasons, had fallen into a melancholy that had disordered his senses.'

৫. ইংরেজি পাঠে এখানে বন্ধনীতে 'মোহরা-ই-তোফাং' (Muhara-i-tufang) শব্দদ্বয় আছে। ফারসি মোহরা-ই-তোফাং (مهره تفنگ) শব্দের অর্থ বন্দুকের গুলি।

৬. স্যার যদুনাথ কবিতার যে ইংরেজি পাঠ দিয়েছেন, তার ফারসি পাঠ নিম্নরূপ হতে পারে :

کی کشته که را کشتی کمروز تورا کشتند

Kai kushtah Keh-ra kushti keh-imroj tura kushtand?

فردا بکشند او را که امروز تورا کشته است

Farda bekushand ura k. x imroz tura kushta ast.

বিশেষ করে, শাহাম্মত জঙের নিজস্ব লোকজন, এমনকি আলিবর্দির নিজের সৈন্যদের মধ্যেও কয়েকজন তাঁর সঙ্গী হতে চায়। সে সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, আগা বাকেরকে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

সংসারধর্মের পূর্ণ অভিজ্ঞতা আলিবর্দির ছিল। কী করে হাসান কুলি খানের পতন ঘটাতে পারবেন, সে বিষয়ে কয়েক বছর ধরে তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করছিলেন। শঠতার আশ্রয় নিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় কন্যা ও শাহাম্মত জঙের স্ত্রীকে কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তোমার ভৃত্যরা যদি হাসান কুলি খানের পথে যেত এবং সিরাজ-উদ-দৌলা যদি তোমার মনে আঘাত দেওয়ার জন্য কিছু করে বসত, তাহলে কী ঘটনা ঘটত? তোমার ভৃত্যদের বিরূপ কার্যাবলি থেকে তুমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছ যে, তারা তোমার অনুগত নয়। পশ্চিমাকাশে প্রায় অস্তমিত সূর্যের মতো তোমার অবস্থা। এখন ভেবে দেখো, আমার অবর্তমানে তুমি কেমন করে বেঁচে থাকবে, তুমি কী করবে?'[৭]

তাঁর কন্যা এসব কথা শাহাম্মত জঙের কাছে পুনরাবৃত্তি করেন। সমুদয় ব্যাপারটা তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে হাসান কুলি খানের প্রতি তাঁর মন বিরূপ করে তোলেন।[৮] তাঁর অনুচরদের কাছে বারবার ক্রোধ প্রকাশ করে ও তাদের ভীতি প্রদর্শন করে শাহাম্মত জং তাদের হাসান কুলি খানের গৃহে যেতে নিষেধ করে দেন। আলিবর্দির ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁর বখশি ও হাসান কুলি খানের আত্মীয় শের ইয়াজদান খানকে পদচ্যুত করে জামাল-উদ-দীন আলি খানকে সে পদে নিয়োগ দেন। একই কারণে তোপখানার দারোগাকে অপসারিত করে খাদেম হোসেন খানকে সে পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর অধীনে কর্মরত হাসান কুলি খানের আরও অনেক আত্মীয়কে বরখাস্ত করে তাদের জায়গায় অন্য লোককে নিযুক্ত করেন।

হাসান কুলি খানের সর্বদাই সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্য কোনো চাকরি নয়, শুধু আলিবর্দির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা। তিনি এখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, অবসর গ্রহণ করে তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় আল্লাহর ইবাদত

---

৭. ঘসেটি বেগমের ভৃত্যরা হোসেন কুলির সঙ্গে ঢাকা যেতে চেয়েছিল বলেই বোধ হয় আলিবর্দি এ মন্তব্য করেছিলেন।

৮. আলিবর্দির এই নসিহত কতটুকু কার্যকর হতো, তা বলা কঠিন। কিন্তু *সিয়ার*-এর মূল পাঠ ও ইংরেজি অনুবাদের টীকাকারের বর্ণনা মতে হোসেন কুলি সে সময়ে ঘসেটি বেগমকে পরিত্যাগ করে তাঁর বোন আমেনাকে নিয়ে মেতে ওঠার কারণেই খুব সম্ভব ঘসেটির প্রতিহিংসা জেগে উঠেছিল এবং সে কারণেই তিনি আলিবর্দির প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন।

করে কাটিয়ে দেবেন। এ সময় তাঁর ভ্রাতা হায়দার আলি খান[৯] ছাড়া আর কোনো সঙ্গী না থাকায় তিনি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন।

দূরদর্শিতার কারণে আলিবর্দি তাঁর গোপন চিন্তার কথা শাহাম্মত জংকে এভাবে বলেন, 'গুরুদায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা সিরাজের নেই। তার [কর্কশ] বাক্য দ্বারা সে অন্যায়ভাবে মানুষের মনে আঘাত দেয়। আমার অবর্তমানে কিছুদিনের মধ্যেই সে এ রাজ্য ধ্বংস করে ফেলবে। নিজেকে ধ্বংসকারীদের হাতে তুলে দেবে। তাকে ছাড়া তোমার বা আমার আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। বিজ্ঞ হোসেন কুলি খান ছাড়া আমি এমন আর কাউকে দেখি না যে সিরাজের প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করতে পারে। অতএব হোসেন কুলি খানকে রেহাই দেওয়া আমি সুবিধাজনক বলে মনে করি না। এতে [আমাদের বিরুদ্ধে জনগণের মনে] অবিশ্বাস সৃষ্টি হবে, হলেও সরিয়ে ফেলা ছাড়া আমাদের আর কোনো প্রতিবিধান নেই।'

[হোসেন কুলিকে হত্যা করার ব্যাপারে] শাহাম্মত জঙের অনুমতি আদায় করে আলিবর্দি তা সিরাজকে জানিয়ে দেন। সিরাজ হোসেন কুলির রক্তের জন্য পিপাসিত ছিলেন।[১০] হোসেন কুলির দলভুক্ত বলে যাদের সন্দেহ করা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আলিবর্দি শিকারের অজুহাতে রাজধানীর বাইরে চলে যান।[১১]

সেদিন রাত আরম্ভ হওয়ার পরই সিরাজ তাঁর খালার (ঘসেটি বেগম) বাড়িতে গিয়ে পীড়াপীড়ি করে এই হত্যার অনুকূলে অনুমতি লাভ করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি হোসেন কুলির গৃহদ্বারে এসে থামেন। সিরাজের আদেশে তাঁর অনুচররা গৃহে প্রবেশ করে হোসেন কুলির ভ্রাতা হায়দার আলি খান এবং শাহাম্মত খানের 'আরজ বেগি' হাজি মেহদির বাড়ি থেকে হোসেন কুলি খানকে সিরাজের সামনে নিয়ে আসে। তাঁর সহজাত সাহসিকতার কারণে হায়দর আলি খান মুখ খুলে জীবন বাজি রেখে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন, সেগুলোর উল্লেখ করেন। হোসেন কুলি খান অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে 'আল্লাহর কারখানা'র দৃশ্যকে চিন্তিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে কেঁদে ফেলেন।

---

৯. জিনসি গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান হায়দর আলি খান ছিলেন হোসেন কুলি খানের বড় ভাই (খুব সম্ভব আপন চাচাতো ভাই)। কিছুদিন আগে তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় হোসেন কুলির সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন।

১০. কারণটা ছিল খুব সম্ভব ওপরে ৮ টীকায় বর্ণিত তাঁর জননী আমেনা বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলির সম্পর্ক।

১১. *সিয়ার*-এর বর্ণনা মতে (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪) আলিবর্দি শিকারের অজুহাতে রাজমহলের দিকে চলে গিয়েছিলেন, যাতে এ ব্যাপারে কেউ তাঁকে জড়াতে না পারে।

আল্লাহর বিধানকে হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে তিনি আল্লাহর উপাসনার কাজে মত্ত থাকেন। তাঁদের কথায় কান না দিয়ে সিরাজ তাঁদের হত্যার আদেশ দেন। অবিলম্বে তাঁর আদেশ পালিত হয়। এ দুজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে এভাবেই হত্যা করা হয়।[১২]

গ্রন্থকারের বিশ্বাস, হোসেন কুলি খানের জীবন যেদিন শেষ হয়, আলিবর্দির সৌভাগ্যের প্রখর সূর্য সেদিন থেকেই নিষ্প্রভ হতে থাকে।

এদিক থেকে আলিবর্দির মন নিশ্চিত হলে, এত দিন পর্যন্ত মির মোহাম্মদ জাফর খানের 'রিসালায়' যেসব লোক কর্মরত ছিল, সেখানকার প্রায় তিন শ লোককে আলিবর্দি বরখাস্ত করেন এবং উল্লিখিত রিসালার প্রতি তাঁর যে বিশ্বাস ছিল, তা তিরোহিত হয়।

সবারত খানকে ঢাকার কিল্লাদার নিযুক্ত করে আলিবর্দি দিওয়ান রাজা রাজবল্লভকে সেখানে প্রেরণ করেন আগা বাকেরের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য। নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়ে তাঁর গৃহ থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা সরকারের তহবিলে আসে।[১৩]

ইংরেজদের প্রতি শত্রুতার কারণে সে বছর ফখর-উৎ-তুজার আলিবর্দিকে বলেন, 'আপনি যদি এ দেশ থেকে ইংরেজদের বের করে দিতে চান, তাহলে কলকাতা থেকে আপনার সরকার ৩ কোটি টাকা লাভ করবে।'[১৪]

[উত্তরে] আলিবর্দি বলেন, 'হাজার হাজার মুসলমান ও বিধর্মীর রক্তপাত করে আমি ১২ বছরে ভূমির ওপরের অগ্নি নির্বাপিত করেছি। তুমি এখন চাও যে, সাগরের অগ্নি জ্বালিয়ে আমি বিক্ষোভের সৃষ্টি করি যাতে সমগ্র হিন্দুস্থানের স্থল ও জলের সব ঐশ্বর্য শেষ হয়ে যাক।'

তাঁকে তিরস্কার করে তিনি আরও বলেন, 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমি যদি জয় লাভ করি, তাহলে মানুষ আমাকে এ বলে নিন্দা করবে যে, আমি আমার রাজ্যের বণিকদের (সম্পদ) লুণ্ঠন করেছি। আর, খোদা না করুন, আমি যদি পরাজিত হই, তাহলে আমার রাজ্যের প্রজাদের কাছ থেকে আমি শুধু কলঙ্কের

---

১২. *তারিখ*-এ এ ঘটনার বর্ণনা নেই। কিন্তু *সিয়ার* (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪-২৫)-এর মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে। খুব সম্ভব করম আলি *সিয়ার* থেকেই তাঁর বর্ণনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। দুই বর্ণনায় যথেষ্ট মিল আছে। 'দুজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা'—এই অভিমত সমসাময়িক সব গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

১৩. এটি একটি নতুন তথ্য বলে মনে হচ্ছে। অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে এ বর্ণনা নেই।

১৪. এ ব্যক্তি সিরাজ-উদ-দৌলাকে এই প্রলোভন দেখিয়েই তাঁকে কলকাতা আক্রমণ ও লুণ্ঠনে প্রলুব্ধ করেছিলেন বলে দেখা যায়। সে ঘটনা পরে দ্রষ্টব্য।

অভিশাপই কুড়াব।'[১৫]

সিরাজ-উদ-দৌলাকে এ কাহিনি বলে তিনি তাঁকে তাঁর শেষ উপদেশ দিয়ে বলেন যে, সিরাজ যেন কোনো দিন কারও উপদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কাজ না করে।[১৬]

শাহাম্মত জঙের মৃত্যু: ১১৬৯ হিজরি সনের ১৩ রবিউল আউয়াল (১৭ ডিসেম্বর[১৭] ৫৫ খ্রি.) রোগে আক্রান্ত হয়ে শাহাম্মত জং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ইচ্ছানুসারে মতিঝিল উদ্যানে ইকরাম-উদ-দৌলার সমাধির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। যেদিন থেকে আলিবর্দি তাঁর জন্য শোক পালন শুরু করেন, সেদিন থেকে প্রতিদিনই তিনি কোনো-না-কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকেন। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে প্রায়ই বলতেন, 'আহ্, এ পরিচ্ছদটি খুবই গরম।'

শাহাম্মত জঙের অধীনে দিওয়ানের ও অন্য যেসব দায়িত্ব ছিল, তার সবই যেন তাঁর স্ত্রী সম্পাদন করেন, সে আদেশই নবাব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে (ঘসেটি বেগম) পিতৃসুলভ দয়া দেখান। মতিঝিলে বসবাস করার অনুমতি নিয়ে ঘসেটি বেগম তাঁর আসবাবপত্র ও অনুসারীদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে সেখানে চলে যান।

তাঁর গভীর দুঃখ সত্ত্বেও সে সময়ই আলিবর্দি মোরগের লড়াই দেখার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তিনি সভাসদদের বেদনার সঙ্গে (প্রায়ই) বলতেন, 'এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারে অচিরেই ধ্বংস নেমে আসবে। কারণ, যাঁরা ক্ষমতাবান ছিলেন, তাঁদের সবাই আমার আগেই চলে

---

১৫. মারাঠাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করে আলিবর্দি তাঁর নবাবি আমলের প্রায় সারাটা সময়ই অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর এ উক্তি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেননি বলে মেনে নিতে হবে।

১৬. যদি এ কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সঠিক কথা বলেননি। একচক্ষু হরিণের মতো তিনি অদূরদর্শী ছিলেন বলতে হবে। মারাঠারা বাঙলা মুলুক থেকে চৌথ আদায় করলে বা এ দেশ অধিকার করলে দেশটির স্বাধীনতা বিপন্ন হতো না। আলিবর্দি বোধ হয় ইংরেজ কোম্পানির শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতেন না অথবা জানার চেষ্টাও করেননি। তাই মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করে তিনি তৃপ্ত ছিলেন।

১৭. এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। তবে অন্ধ স্নেহের কারণে তিনি যে সিরাজকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেননি, সে কথা সত্য। তবে এ সত্য তাঁর কাছে বোধ হয় ধরা পড়েনি। সিরাজের অধঃপতনের জন্য আলিবর্দির অন্ধ স্নেহই যে দায়ী ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অমানুষটির সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য আলিবর্দি যেসব জঘন্য কাজ করে গেছেন, তা ক্ষমার অযোগ্য।

গেছেন।'

শাহাম্মত জঙের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পর পূর্ণিয়া থেকে সংবাদ আসে যে, সওলত জং মৃত্যুবরণ করেছেন।

সওলত জঙের মৃত্যু : প্রশাসনের ছোটখাটো কাজ করার ব্যাপারে সরল প্রকৃতির হলেও তিনি (সওলত জং) পুণ্যবান লোক, পবিত্র মানুষ, বিদ্বান ও প্রথিতযশা ব্যক্তিদের পোষণ করতেন[১৮] এবং পবিত্র ধর্মীয় আইনের উন্নতি বিধান করতেন। ইসলাম ধর্মকে তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। দানের ব্যাপারে তিনি আর সব শাসনকর্তাকে অতিক্রম করেন। রাজ্যের দূর বা নিকটবর্তী স্থান থেকে যা আসত, তা হিসাব নিরীক্ষক বা রক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়েই তিনি দান করে দিতেন। তাঁর ভাই শাহাম্মত জঙের মৃত্যুর দিন কয়েক পরই তাঁর ঘাড়ে একটি ফুসকুড়ি দেখা দেয়। কোনো চিকিৎসক তা নিরাময় করতে পারেননি।

অবশেষে মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে তিনি তাঁর পুত্রদের কাছে ডেকে এনে তাঁর শেষ নির্দেশের কথা বলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শওকত জংকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। পুত্র, বন্ধু ও সাহায্যকারীদের বিদায় জানিয়ে তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

শওকত জং তাঁকে জাফরিবাগ গ্রামে সমাহিত করেন। আলিবর্দি খান তাঁর জন্য গভীর শোক পালন করেন। তিনি পূর্ণিয়াতে একটি শোকের খিলাত ও তাঁর (সওলত জং) জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষেকের জন্য একটি সনদ প্রেরণ করেন। গ্রন্থকারের মাতা একই স্থানের ছিলেন বলে তাঁর মাধ্যমে এসব বস্তু ও শোকবার্তা প্রেরণ করা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের পক্ষে যে সান্ত্বনাবাণী দেওয়া সম্ভব, সেই শোকবাণীতে তা-ই ছিল।

১৮. এ বর্ণনার সঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিকের অভিমতের মিল দেখা যায় না। গ্রন্থকারের বর্ণনা যে এখানে একদেশদর্শী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যু

সুজা-উল-মুলক হোসাম-উদ-দৌলা মো. আলিবর্দি খান মহাবত জঙের মৃত্যু : অতিশয় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আলিবর্দি হাকিম আবদুল হাদি খানের হাতে চিকিৎসার জন্য নিজেকে সোপর্দ করেন। তাঁর কাছে গ্যালেন ও টলেমির মতো বিজ্ঞ চিকিৎসককেও হাঁটু গেড়ে বসতে হতো। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যাধিসমূহের মধ্যে যা শেষ ব্যাধি তার নিরাময় করতে পারে না। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী জেনে তিনি (আলিবর্দি) সিরাজ-উদ-দৌলাকে ডেকে এনে বললেন, 'আমার মৃত্যু সন্নিকটে। তোমার কাছে আমার শেষ উপদেশ, তোমার শত্রুদের দমন করতে এবং বন্ধুদের মর্যাদা রাখতে সমস্ত অন্তর দিয়ে তুমি চেষ্টা করবে। দেশের জনগণের অবস্থার উন্নতি বিধান এবং অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দমন করার জন্য তোমাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাতেই তোমার জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে কেটে যাবে। রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে একতা ও সহযোগিতার ওপর। কলহ ও বিরোধিতা এর ধ্বংস টেনে আনে। তোমার প্রশাসনকে যদি ঐকমত্য ও আনুগত্যভিত্তিক করতে চাও, তাহলে আমার নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য তোমাকে দৃঢ় হতে হবে। তাতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তুমি তোমার শত্রুদের কবল থেকে নিরাপদ থাকবে। আর তুমি যদি কলহ ও বৈরিতার পথ অনুসরণ করো, তাহলে রাজ্যের সুনামের এত অবনতি ঘটবে যে, সুদীর্ঘকাল ধরে মর্মপীড়া ও অনুতাপ সেখানে বিরাজ করবে।'

১১৭০ হিজরি সনের ৯ রজব শুক্রবার দিন (প্রকৃতপক্ষে ১১৬৯ হিজরি সন, ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল) জোহরের নামাজের সময় আল্লাহর একত্বের বাণী (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) উচ্চারণ করে তিনি তাঁর প্রাণ আল্লাহর কাছে সমর্পণ

করেন। সর্বজনীন শোক ও ক্রন্দন[১]। তাঁর জননী যে খোশবাগে সমাহিত, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মহান আল্লাহ! তিনি (আলিবর্দি) ছিলেন বিস্ময়করভাবে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। কারণ, তাঁর তিরোধানের পর বাঙলা রাজ্য থেকে সমৃদ্ধি চলে যায়। তাঁর সুবিচারের মাধ্যমে যে বিশৃঙ্খল অবস্থাকে[২] তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন, তা (তাঁর মৃত্যুর পর) সঙ্গে সঙ্গে আপন অবস্থায় ফিরে আসে।

বাঙলার নগর (মুর্শিদাবাদ) তাঁর সময়ে দৈর্ঘ্যে ১২ ক্রোশ ও প্রস্থে ৭ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। তার ওপর বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি নগরের বাইরে বিলাস-গৃহ নির্মাণ করেছিলেন।[৩] (এখানে) ১২ জন লোক সকাল-সন্ধ্যা নওবত[৪] বাজানোর অধিকারী ছিলেন। উঁচু ও নিচু বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ, সব শ্রেণির কারিগর এবং দক্ষ শিল্পী ও বিদ্বান লোক এই নগরে সমবেত ছিলেন।

এ সময়ে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মিলিয়ে প্রায় ১ লাখ লোক রাজকোষ থেকে তাদের বেতন ও ভরণপোষণের অর্থ পেত।

---

১. অনুবাদক মূলপাঠের পূর্ণ অনুবাদ দিয়েছেন কি না বলা যাচ্ছে না। তবে বাক্যটি অসমাপ্ত।

২. আলিবর্দির ক্ষমতা দখলের আগে রাজ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না। যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা ঘটেছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং একজন নিরীহ লোককে হত্যা করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করার পরই। তিনি ছিলেন বেজায় স্বার্থপর। তাঁর দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহমদকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে চাকরি দেওয়ার অভিপ্রায়ে নফিসা বেগমের কাছে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি সরফরাজ খানের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানকে যুদ্ধে হারিয়ে সেই দেশ অধিকার করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর অধিকৃত রাজ্যে বিশৃঙ্খলার শুরু। শেষ পর্যন্ত চুক্তির মাধ্যমে তাকে উড়িষ্যা ছেড়ে দিতে হয় বহু অর্থদণ্ড দিয়ে। তিনি হোসেন কুলি খানকে হত্যা করিয়েছিলেন সিরাজের কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। কিন্তু ১৫ মাসের মধ্যেই সিরাজ রাজ্য হারান ও নিহত হন।

৩. মুর্শিদাবাদ নগরীর ঐশ্বর্য আলিবর্দির সময়ে কতটুকু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেই ইতিহাস করম আলি বা সমসাময়িক অন্য কোনো ঐতিহাসিক বলে যাননি। তবে নগরের কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি যে হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়।

৪. ১২ জন লোকের গৃহে 'নওবত' বাজানোর দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় যে, সে সময়ে নগরে উচ্চপদস্থ আমির-উমরার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

আলিবর্দির চরিত্র

আলিবর্দি খানের সুবিচারের প্রতি নিষ্ঠা, হৃদয়ের মাহাত্ম্য, ক্ষমাশীলতার প্রবণতা ও সাহসিকতা সম্বন্ধে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

একদিন সিরাজ-উদ-দৌলা এসে বললেন, 'সরকারি কর্মকর্তাদের[১] গৃহে অনেক অর্থ জমা হয়েছে। আপনার অর্থের প্রয়োজন। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে ১ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারি। ব্যাপারটাকে আদৌ তাঁরা ক্ষতিকর বলে মনে করবেন না।'

আলিবর্দি উত্তর দিলেন, 'এ দেশের মানুষের কাছে যে অর্থ আছে তা আমারই সম্পদ। আমিই তা তাঁদের কোষে জমা দিয়েছি। সে অর্থ অন্যায়ভাবে হস্তগত করার জন্য দৃষ্টিপাত করার ধৃষ্টতা কার আছে!'

খালিসা ভূমির দিওয়ান রাজা কিরাত চাঁদ বেশ কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গৃহ থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করার জন্য সিরাজ-উদ-দৌলা একদল নাজির প্রেরণ করেন। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র আলিবর্দি নিজে সেখানে অশ্বারোহণ করে ছুটে যান এবং সিরাজ-উদ-দৌলার যে খোয়াজাটি এ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য এসেছিল, তাকে যথেষ্ট প্রহার করে তাড়িয়ে দেন। তিনি প্রয়াত ব্যক্তির বিধবা ও সন্তানদের খিলাত প্রদান করেন। তারপর তাঁদের মন শান্ত করে প্রাসাদে ফিরে আসেন। সিরাজ-উদ-দৌলাকে তাঁর কাছে ডেকে এনে তিনি বলেন

---

১. স্যার যদুনাথ প্রদত্ত ইংরেজি পাঠে 'Civil officers' শব্দদ্বয়ের পর বন্ধনীতে mutsa addi and ahi-kar (متصدی , اهلکار) শব্দ দুটি আছে।

: [কবিতা][২]

তোমার দুয়ার থেকে [নালিশকারীরা] আমার কাছে ছুটে আসে,
আল্লাহ্ সব গোপন কথা জানেন, তারা তাঁর কাছে যায় না।
পৃথিবীর মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হয়ো না,
পাছে তাঁদের প্রার্থনা আকাশে গিয়ে পৌছায়।

সিরাজ-উদ-দৌলা [একদিন] আলিবর্দিকে বললেন, 'বর্ধমানের রাজার দিওয়ান রাজা মানিক চাঁদের গৃহের স্তম্ভের ওপর নির্মিত দ্বারমণ্ডপ (portico) আমার প্রাসাদের সম্মুখভাগে বলে তা আমার গৃহের অবাধ দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করে। আমার গৃহের সামনে থেকে আমি তা অপসারণ করতে চাই।'

আলিবর্দি উত্তর দিলেন, 'তুমি একটি অতি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করেছ এবং তাতে মানিক চাঁদের গৃহের উঁচু অংশের দৃষ্টিপথ ব্যাহত হয়েছে, ফলে এই দরিদ্র লোকটি তোমার কারণে অসুবিধায় পড়েছেন। তোমার তো আরও অনেক প্রাসাদ আছে। তোমার উচিত তাঁর গৃহের সম্মুখে তুমি যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছ, তা ভেঙে ফেলা, যাতে তিনি স্বচ্ছন্দে সেখানে বসবাস করতে পারেন।'

রাত্রিকালে রাস্তায় টহল দেওয়ার সময় কিশোয়ার খান আজিজ সিরাজ-উদ-দৌলার একটি গাড়িতে চড়ে তাঁর গৃহে যাওয়ার সময় ফয়জা বাইকে নগরের একটি পুলিশ ফাঁড়িতে আটক করে রাখেন। সে রাতেই তাকে মুক্ত করার জন্য সিরাজ-উদ-দৌলা অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে তিনি সফলকাম হননি।

পরদিন প্রভাতে সিরাজ-উদ-দৌলা অনতিবিলম্বে বিষয়টি আলিবর্দির গোচরীভূত করে আশা করেন যে, কিশোয়ার খানকে শাস্তি প্রদান করা হবে। নবাব মন্তব্য করেন, 'মধ্যরাতে কিশোয়ার খান কী করে জানবেন যে সেই ব্যক্তিটি কে ছিল এবং কী ছিল। এই ধরনের ঘটনা (অর্থাৎ আইনভঙ্গের দৃষ্টান্ত) দেখেও না দেখার কারণেই চোর ও অপরাধীদের সাহস বেড়ে যায়।'

---

২. স্যার যদুনাথ কবিতার ফারসি পাঠ দেননি। তিনি যে ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

'From your door [plaintiffs] come away to me,
They do not go to God who knows all secrets,
Do not be hard on the people of the earth
Lest their prayer should reach the sky.'

এ কবিতা কার রচনা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এর আগে আগা বাকেরের মুণ্ড দেখে আলিবর্দি একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। সেটি কে রচনা করেছিলেন, তা-ও গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। এই সব কবিতা যদি আলিবর্দির রচনা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় যে, তিনি সত্যিই বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

সে সময়ে বাঙলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঐশ্বর্যের (সম্পদের) সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকেরা রাজদরবারে আসতে থাকেন। তখন সিরাজ-উদ-দৌলা ও শাহাম্মত জং অতি উচ্চমূল্যে সেই বণিকদের কাছ থেকে মূল্যবান নানা দ্রব্য ক্রয় করতে থাকেন। অপবাদকারীরা তাঁদের এই অপব্যয় সম্পর্কে অভিযোগ করলে আলিবর্দি উত্তর দেন, 'আমার রাজ্যে এঁদের (বিদেশি বণিকদের) কাজ হচ্ছে তাঁদের পণ্য বিক্রি করা।'

অপবাদকারীরা প্রশ্ন করেন, 'পৃথিবীতে কি বস্তু চিরস্থায়ী হবে?' (মূল পাণ্ডুলিপিতে ফাঁক আছে বলে স্যার যদুনাথ উল্লেখ করেছেন।)

নবাব উত্তর দেন, 'তোমরা যা বলেছ তা সত্য নয়। কারণ, সম্মানের খ্যাতি ও সদ্‌গুণের যশ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।'

নবাবের কাছে অভিযোগ করা হলো যে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ বিয়ের উৎসব ও অতিথি আপ্যায়ন অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'সদকা' দেওয়ার সময় যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেছিল, এ সবই ছিল সরকারের অর্থ। আলিবর্দি উত্তর দিলেন, 'যাঁরা এসব কাজ করেছেন, তাঁরা আমার সুনাম বাঁচিয়ে রাখছেন। কিন্তু তোমরা আমার প্রকৃত দুশমন। কারণ, তোমরা চাও যে আমার নাম ও সুখ্যাতি পৃথিবীতে টিকে না থাক।'

মতিঝিলের দারোগা মির্জা আলি নকির প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে শাহাম্মত জং তাঁকে সেই পদ থেকে বরখাস্ত করতে চাইলে আলিবর্দি তাঁকে বলেন, 'প্রথম দিনই তাঁর সদ্‌গুণ বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা তোমার কর্তব্য ছিল। এখন যদি তাঁকে চাকরিচ্যুত করো, তাহলে জনগণ তোমার সম্বন্ধে তাদের মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলবে।'

ঢাকা থেকে শাহাম্মত জঙের নৌকাভর্তি মালপত্র আসছিল। শুল্ক বিভাগের দারোগা মির্জা হাকিম বেগ শুল্ক আদায়ের জন্য সেসব দ্রব্য আটক করেন। শাহাম্মত জং নবাবের কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'আমি তো বণিক নই যে তারা আমার কাছে কর দাবি করতে পারে।'

আলিবর্দি বলেন, 'এগুলোর ওপর ধার্য করের পরিমাণ কত হবে?'

মির্জা হাকিম বেগ উত্তর দিলেন, '১ লাখ টাকা।'

আলিবর্দি বললেন, 'পুত্র আমার, জীবন আমার, তুমি এত উঁচু মূল্যে এসব দ্রব্য যখন আনতে পেরেছ, তখন সরকারের প্রাপ্য করও দিতে পারো। এ ব্যাপারে যদি রাগান্বিত হও তবে এ কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তারাই দুর্বল হয়ে পড়বেন।'

এ গ্রন্থের রচয়িতা ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিল। আলিবর্দির কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই আমি পূর্ণিয়ায় সওলত জঙের কাছে চলে যাই। সেখানে

রাঙামাটির ফৌজদার নিযুক্ত হই। খালিসা ভূমির পেশকার ভৈরদত্ত নবাবের কাছে অভিযোগ করেন যে, ঘোড়াঘাটের ফৌজদার অনুপস্থিত। নবাবের অনুমতি ছাড়াই তিনি স্থান ত্যাগ করেছেন। তাঁকে চাকরিতে রাখা বা না রাখার ব্যাপারে তিনি নবাবের আদেশ প্রার্থনা করেন। আলিবর্দি উত্তর দেন, 'আমি জানি যে সওলত জঙের সঙ্গে তার বনিবনা হবে না। অনতিবিলম্বেই সে আমার কাছে ফিরে আসবে। তার বেঁচে থাকার উপায়ের কথা চিন্তা না করে আমি পারি না। সুতরাং অল্প কিছুদিনের জন্য তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ঠিক হবে না। কারণ, আমার চরিত্রের অকপটতার ওপর সে নির্ভর করে থাকবে।'

তাঁর রাজত্বকালে দেশের প্রত্যেকটি অসহায় মানুষ ও প্রত্যেক বিধবা আলিবর্দির দানে প্রতিপালিত হতো। সে সময় কোনো চোর বা ডাকাতের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়নি। যদি কোনো ব্যক্তির দ্রব্যাদি পথে পড়ে থাকত, তবে প্রকৃত মালিক না আসা পর্যন্ত কেউ সেদিকে চোখ তুলে তাকাত না। আজ প্রতিটি ব্যাপার এর বিপরীত। এই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে [পৌরাণিক পাখি] ফিনিক্সের মতো (সেই অবস্থা) অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। অত্যাচারীর দল মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। মানুষ ও পশু পথগুলো এত বিপজ্জনক করে তুলেছে যে, ঘর থেকে বের হওয়া, এমনকি সেখানে অবস্থান করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।[৩]

বিহারের নায়েব নাজিমগিরি ছাড়াও বাঙলায় আলিবর্দির রাজত্বকাল ছিল ১৭ বছর কয়েক মাস।

---

৩. এখানে আলিবর্দির গুণাবলির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন। তবে শেষ অনুচ্ছেদে কোনো ব্যক্তির কোনো বস্তু রাস্তায় পড়ে থাকলেও প্রকৃত মালিক না আসা পর্যন্ত কেউ তা স্পর্শ করত না, গ্রন্থকারের এ বক্তব্য সঠিক ছিল বলে ধরা যায় না। কারণ, সওলত জঙের কন্যার সঙ্গে সরফরাজ খানের পুত্র আকাবাবার বিয়ের সময় লাখ লাখ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি বাজারের লোকেরা লুট করে নিয়েছিল বলে গ্রন্থকার নিজেই সেই বিয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন।

গ্রন্থকার আলিবর্দির গুণাবলির অনেক প্রশংসা এখানে করলেও অন্যত্র তাঁর চরিত্রের অনেক দুর্বলতার দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হোসেন কুলি খানের হত্যার ব্যাপারে আলিবর্দির চরিত্রের অন্ধকার দিকের বর্ণনা গ্রন্থকার অকপটে তুলে ধরেছেন। আলিবর্দির হাতে নিরপরাধ রসাল সিংহের হত্যার (পরিচ্ছেদ ১১) বর্ণনাও গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন। একই পরিচ্ছেদে হোসেন কুলি খান ও মির মোহাম্মদ জাফর খানের মধ্যে অন্তত একজনকে হত্যা করার চক্রান্তের কথাও গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন। এরকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত আছে। আলিবর্দির আত্মীয়, তাঁর গৃহে পালিত এবং অশেষ রকমে অনুগৃহীত হলেও গ্রন্থকার আলিবর্দির চরিত্রের এসব ত্রুটি উল্লেখ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে সত্য ভাষণ করেছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্ব

সিরাজ-উদ-দৌলার প্রশাসন : মনসুর-উল-মুলক অভিধাধারী সিরাজ-উদ-দৌলা[১] ১১৭০ হিজরি সনের ১৫ রজব (প্রকৃতপক্ষে ১১৬৯ হিজরি, ১৫ এপ্রিল ১৭৫৬ খ্রি.) প্রশাসনের মসনদে[২] বসেন। বিশাল সৈন্যবাহিনী ও দর্শকের উপস্থিতি ছিল এ উৎসবে।

অভিষেকের আনন্দ-উৎসব ও সংগীতাদির অবসান হলে তিনি দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা ছিল না এমন কয়েক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান এবং আলিবর্দি খানের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি 'সরদারদের' বিরুদ্ধে তাঁরা কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে তাঁর মন শুধু সরিয়ে আনেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে সন্দেহেরও সৃষ্টি করেন।[৩]

---

১. তাঁর নাম ও উপাধি ছিল মনসুর-উল-মুলক শাহ কুলি খান মির্জা মোহাম্মদ সিরাজ-উদ-দৌলা। এ অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি অসমাপ্ত।

২. 'মসনদ' শব্দের যে অর্থ *সিয়ার*-এর ইংরেজি টীকাকার (*সিয়ার-ই*, ১ম খণ্ড) দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, তার অর্থ সিংহাসন-জাতীয় বিশেষ আসন।

৩. এ ঘটনা সত্য। তবে মির জাফর, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম প্রমুখ আমির যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে সিরাজ যে মোহনলাল, মির মদন প্রমুখ নতুন একদল সরদারের সাহায্যে শাসনব্যবস্থা চালাতে চেয়েছিলেন, তা-ও সত্য ঘটনা। এ ব্যাপারে সিরাজের ব্যক্তিগত দুর্ব্যবহার যে অনেকাংশে দায়ী ছিল, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। তবে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা বোধ হয় মির জাফর, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম প্রমুখ সরদারের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্যক্তিস্বার্থের খাতিরে তাঁরা তাঁর ও দেশের সর্বনাশ সাধন করেছিলেন।

তাঁর সেনাবাহিনী, অনুচরবর্গ মতিঝিলে সম্পদসহ বসবাসকারিণী বেগম সাহেবা (ঘসেটি বেগম) সম্বন্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার মনে প্রথম তাঁরা এই প্রতীতি জন্মালেন যে, তিনি সিরাজের বিপদ ও ক্ষতির উৎস। কোনো গোলমাল সৃষ্টি না করে মুর্শিদাবাদ নগরে তাঁর নিজের প্রাসাদে এসে বসবাস করার জন্য সিরাজ তাঁকে সংবাদ প্রেরণ করেন। ঘসেটি বেগম তাঁর সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে ও মুর্শিদাবাদে এসে বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানালেন এই বলে যে, তিনি (তাঁর পিতা) আলিবর্দির আদেশে সেখানে বসবাস করছেন। তাঁর স্বামীর কবরে তিনি একজন তপস্বিনীর মতো জীবন যাপন করছেন। যে অল্পসংখ্যক লোক তাঁর সঙ্গে আছেন, তাদের সবাই তাঁর পুরোনো অনুচর বলে তাঁদের বরখাস্ত করার মতো মানসিকতা তাঁর নেই। সিরাজ-উদ-দৌলার রাজ্যের ধ্বংসকারীরা তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এ সুযোগ গ্রহণ করে তাঁকে বোঝালেন যে, আলিবর্দির সরদারদের সঙ্গে বেগম সাহেবার সমঝোতা আছে। এখন তিনি যেসব কথা বলছেন, তাতে সন্তুষ্ট না থেকে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন।[৪]

তাঁদের কথা বিশ্বাস করে সিরাজ-উদ-দৌলা বেগম সাহেবা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন। মতিঝিল [প্রাসাদ] অবরোধ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন।[৫] অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে ৫ কি ৬ হাজার সৈন্য অবরোধের প্রথম দিকে মতিঝিল প্রাসাদের ভেতরে ছিল, কিন্তু দিন দুই পরে খান-ই-সামান মির নজর আলি, দিওয়ান রাজবল্লভ, 'আরজ বেগি' হাজি মেহদি ও আকবর আলি খানের পুত্র আলি নকি খান ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না। মির্জা হাকিম বেগের পুত্র মির্জা গোলাম আলি বেগ ও রিসালদার কুদরত উল্লাহ ছিলেন দুই ব্যক্তি, যাঁরা অবরোধ ভেদ করে চলে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

[ঘসেটি] বেগমের সব সৈন্য তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেও কতগুলো অপদার্থ লোকের কথা বিশ্বাস করে ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা

---

৪. ঘসেটি বেগমের পক্ষে এই একতরফা বর্ণনা যে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেকোনো কারণেই হোক, ঘসেটি বেগম সিরাজকে ও তাঁর সিংহাসন-প্রাপ্তিকে কোনোমতেই সহ্য করতে পারেননি। উভয়ের আত্মীয় *সিয়ার* রচয়িতা সৈয়দ্ গোলাম হোসেন এ সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ঘসেটি বেগমের দোষই বেশি বলে তিনি দেখিয়েছেন (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-৮৭)। এক স্থানে আছে: '...but everything found in the house of that princess (Ghaseti) was registered and sent to the public treasury; and that short sight woman, who instead of hating her nephew ought to have considered him as her son,' এই বর্ণনা *তারিখ*-এর (*তারিখ-ই*, পৃ. ১১৮ দ্র.)।

৫. এ সম্পর্কে *সিয়ার*-এর বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬) দ্র.। তবে এ ব্যাপারে করম আলির বর্ণনাই বিশদ।

তাঁর নিজের সিলমোহর অঙ্কিত করে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লেখেন এবং নজর আলির মনে ভরসা দেওয়ার জন্য মধ্যস্থতা করতে তাঁকে সঙ্গে করে আনার আদেশ দেন। দোস্ত মোহাম্মদ খান ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত ও সাহসী সেনাপতি। তিনি বললেন, 'আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতাকারী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ করেন, আপনি শুধু আদেশ দিন, আমরা তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আনব।'

সিরাজ এ প্রস্তাবে সম্মত হননি দেখে দোস্ত মোহাম্মদ খান মতিঝিল প্রাসাদ থেকে নজর আলিকে নিজের গৃহে নিয়ে যান। দুই দিন পর বোকা লোকদের পরামর্শে সিরাজ নজর আলিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। দোস্ত মোহাম্মদ খান ছিলেন আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তি। নবাবের কথায় তিনিই নজর আলিকে নিজের রক্ষণাবেক্ষণে এনেছিলেন। তিনি সিরাজের কাছে বলে পাঠালেন, 'এমন একটি দিনের আশঙ্কা করেই আপনার এই ভৃত্য বলেছিল যে, আমাদের [অর্থাৎ সৈনিকদের] পক্ষে মধ্যস্থতাকারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আপনি সে প্রস্তাবে সম্মত হননি। আমি এখন নজর আলির [ব্যাপারে] অংশীদার হয়ে পড়েছি।'

দুই দিন ধরে আলোচনা ও সংবাদ আদান-প্রদান চলল। সিরাজ-উদ-দৌলার প্রকৃতিদত্ত কোনো সাহস ছিল না বলে ক্ষমতা প্রদর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ইহতিরাম-উদ-দৌলা (Ihtiram-ud Daula) ও গোলাম হোসেন আরজ বেগিকে দোস্ত মোহাম্মদ খানের গৃহে প্রেরণ করে মির নজর আলিকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দেন এবং তাঁকে কর্মনাশার দিকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।[৬] নবাব তাঁর পিতৃব্য শাহাম্মত জঙের মতিঝিল প্রাসাদ অধিকার করেন। অলংকারাদি ছাড়াও নগদ ৪ কোটি টাকা, ৪০ লাখ মোহর, ১ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত পাত্রাদি সেখানে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থান থেকে যে অর্থ ও সম্পদ অধিকার করা হয়, একমাত্র আল্লাহই এগুলোর পূর্ণ মূল্যের কথা জানেন।[৭]

এটি ছিল বাঙলার প্রথম ধ্বংসকার্য, যেখানে চারটি উঁচু দরবার ও চারটি গৃহের সম্পদ একত্র করা হয়েছিল।[৮]

---

৬. সেনাপতি নজর আলিকে কেন্দ্র করে সেনাপতি দোস্ত মোহাম্মদ খান ও সিরাজ-উদ-দৌলার মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থেই দেখা যাচ্ছে। *সিয়ার* ও *তারিখ* প্রভৃতি গ্রন্থে এত বিস্তারিত বর্ণনা নেই।

৭. এ সম্পর্কে উল্লেখিত *সিয়ার*-এর বর্ণনা (পাদটীকা ৪) দ্র.। সিরাজ যে এগুলো রাজকোষে রেখেছিলেন, সেখানে তা বর্ণিত আছে।

৮. গ্রন্থকারের বর্ণনা এখানে অত্যন্ত পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। সিরাজ তো এগুলো রাজকোষে এনে জমা দিয়েছিলেন। আর ঘসেটি বেগম লাখ লাখ টাকা বিতরণ করেছিলেন সেনাপতিদের

সিরাজ এরপর তাঁর প্রাণপ্রিয় পূর্ণিয়া অধিকারে মনোনিবেশ করেন।[৯] মাত্র রাজমহল পর্যন্ত যাওয়ার পর তিনি কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চাইলেন।

মধ্যে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এসবের বিস্তারিত বর্ণনা *সিয়ার*-এ আছে এবং তা নির্ভরযোগ্য।

৯. ঘসেটি বেগম ও মির জাফরের প্ররোচনায় পূর্ণিয়ার শওকত জং যে বিদ্রোহী হয়ে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করতে চেয়েছিলেন, সে বর্ণনা *সিয়ার*-এ আছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থকারের একদেশদর্শী বর্ণনায় তা নেই।

ষোড়শ অধ্যায়

সিরাজের কলকাতা অধিকার

সেনাবাহিনী নিয়ে সিরাজের কলকাতা অভিমুখে অগ্রগমন ও তা অধিকার: নবাবের কাছে খবর এল, ইংরেজরা অতি উচ্চ একটি স্তম্ভ[১] নির্মাণ করেছে; সেখানে তারা একটি দুর্গ নির্মাণের প্রয়াসী। আরও সংবাদ আসে, রাজা রাজবল্লভের পুত্র তাঁর অর্থ ও সম্পদসহ পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। পূর্ণিয়া অভিযানে যাওয়ার সময় নবাব নারায়ণ সিংহ হরকরাকে পাঠিয়েছিলেন রাজবল্লভের পুত্রকে ফিরিয়ে আনতে ও স্তম্ভটি ধ্বংস করতে। নারায়ণ সিংহ কলকাতা গিয়ে তাঁর বোকামির কারণে কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন, যা তাঁদের কাছে অভিপ্রেত ছিল না। ইংরেজ সাহেবগণ তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেন এবং নবাবের কাছে দূতের মাধ্যমে জানান, 'আমরা যদি স্তম্ভ নির্মাণ করে থাকি, তবে এখনই আদেশ দিলে আমরা তা সমূলে উৎপাটন করে দেব। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসের কাছে আপনার যে অর্থ পাওনা আছে, আপনি আদেশ দিলে আমরা তা আপনার রাজকোষে জমা দেব। কিন্তু যেহেতু তিনি আমাদের আশ্রয় নিয়েছেন, আমরা তাঁকে [আপনার কাছে] সমর্পণ করতে পারি না।'[২]

---

১. ইংরেজি পাঠে tower শব্দের পরে বন্ধনীতে burj শব্দটি আছে। আরবি বুরজ (برج=burj) শব্দের এক অর্থ tower। এখানে সে অর্থেই তা ব্যবহৃত।

২. এ সম্পর্কে *তারিখ*-এর অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (*তারিখ-ই*, পৃ. ১১৯) ও *সিয়ার*-এর বিশদ বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৮৯) দ্র.। *সিয়ার*-এর বর্ণনায় ইংরেজদের পক্ষে কিছু সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদের অনুগ্রহভাজন সৈয়দ গোলাম হোসেন খান। তবে যেভাবে ইংরেজরা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছিল এবং মির জাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ,

রাজবল্লভের পুত্র সম্পর্কে যে কাহিনি জনগণের তরফ থেকে গ্রন্থকারের কাছে এসেছিল, তা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। রাজমহলের শিবিরে অবস্থানকালে নারায়ণ সিংহ সেখানে নবাবের কাছে উপস্থিত হয়ে মাথার পাগড়ি মাটিতে ফেলে দিয়ে বলেন, 'সামান্য কয়েকজন বণিক, যারা এখন পর্যন্ত তাদের পাছা ধুতে শেখেনি, তারা যদি রাজার (নবাব) আদেশের উত্তরে তাঁর দূতকে বহিষ্কার করে দেয়, তাহলে আমাদের আর কী সম্মান অবশিষ্ট থাকে!'[৩]

তিনি অভিযোগপূর্ণ আরও অনেক কথা বলেন, যাতে নবাবের ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজদের সঙ্গে ফখর-উৎ-তুজারের ঘোর শত্রুতা ছিল। তিনি যে আলিবর্দির কাছে ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন সুযোগ পেয়ে ইংরেজদের অবাধ্যতা, তাদের অনধিকার প্রবেশ ও হিংস্রতা সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি নবাবকে বলেন। তাতে নবাবের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়। এসব কথা শুনে নবাব বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে রাজমহল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এক রাতের মধ্যে কাসিমবাজার কুঠির পেছনে এসে আস্তানা গাড়েন। [রাজমহল থেকে] প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি জগৎশেঠকে সাবধান করে দিয়ে একটি পত্র পাঠান, যাতে ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে তিনি একটিও কথা বলেননি। কারণ, নবাবের লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের বহিষ্কার করা। তিনি জানতেন, তাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করলে জগৎশেঠ ব্যথিত হবেন। তার পরও জগৎশেঠ নবাবের আদেশ পালন করেন।

কাসিমবাজার কুঠিতে যে কজন ইংরেজ ছিল, তারা কুঠির ফটক বন্ধ করে দেয়। তারা আনুগত্য দেখিয়ে ক্ষমা চায়; জরিমানা দেওয়ারও প্রস্তাব দেয়। নবাব তাদের ক্ষমা করেননি। কারণ, ফখর-উৎ-তুজার নবাবকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, কলকাতা থেকে ৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। সেখানকার কুঠিতে দুই শয়ের

দুর্লভ রায় প্রমুখের মতো লোভী, স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল, তাতে নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। একচক্ষু হরিণের মতো আলিবর্দি সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দিয়ে মারাঠাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করে গেছেন। সিরাজের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত দেশ দখল করে নেয়। নবাবের রাজ্যে বাস করে ইংরেজরা একজন অপরাধী প্রজাকে তাঁর হাতে তুলে দেবেন না তা তো অমার্জনীয় অপরাধ।

৩. স্যার যদুনাথের ইংরেজি পাঠে 'bottoms' শব্দের পরে বন্ধনীতে hanuz bakun shustan khagar nashudand পাঠ আছে। কিন্তু শব্দগুলো, বিশেষ করে ফারসি Bakun শব্দের বানানের অভাবে এর ফারসি পাঠ ও বাংলা অর্থ দেওয়া সম্ভব হলো না বলে স্যার যদুনাথের ইংরেজি অনুবাদের অর্থই তুলে ধরা হলো। Bakun শব্দের অর্থ হলো 'কোনো'। নবাবের এই দূতটি তাঁরই মতো অপদার্থ ও উদ্ধত ছিলেন বলে মনে হয়। ইংরেজরা মলত্যাগের পর শৌচকার্য করত না বলে তাঁর এই অভিযোগ।

বেশি ইংরেজ ছিল না। মির মোহাম্মদ জাফর খান বখশির পদের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাঁকে সে পদ দেবেন বলে নবাব কথাও দিয়েছিলেন। মির মোহাম্মদ জাফর খান ফখর-উৎ-তুজারের কথার সমর্থন করেন।[৪]

সেই [৩ কোটি] টাকা বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যাবে মনে করে নবাব কাসিমবাজার কুঠির মুষ্টিমেয় ইংরেজকে কুঠি[৫] থেকে বের করে এনে বন্দী করেন। তারপর তাদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। মির মোহাম্মদ জাফর খান বহুদিন ধরে বখশির পদ পাওয়ার আশায় ছিলেন। নবাব তাঁর মাধ্যমে ওমর খানকে ডেকে পাঠান। তিনি তখন মোজাফ্ফর জং উপাধিধারী কাটোয়ার ফৌজদার মির মোহাম্মদ রেজা খানকেও[৬] ডেকে পাঠান। একদল সৈন্য দিয়ে তাঁকে হুগলী হয়ে সমুদ্রের দিকে পাঠান এই উদ্দেশ্যে যে, ইংরেজরা যদি জাহাজে করে পালিয়ে যেতে চায়, তাহলে তিনি তাদের দেশত্যাগে বাধা দেবেন।

সিরাজ-উদ-দৌলা নিজে সেনাবাহিনীর একটি দলকে নিয়ে কৃষ্ণনগর হয়ে কলকাতা পৌঁছান। ইংরেজদের পক্ষে সমগ্র [কলকাতা] শহর রক্ষা করা সম্ভব ছিল না বলে তারা শুধু তাদের কুঠির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করে এবং যুদ্ধ ও শান্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। নবাবের দলের লোকজন কলকাতা প্রবেশ করেই লুটতরাজ শুরু করে দেয়। তারা লাখ লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে। শুধু তা-ই নয়, বাড়িঘরেও আগুন লাগিয়ে দেয়। নবাবের আদেশে তাঁর সৈন্যরা কুঠি অবরোধ করে তা অধিকার করার চেষ্টা করে।

গোলাম হোসেন খান আরজ বেগি...এ ব্যাপারে রোজই নবাবকে বলতেন, 'ইংরেজরা হচ্ছে আগুনের বলয়। তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হওয়া দূরদর্শিতা ও অসতর্কতার পরিপন্থী।'

তাঁকে শিবির থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দেওয়া হয়। একইভাবে জয়নাল

---

৪. সে সময়ই ইংরেজদের সঙ্গে মির মোহাম্মদ জাফর খানের যে সংযোগ ছিল, সে কথা আলোচ্য গ্রন্থে নেই, আছে *সিয়ার*-এ।

৫. মূল ইংরেজি পাঠে কুঠি (Kuthi) শব্দ আছে। মূল সংস্কৃত কুষ্ঠিকা শব্দ থেকে উদ্ভূত এই কুঠি শব্দের অর্থ ব্যবসায়ীর কার্যালয় বা বাসস্থান।

৬. করম আলির এ গ্রন্থ মোজাফ্ফর জং উপাধিধারী এই মির রেজা খানের নামে নামাঙ্কিত। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ১৭৬৫ সালে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বাঙলার দিওয়ানি লাভ করার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৈয়দ রেজা খানকে বাঙলার নায়েব সুবাদার, সেই সঙ্গে দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে পদচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত তিনি একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সিয়ার-এর (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩) বর্ণনা মতে হাজি আহমদের এক কন্যার পুত্র ছিলেন হাসান রেজা খান। তিনিই এ ব্যক্তি কি না, সঠিকভাবে তা বলা যাচ্ছে না।

আবেদিন বাকাওয়াল যুদ্ধের বিরোধিতা করলে তাঁকেও শিবির থেকে বের করে দেওয়া হয়। মির্জা হাবিব বেগ ও মির হাশাউল্লাহ তাঁদের মনিবের (সিরাজ-উদ-দৌলা) কল্যাণের লক্ষ্যে [যুদ্ধের বিপক্ষে] তাঁদের মনের কথা প্রকাশ করলে তাঁদেরও একইভাবে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বহিষ্কার করা হয়।

যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকে কয়েক দিন ধরে। সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত কুঠির পতন আসন্ন বলে মনে হলো। ইংরেজ সাহেবগণ আর অধিককাল যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বলে মনে করে। শান্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে শেষে জাহাজে চড়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। কয়েকজন ইংরেজ আত্মসম্ভ্রম বোধের কারণে আত্মহত্যা করে। কয়েকজনকে বন্দী করা হয়।[৭]

ইংরেজদের জাহাজে করে পলায়নের পথ রোধ করার জন্য একদল সৈন্য দিয়ে মোজাফ্‌ফর জংকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি [হুগলী] নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে তিনি কিছুই করতে পারেননি।[৮] ফখর-উৎ-তুজার [কলকাতা আক্রমণের আগে] বলেছিলেন,

---

৭. সিরাজের কলকাতা অভিযান ও তা অধিকার এবং ইংরেজদের প্রতিরোধ ও পলায়নের বর্ণনা এ গ্রন্থে অত্যন্ত সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ১২০-২১) এ বর্ণনা আর একটু বিস্তারিত। *সিয়ার*-এর বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৯২) আরও বেশি বিস্তারিত। *রিয়াজ*-এও (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৮৬) এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এখানে ইংরেজ বন্দীদের অবস্থা পরে কী হয়েছিল, সে বর্ণনা নেই। কিন্তু *তারিখ*-এ সে বর্ণনা আছে (*তারিখ-ই*, পৃ. ১২০-২১ দ্র.)। শতাধিক বন্দী যে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল, আছে সে বর্ণনাও। এ সম্পর্কে *সিয়ার*-এর ইংরেজি অনুবাদক ও টীকাকার পাদটীকায় (পৃ. ১৯০) বলেছেন :

'There is not a word here of those English shut up in the Blackhole, to the number of 131, where they were mostly smothered. The truth is, that the Hindustanees wanting only to secure them for the night, as they were to be presented the next morning to the Prince, shut them up in what they heard was the prison of the fort, without having any idea of the capacity of the room, and indeed the English themselves had none of it. This much is certain, that this event which cuts so performances is not known in Bengali; and even in Calcutta. It is ignored by everyman out of the four hundred thousand that inhabit that city; at least it is difficult to meet a single native that knows anything of it; so careless and so incurious are these people. Were we therefore to accuse the Indians of cruelty, for such a thoughtless action, we would of course accuse the English, who intending to embark four hundred Gentul. Sipahees, destined for Madras put them inboats, without any single necessary, and at last left them to be overset by the boat, where they all pershed, after three days fast.'

৮. এই সম্পর্কে *রিয়াজ*-এ (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৮৬) আছে, 'ইংরেজদের জাহাজ চলাচলের পথে মথুরা ও বজবজিয়ায় (বজবজে) ও পারাপারের অন্যান্য স্থানে শক্তিশালী সৈন্য রেখে ওই

কলকাতা লুট করলে সরকারের ৩ কোটি টাকা লাভ হবে। প্রকৃতপক্ষে এ অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মুসলিম, হিন্দু, আর্মেনীয়সহ অন্য বণিকদের সম্পদও শিবিরের লোকজন লুট করেছিল। এতে নবাবের একমাত্র লাভ হয়েছিল দুর্নাম অর্জন করা।

লুটের মালের মধ্যে [ইংরেজদের] কুঠিতে প্রাপ্ত অর্থই নবাবের ভাগে পড়ার কথা। কিন্তু ইংরেজ সাহেবগণ সব অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি জাহাজে বোঝাই করে তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। কুঠির যে স্বল্প সম্পদ নবাবের হস্তগত হয়, তা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত অর্থের চেয়ে অনেক অনেক কম ছিল। এ কারণে মোজাফ্ফর জংকে কাটোয়ার ফৌজদারের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর অপরাধ, তিনি ইংরেজদের পালিয়ে যেতে দিয়েছিলেন।[৯] মির মোহাম্মদ জাফর খান প্রথম বখশির পদে উন্নীত হওয়ার আশায় ইংরেজদের কুঠি অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা প্রদর্শন করেন[১০] এবং আগের মতোই তাঁকে সেই উচ্চ [বখশি] পদে নিয়োগ করা হয়।

রাজা মানিক চাঁদকে কলকাতার দুর্গরক্ষক নিয়োগ করা হয়। তিনি কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা, সাহসিকতা ও ভদ্র ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন।[১১] নবাব কলকাতার নাম রাখেন আলিনগর। তারপর রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি নৌকায় চেপে মুর্শিদাবাদে আসেন। (তাঁর আগমনের জাঁকজমক ছিল অবর্ণনীয়)। কোনো লেখককে সে বর্ণনা পূর্ণভাবে দিতে গেলে [কাগজের পরিবর্তে] গাছ থেকে পাতা এবং [কলমের পরিবর্তে] বাঁশঝাড় থেকে লেখনী সংগ্রহ করতে হবে।[১২]

মাসের শেষ দিকে সিরাজ-উদ-দৌলা মুর্শিদাবাদ ফিরে যান।' গ্রন্থকার এখানে তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে সত্য কথা বলছেন বলে মনে হয় না। ১৭৬৫ সালে ইংরেজদের নায়েব নাজিম দিওয়ান পদে তাঁর নিযুক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি আগে থেকেই ইংরেজদের প্রিয়পাত্র ও তাদের পক্ষে ছিলেন।

৯. মোজাফ্ফর জং, অর্থাৎ রেজা খানকে পরবর্তীকালে বাঙলার দিওয়ান পদে কোম্পানির তরফ থেকে নিযুক্ত করার ঘটনা থেকে মনে হয় সিরাজের সন্দেহ অমূলক ছিল না। রেজা খান শুধু গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, ছিলেন ইংরেজদের প্রিয়পাত্রও। কাজেই গ্রন্থকারের বর্ণনা খুব নির্ভরযোগ্য বলা যায় না।

১০. *সিয়ার*-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে, মির জাফর ইংরেজ মহিলাদের নিরাপদে পলায়ন করার ব্যাপারে তাঁর কর্মকর্তা আমির বেগকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমির বেগ তা পালনও করেছিলেন। তাতে মনে হয় যে, প্রথম থেকেই তিনি দুই দিকেই হাত রেখেছিলেন।

১১. কিন্তু তাঁর অতীত ইতিহাস তাঁকে কাপুরুষ বলেই শনাক্ত করে। মারাঠারা আসছে শুনেই তিনি বর্ধমানে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

১২. গ্রন্থকারের চাটুকারিতার দৃষ্টান্ত অবশ্য এখানে আছে। তবে সে যুগে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার ইঙ্গিত এখানে দেখা যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

পূর্ণিয়া অধিকার

রাজ্য পরিচালনার ছোট-বড় যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এবং সমুদয় কর্মকর্তার নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা রাজা মোহনলালের ওপর ন্যস্ত করার পাশাপাশি নবাব তাঁর প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর রাজা [মোহনলাল] আলিবর্দির অন্তরঙ্গ সভাসদদের প্রতি ব্যবহারে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেননি। তাঁর আধিপত্যসুলভ মনোভাবের কারণে আলিবর্দির সময়ের মুৎসুদ্দিদের (অর্থাৎ অসামরিক কর্মকর্তাদের) সঙ্গে তিনি নবাবের সামনেই নেহাত ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতেন। তাতে তাঁরা, বিশেষ করে মহারাজা দুর্লভরাম, রায়-ই-রায়ান উম্মিদ রাম ও রাজা শওকত সিংহ মনে আঘাত পান। নিরাপত্তার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করে মির মোহাম্মদ জাফর খানের মাধ্যমে ওমর খানকে দরবারে আগমন করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। নবাব রাজধানীতে পৌঁছালে ওমর খান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সব কথা শোনার পর তাঁর সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা হয়।

শওকত জঙের বিরুদ্ধে সিরাজের সসৈন্য অভিযান ও শওকত জং নিহত: আলিবর্দির আদেশ অনুসারে শওকত জং পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার গদিতে বসেছিলেন। ১১৭০ হিজরি সনে [১৭৫৬ খ্রি.] সিরাজ-উদ-দৌলার রাজমহল আগমনে (সে কথা আগেই বলা হয়েছে) শওকত জং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে দেখা দেয় সন্দেহ।[১] সব রাস্তাঘাট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সাবধানতা ও

---

১. *সিয়ার, রিয়াজ* প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সিংহাসনে আরোহণ করার পরই সিরাজ রাজমহলে গিয়েছিলেন পূর্ণিয়া অধিকার করার জন্য। কিন্তু *তারিখ*-এ সেই কথা নেই, যদিও সেখানে বলা হয়েছে, পূর্ণিয়া অধিকার করার জন্য সিরাজ অজুহাত খুঁজছিলেন।

আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করে তিনি প্রায় ৬ হাজার অশ্বারোহী ও ১৪ থেকে ১৫ হাজার পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করেন।[২] যৌবনসুলভ অহংকার, বালসুলভ চপলতা ও অনভিজ্ঞতা হেতু তাঁর প্রধান ও বিজ্ঞতম সেনাপতি শেখ জাহান ইয়ার খানের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সিরাজের বশ্যতা স্বীকার করার কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। প্রস্তুত হন তাঁর বিরোধিতার জন্য। তাঁর দরবারে মির মোয়াল্লাহ খান[৩] ও মির্জা হাবিব বেগের আগমনে গোলযোগের অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে এবং [সিরাজ-উদ-দৌলা ও শওকত জঙের মধ্যে] পারস্পরিক বৈরিতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। নিজেদের স্বার্থের লোভে তরুণ নবাবের উপদেশে এ দুই ব্যক্তি তাঁকে এমন সব পরামর্শ দেন, যা ছিল তাঁর স্বার্থের পরিপন্থী।[৪] শওকত জঙের চরিত্র ছিল [বরাবরই] প্রকৃতিগতভাবেই উগ্র ও আবেগপ্রবণ। এখন তা আরও অধিক রূঢ় ও আক্রোশপূর্ণ হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান 'হাজারি' (সেনাপতি) উদওয়ান্তের[৫] কথা বলা যেতে পারে। বিনা কারণে তিনি (শওকত

---

২. গ্রন্থকার এখানে পুরোপুরি সত্য কথা বলেননি। সত্য কথা বলেননি সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিকও। *তারিখ*-এ (*তারিখ-ই*, পৃ. ১২২) বর্ণিত আছে, 'During the period however much Siraju'd Daula sought peace with Shaukatjang by sending him affectionate letters and by accepting some of the demands which were apparently the causes of their quarrel, Shaukatjang, being exceedingly proud of his wealth and youth and intoxicated with the wine of unconcern, and dead drunk day and night, did not pay any heed at all and uttered rash expressions in reply.'

সিরাজের কথায় কর্ণপাত না করার কারণ বর্ণিত আছে *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪-৯৬)। সেখানে বলা আছে যে, কলকাতা থেকে ফিরে আসার পরই মির জাফর শওকত জঙের কাছে এ মর্মে পত্র লেখেন যে, সিরাজের পরিবর্তে তাঁকেই বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব করা হবে। সেখানে আছে, 'He mentioned several Commanders and Grandees who as well as Mir-djafor-qhan himself, looked upon Sayd-ahmad-khan's son (ie Shaukatjang) as their only resource against the growing and daily cruelties of Seradj ed doula's and he pledged himself that he would be strongey and unanimously supported...'

৩. *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬) তাঁর নাম মির মালি খান (Mir-Maaly Khan)।

৪. তাঁদের সম্পর্কে *সিয়ার*-এও অনুরূপ বর্ণনা আছে (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬)।

৫. এই উদয়ান্ত হাজারির (Udwant, his chief hazari—artilery captain) উল্লেখ সমসাময়িক *তারিখ* গ্রন্থে নেই, যদিও *তারিখ*-এর অনেক বর্ণনা এখানে প্রায় হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। *সিয়ার*-এ অবশ্য তাঁর কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, যদিও একটু ভিন্ন ধরনের নামে।

জং) তাঁকে পূর্ণিয়া থেকে বহিষ্কার করেন। মির রুহ-উদ-দীন হোসেন খানের[৬] গৃহে অকারণে প্রহরী নিযুক্ত করে তিনি তাঁর কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

সিরাজ-উদ-দৌলার আগমনের অপেক্ষা না করেই তিনি মির মোয়াল্লাহ খান, লল্লি হাজারি ও অন্যান্য সেনানীকে পূর্ণিয়ার নিকটবর্তী মালদহ ও অন্যান্য স্থান অধিকার করার জন্য প্রেরণ করেন। পূর্ণিয়ার সীমান্তে অবস্থিত মনিহারিতে উপস্থিত হয়ে মির মোয়াল্লাহ খান দেখেন যে, আর অধিক অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি শওকত জংকে পত্র লিখে জানান যে, লল্লি হাজারির অসদ্ভাব ও অসহযোগিতার কারণে তাঁর পক্ষে বাঙলার সীমান্ত অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। আহাম্মক নবাবকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পত্রে নবাবকে 'জাহাঁপনাহ'[৭] (সম্রাট) বলে অভিহিত করেন। শওকত জং লল্লি খান হাজারির কাছে নিন্দাসূচক পত্র লেখেন এবং তাঁর (নবাবের) আদেশ মনে করে মোয়াল্লাহ খানের হুকুম মেনে চলার নির্দেশ দেন। লল্লি হাজারি তাঁর সাহসিকতার জন্য অসম্ভব গর্বিত ছিলেন। তাঁর অধীনে ছিল ২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩ হাজার পদাতিক সৈন্য। উত্তরে তিনি শওকত জঙের কাছে এই মর্মে পত্র লেখেন যে, 'মহানুভব প্রভু, আপনার পতাকাবাহী হস্তীটিই আমার কাছে আইনের প্রতীক। আপনি অনুগ্রহপূর্বক সেই হস্তীটি পাঠিয়ে দিলে আমি এটিকে সঙ্গে করে বাঙলা অভিমুখে যেতে পারি। সৃষ্টিকর্তা যত দূর পর্যন্ত নিয়ে যান, তত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারি।'

শওকত জং ফারসি ভাষা মোটেই জানতেন না। আগে থেকেই হাজারির প্রতি ছিলেন অসন্তুষ্ট। পত্র পেয়ে তিনি মনে করলেন যে, আগে যেহেতু তিনি তাঁকে পুত্র বলে সম্মানিত করেছিলেন, সে কারণে হাজারি এখন তাঁর সমান হতে চাওয়ার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পতাকাবাহী হস্তী চেয়ে পাঠিয়েছেন। এ

---

৬. মির রুহ-উদ-দীন হোসেন খানের পরিচয় জানা যায়নি। তবে পূর্ণিয়ার প্রাক্তন ফৌজদার সাইফ খানের এক পুত্রের নাম ছিল রুহ-উদ-দীন হোসেন খান। কিন্তু তিনি 'মির' ছিলেন না। তিনি সওলত জঙের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

৭. এখানে 'জাহাঁপনাহ' (جهان پناه = Asylum of the world) ও বন্ধনীতে Emperor শব্দটি আছে। *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০) একই অর্থে আলমপনাহ (عالمپناه =Asylum of the world) শব্দটি আছে। সাধারণত সম্রাটদের এই সম্বোধন করা হতো। এখানে অতি সাধারণ একজন ফৌজদারকে এ সম্বোধন করা হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে। *সিয়ার*-এর মতে শওকত জং বাদশার উজির উমদাত-উল-মুলকের কাছে এই মর্মে পত্র লেখেন যে, তাঁকেও যেন তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই পদবিতে ভূষিত করে উল্লেখ করা হয়।

কারণেই বোধ হয় তিনি নবাবের আদেশ অমান্য করে মির মোয়াল্লাহ খানের অধীনে কাজ করতে অসম্মতি জানাচ্ছেন। ফলে ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি উভয় ব্যক্তিকেই ডেকে পাঠান। তাঁরা উভয়েই ফিরে এলে নবাব হাজারিকে দরবারে আসতে নিষেধ করে এই ঘোষণা দেন যে, পরদিন তিনি নিজেই অশ্বারোহী হয়ে সেই প্রতারণাকারী বিদ্রোহীর গর্ব খর্ব করে দেবেন। রাত্রিকালে গোপনীয় আলোচনার সময় মোয়াল্লাহ খান নবাবকে বিশেষ কোনো উপদেশ দিলে এরপর নবাব আর কোনো সভাসদের বাক্যে কর্ণপাত করেননি, যদিও তাঁর মত ও পথকে আত্মঘাতী বলে তাঁরা অভিহিত করেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের পর শওকত জং তাঁর সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। তাঁর সেনাপতিদের সবাই লল্লি হাজারিকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর পুত্রদের হাজির করেন নবাবের সামনে। তাঁরা আরও বলেন যে, এ সময় ৬-৭ হাজার সৈন্যের এ সেনাপতিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা মোটেই সংগত হবে না। কিন্তু শওকত জং তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। মির মোয়াল্লাহ খানকে তাঁর হাতির পেছনের আসনে বসিয়ে নবাব নিজেই চললেন হাজারিকে হত্যা করার জন্য। [নবাবের প্রতি] তাঁর আনুগত্যের কারণে লল্লি খান তাঁর সৈন্যদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে নিষেধ করেন। তিনি নিজে হিন্দুদের প্রথা অনুযায়ী খালি মাথা ও খালি পায়ে তাঁর গৃহ থেকে বের হয়ে আসেন এবং একটি আসনে বসে নারকেলের [খোলের] হুঁক্কায় তামাক টানতে থাকেন।

শওকত জং তাঁর সমুদয় সৈন্যসহ সেখানে উপস্থিত হলে মির সুলতান খলিল রিসালদার হাজারির কাছে চলে যান। তাঁকে তিনি তাঁর নিজের হাতিতে তুলে নেন। তারপর নবাবের (শওকত জং) কাছে তাঁকে হাজির করেন। সেখানেও লল্লির জন্য যাঁরা সুপারিশ করেন, নবাব (শওকত জং) তাঁদের কথায় কান দেননি। তাঁকে দুই-তিন দিন কয়েদখানায় আটক রাখার পর পূর্ণিয়ায় প্রেরণ করা হয়। তাঁর 'রিসালা'র দায়িত্ব প্রদান করা হয় নবাবের (শওকত জং) কৃপাধন্য ব্যক্তিকে। উঁচু-নিচু সবাই নবাবের এই কাজের নিন্দা করেন।[৮]

এই গন্ডগোলের কয়েক দিন পর সিরাজ-উদ-দৌলার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গেলে মির মোয়াল্লাহ খানের উপদেশে নবাব (শওকত জং) নিজেই মালদহ অভিযানে যান। সেখানে গিয়ে তিনি নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম ধ্বংস

---

৮. *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯) লল্লি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। খুব সম্ভব করম আলি *সিয়ার* অনুসরণেই লল্লি সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অথবা দুজনই অন্য কোনো মূল সূত্র থেকে তাঁদের রচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কারণ দুজনের বর্ণনাতেই যথেষ্ট ঐক্য লক্ষিত হয়।

করেন। তিনি শিবির স্থাপন করেন হায়াতপুরে। সেখানে মির্জা হাবিব বেগ তাঁকে গোপনে বলেন, 'সেনাপতিদের সবাই আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। আপনাকে পদচ্যুত করে বন্দী করার জন্য তাঁরা একটি চুক্তি করেছেন।'

পরদিন রাতে যে মন্ত্রণাসভা বসে তাতে সেনাপতিদের সবাই উপস্থিত হলে শওকত জং প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁর কাছে তাঁরা কেন এসেছেন, তার কারণও তিনি জিজ্ঞেস করেন। তাঁদের সামনেই তিনি মির্জা হাবিব বেগ বর্ণিত [চুক্তির] কাহিনি উল্লেখ করেন। সেনাপতিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় শেখ জাহান ইয়ার[৯] তরবারি স্পর্শ করে শপথবাক্য উচ্চারণ করে বলেন, 'আমরা যদি এ সময় আপনাকে বন্দী করি, তাহলে আমাদের শুধু অপযশই হবে। আপনার অশোভন আচরণ নিশ্চয়ই আমাদের মনে পীড়া দিয়েছে। কয়েকজন নিচু প্রকৃতির লোক আপনার সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ নিয়ে আপনার কাছে এসব কথা বলে গোলযোগ ও ক্ষতির কারণ ঘটায়। আমরা জানি না, তারা তাদের তৎপরতা কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত করবে। তাদের প্রজ্বলিত আগুন কখন নির্বাপিত হবে!'

এসব কথা শুনে শওকত জং সেনাপতিদের শুভেচ্ছা অর্জনের লক্ষ্যে মির্জা হাবিব বেগকে যতভাবে পারা যায় অপমানিত করার পর দরবার থেকে তাঁকে বহিষ্কার করেন। তারপর সেনাপতিদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মানবজাতির ইমামের ফাতেহা পাঠের জন্য পূর্ণিয়াতে ফিরে আসেন।[১০]

সিরাজ-উদ-দৌলা বুঝতে পারেন যে, শওকত জং একজন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি। তাঁকে যত সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তাতে কোনো ফল হয়নি। নিন্দা রটনাকারীদের গুজবের কারণে তিনি আলিবর্দির সময়ের সেনাপতিদের সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য পাটনা থেকে তিনি মহারাজা রামনারায়ণকে ডেকে আনেন। মহারাজা রাজমহলে আগমন করার পর নবাব তাঁকে গঙ্গা অতিক্রম করার আদেশ দেন। নবাব ১১৭১ হিজরি (প্রকৃতপক্ষে ১১৭০ হিজরি, ৯ অক্টোবর ১৭৫৬ খ্রি.) সনের এক শুভ মুহূর্তে পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। শওকত জং এ সংবাদ পেয়ে শেখ জাহান ইয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীর বখশি শ্যামসুন্দরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হস্তী ও অশ্ব উপহার দেন। শুধু তা-ই নয়, পরিখা খনন করে উত্তমরূপে যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে সেখানে পাঠিয়ে

---

৯. *সিয়ার*-এও (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০২-০৩) এই ঘটনার বর্ণনা আছে আরও বিস্তারিতভাবে। তবে সেখানে জাহান ইয়ার খানের (Shaikh Jahan Yar) জায়গায় কারগুজার খান (Car-guzar-qhan)-এর উল্লেখ আছে।

১০. *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৩) কিন্তু অন্য ধরনের বর্ণনা আছে।

দেন। ১১৭১ হিজরি সনের ১৯ মহররম (প্রকৃতপক্ষে ১১৭০ হিজরি, ১৪ অক্টোবর ১৭৫৬ খ্রি.) সব সৈন্যকে উপহারসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করে তিনি নিজে পূর্ণিয়া নগর থেকে বের হয়ে আসেন। কিন্তু রণক্ষেত্রেও তিনি সারা রাত নৃত্যগীত দেখা থেকে বিরত থাকেননি। কারণ তাঁর জীবনের পঞ্চম কি ষষ্ঠ বছর থেকে যুদ্ধের এই দিনটি পর্যন্ত এটি ছিল তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস।

২২ মহররম [১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর] তারিখে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল, তখনো তিনি (শওকত জং) বেলা এক প্রহর পর্যন্ত পরম আয়েশে নিদ্রাসুখ ভোগ করেন। একসময় তিনি শয্যা ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন। ১০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর দিনের এক প্রহর অবশিষ্ট থাকতে তিনি পরিখার কাছে এসে উপস্থিত হন। এবং শ্যামসুন্দর বখশি ও শেখ জাহান ইয়ারকে পরিখা থেকে বের হয়ে এসে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ পরিচালনার আদেশ দেন। একই সময় সিরাজ-উদ-দৌলার সেনাদলও যুদ্ধের ময়দানে এসে উপস্থিত হয়। প্রথমে শ্যামসুন্দর বখশি পরিখা থেকে বের হয়ে বাঙলার সৈন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। বন্দুকের সাহায্যে প্রাণপণে তিনি যুদ্ধ করেন। শেখ জাহান ইয়ার ছিলেন বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তিনি প্রথমে শওকত জঙের কাছে এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন, 'দিবসের এক প্রহর সময় মাত্র অবশিষ্ট আছে। যুদ্ধ করার সময় আর নেই। পূর্ণিয়া থেকে অভিযানে আসার পথশ্রমের ক্লান্তি আমাদের সৈন্যরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে তাদের অনেকে এসে উপস্থিতও হয়নি। অতএব শ্যামসুন্দরকে রণক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনা এবং এই যুদ্ধ বন্ধ করা আপনার কর্তব্য, যাতে পরদিন আল্লাহর যা ইচ্ছা হয়, তা আমরা খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি।'

অবশেষে কঠোর ও তিক্ত ভাষায় লেখা তাঁর পত্রের উত্তর পেয়ে শেখ তাঁর জীবন নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু তিনি দিন কয়েক আগে এখানে এসে পৌছালেও রণক্ষেত্র পরিদর্শন করতে পারেননি। সেটা ছিল তাঁর একটা বড় ত্রুটি। অতএব প্রথম আক্রমণেই তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে কাদায় ভরা নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। কামানের একটি গোলা হস্তীপৃষ্ঠে থাকা তাঁর জামাতাকে নিচে ফেলে দেয়। [পূর্ণিয়ার] অধিকাংশ সৈন্য বিধ্বস্ত ও আহত হয়ে পলায়ন করতে থাকে।[১১] সেনাপতিরা বহু কষ্টে সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সেই [কর্দমাক্ত] স্থান থেকে বের হয়ে আসে তাঁদের সৈন্যদের উদ্ধার করার জন্য। তবে কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা থেমে পড়েন। শত্রুপক্ষের বন্দুকধারী কিছু পদাতিক সৈন্য তাদের [প্রধান দলের] আগেই

১১. *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮) এই যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

অগ্রগামী হয়ে পড়েছিল। তারা গুল্মলতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। এ কয়েকজন সৈন্যের গুলিতেই বখশি কারগুজার খান, আবু তোরাব খানের পুত্র মোহাম্মদ সাঈদ খান, লোহা সিংহ হাজারি ও অন্যরা ধরাশায়ী হন।

এ সময় দোস্ত মোহাম্মদ খান ও ওমর খান শেখ জাহান ইয়ারের সম্মুখীন হন। তাঁর জামাতার মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে তিনি হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে পলায়নপর হন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি নিজেও গুলির আঘাতে আহত হয়েছিলেন। আবদুর রশিদ নামের তাঁর এক পৌত্র[১২] শেখ গোলাম আলি নামের একজন সৈনিকের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে নিহত হন। জানবাজ বেগ খান ও মির মোয়াল্লাহ খান তাঁদের সমুদয় সৈন্যসহ পালিয়ে যান। মির সুলতান খলিল ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি। তাঁর হস্তীর মাহুতের মৃত্যু হলেও তিনি নিজের প্রাণপণ প্রয়াসে হস্তীকে রণক্ষেত্রের দিকে ধাবিত করেন। তাঁর কাছে যে বন্দুকটি ছিল তা দিয়েই তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেন। পরে তির-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করে তিনি শত্রুকে প্রতিহত করতে থাকেন। শত্রুরা তাঁর কাছে এলে তিনি বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলে তাঁর হাতির পিঠে ওঠার চেষ্টা করে। তরবারি বের করে তিনি কয়েকজনকে প্রতিহত করেন। এক ব্যক্তি হাওদাতে উঠে পড়লে পবিত্র রক্তবহনকারী এই সৈয়দ ছোরার আঘাতে তাকে হত্যা করেন এবং তিনি নিজে আকস্মিক আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করে দোস্ত মোহাম্মদ খান তাঁকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। এ সময় তাঁর হস্তী রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে তার প্রভুকে তাঁর গৃহে নিয়ে যায়। দুই দিন পর তাঁর পবিত্র আত্মা জান্নাতবাসী হয়।

মির্জা হাবিব বেগ ও হেদায়েত আলি খানের পুত্র আলি নকি খান রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করার কলঙ্কের অংশীদার হতে চাননি বলে যুদ্ধ করতে থাকেন। শেষত যুদ্ধে তাঁরা নিহত হন। তাঁদের অপরাধ তাঁরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন তাঁরা যুদ্ধ করেননি। শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁরা অস্ত্র ব্যবহার করেননি।[১৩]

---

১২ ইংরেজি পাঠে নাতি, অর্থাৎ 'grandson' শব্দের পরে বন্ধনীতে 'নওয়াসা' (Nawasa) শব্দ আছে। ফারসি (نواسا) 'নওয়াসা' শব্দের অর্থ পৌত্র।

১৩. স্যার যদুনাথ সরকার প্রদত্ত ইংরেজি পাঠ (পৃ. ৬৯) : 'Mirza Habib Beg and Ali Naki Khan, the son of Hedayet Ali Khan, who had stood firm and refused to incur the disgrace of flight were killed. Their fault was that they refused to fight when in the field and did not play their weapons before the enemy.'

এ পাঠের বাংলা অনুবাদ ওপরে যা দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না। এ পাঠ বিভ্রান্তিকর। তা ছাড়া হেদায়েত আলি খানের পুত্র নকি আলি

শওকত জঙের বাম পাশে দস্তি তোপখানার দারোগা বখশি শ্যামসুন্দর বীরের মতো যুদ্ধ করেন। একপর্যায়ে তিনি বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। তিনি অতিশয় বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি দুটি হাতি সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে এসেছিলেন। হাতি দুটির হাওদা ছিল সোনা ও রুপার আংটিতে পূর্ণ। বন্দুকের গুলি বৃষ্টির মতো আসতে থাকলে যেসব পদাতিক সৈন্য বীরের মতো যুদ্ধ করছিল, তিনি নিচু হয়ে তাদের আংটি দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

শ্যামসুন্দরের মৃত্যুতে শওকত জঙের ডান দিক ও শেখ জাহান ইয়ারের পলায়নে বাম দিক শূন্য হয়ে পড়ে। মর্দান আলি, মিথুনলাল দিওয়ান ও অন্য কয়েকজন ছিলেন শওকত জঙের অগ্রবর্তী বাহিনীতে। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকতে না পেরে তাঁরা পলায়ন করেন। শওকত জঙের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জসারত খান একদল সৈন্য নিয়ে তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যান। তাঁর আরেক ছোট ভাই মিরজাই সাহেব একটি গোলার আঘাতে আহত হন। বংশের স্বাভাবিক সাহসিকতার অধিকারী শওকত জং মাত্র ছয়-সাতজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অতিশয় দৃঢ়তার সঙ্গে মির মোহাম্মদ জাফরের সম্মুখীন হন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে পালিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করলে তিনি উত্তর দেন, 'মৃত্যুর হাত থেকে পলায়ন সম্ভব নয়'[১৪] এবং এই কবিতা বারবার আবৃত্তি করতে থাকেন :[১৫]

আমি যদি সুনামের সঙ্গে মরি তবে তা-ই হবে ঠিক,
আমার দেহের অধিকারী মৃত্যু, [অতএব] আমার নামটা থাকা আবশ্যক।

অবশেষে যে গোলাবৃষ্টি তাঁর ওপর বর্ষিত হয়, তাতে রাজার মসনদের পরিবর্তে কাঠের তক্তাকে তিনি তাঁর দেহের আশ্রয়স্থল হিসেবে নির্বাচন করেন।

খানের (*সিয়ার* রচয়িতার ছোট ভাই) মৃত্যু সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা সত্য নয়। কারণ, *সিয়ার* (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩) পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, 'Aaly naky-qhan and Habib-beg who had lost their horses, and fought on foot were severely wounded and being taken prisoners, they were conserved alive as being known to Mir-djafer-qhan...' *সিয়ার*-এর বর্ণনা অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ *সিয়ার* রচয়িতা সে সময় রণক্ষেত্রে ছিলেন। নকি আলি খান ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

১৪. বন্ধনীতে প্রদত্ত ইংরেজি অক্ষরে ফারসি পাঠ, 'az marg gurez pesh-raft nist' (از مرگ گریز پیش رفتن نیس), অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। স্যার যদুনাথ 'Seft' লিখেছেন। সঠিক পাঠ হবে 'পেশ রাফতান' (پیش رفتن)।

১৫. স্যার যদুনাথ (য. না., পৃ. ৬৯) মূল ফারসি পাঠ দেননি। ইংরেজি পাঠ যা দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ :
'If I die with a good name, it would be proper.
I ought to have the name as my body belongs to Death.'
এই জ্ঞানগর্ভ কবিতা কার রচনা, সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

সেই [তক্তার] আসনে করেই তাঁর [মৃত] দেহ পূর্ণিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শওকত জঙের শিরস্ত্রাণ ভূমিতে পড়ে যায়। কিছু লোক উপহার হিসেবে তা সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে নিয়ে যায়। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন রণক্ষেত্র থেকে প্রায় এক মঞ্জিল পেছনে।

শেখ বাহাদুর নরনৌলি ছিলেন শওকত জঙের একজন পুরোনো অনুচর। আঘাত পাওয়ার কারণে অনেক দিন আগে থেকেই তাঁর হাত ও পা কর্মক্ষম ছিল না। পরিখার মধ্যে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনার কাজে তাঁকে রেখে শওকত জং যুদ্ধ করতে চলে যান। যুদ্ধে নবাবের মৃত্যু হয়েছে দেখে তিনি দুই শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন। তবে তাঁর দলের সৈন্যরা পালিয়ে গেলে তিনি নিজেকে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নিচে নিক্ষেপ করে মৃত্যুবরণ করেন। দৈবক্রমে তিনিই ছিলেন একমাত্র নিহত ব্যক্তি, যাঁকে সেই রণক্ষেত্রে কবর দেওয়া হয়েছিল।

বিজয়ী সিরাজ-উদ-দৌলা রাজা মোহনলালকে পূর্ণিয়া প্রেরণ করেন সেখানকার শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও শওকত জঙের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য। তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল মির কাজিম রিসালদার, বালকৃষ্ণ হাজারি, কিশোয়ার খান আজিজ ও মির্জা জয়নাল আবেদিন বাকাওয়ালকে। রাজা রামনারায়ণকে অনেক পারিতোষিক দিয়ে পাটনায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মির মোহাম্মদ জাফর খানের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে ওমর খান ও গোলাম আলি বেগকে তাঁর শত্রু মনে করে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতিও প্রদান করেন। তবে তাঁদের কঠিন নজরবন্দী করে রাখার জন্য নবাব গোপনে রাজা রামনারায়ণকে আদেশ প্রদান করেন। তারপর স্বর্ণখচিত নৌকায় চড়ে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন মুর্শিদাবাদে।

দোস্ত মোহাম্মদ খানের সুপারিশে মির্জা হাবিব বেগ ও আলি নকি খানকে সামান্য শাস্তি প্রদানের পর [দেশ থেকে] বহিষ্কার করা হয়।[১৬]

মহারাজা মোহনলাল পূর্ণিয়া এসে শওকত জং ও সওলত জঙের সম্পত্তির অনুসন্ধান করেন। তিনি জানতে পারেন যে, শওকত জং তাঁর জীবদ্দশায় ঘরে কিছু না রেখে তাঁর যা কিছু ছিল সবই মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মোহনলাল তখন সেখানকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের গৃহে যা কিছু পাওয়া যায়, সবই বাজেয়াপ্ত করেন। মির মোয়াল্লাহ খান, সনজর আলি খান, আকা মির, মির আবদুল হাই ও মির্জা মোহাম্মদ আলিকে বন্দী করা হয়। এক

১৬. কিন্তু আগের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা যুদ্ধে নিহত হন। ১৩ পাদটীকা দ্র.।

মাস পর তাঁদের হাজির করা হয় সিরাজ-উদ-দৌলার দরবারে। নবাবের নির্দেশে সনজর আলি খান ছাড়া অবশিষ্ট চারজনের নাক কেটে উটের ওপর চড়িয়ে রাজধানীর রাস্তায় ঘুরিয়ে অপমানিত করা হয়। পরে চিরদিনের জন্য পাটনাতে তাদের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ গ্রন্থের রচয়িতাকে[১৭] পূর্ণিয়াতে অন্যান্য কয়েদির সঙ্গে ১৯ দিন বন্দী করে রাখা হয়। এরপর নবাব সাহেবের মাতা ও কন্যার সুপারিশে তাঁকে মুক্ত করা হয়।[১৮] রাজা মোহনলালের কাছ থেকে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যেমন—নৌকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে আমি নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করি। সিরাজের ভয়ে কিছুদিন আমি অবস্থান করি রাজমহলে। [সেখানে] হরকরারা আমার কাছে এসে আমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যায়। তারা আমার পিতার কাছ থেকে একটি রসিদ নিয়ে যায়। এই অপরাধের জন্য আমাকে ঘোড়াঘাটের ফৌজদারির পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। নবাবের নিজস্ব দিওয়ানখানার দারোগা রওশন আলি খানকে নিয়োগ করা হয় সেই পদে। পূর্ণিয়ার বৃদ্ধ লোকদের মধ্যরাত্রির আহাজারিতে রাজা মোহনলাল গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর পুত্রকে পূর্ণিয়া শাসনের দায়িত্ব প্রদান করে তিনি মুর্শিদাবাদে চলে যান।

সিরাজের আদেশে মহারাজা রামনারায়ণ মির্জা গোলাম [আলি], মির মোয়াল্লাহ খান ও অন্যদেরসহ পরে মুর্শিদাবাদ থেকে বহিষ্কৃত মির্জা গোলাম আলি বেগ, মির্জা হাকিম বেগ, আহমদ আলি খান ও হাসান কুলি খানকে পাটনা নগরের কেন্দ্রস্থলে বন্দী করে রাখেন। তাঁদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর দুই পুত্র দলিল খান ও আসালত খান এবং সাত শ সৈন্যসহ ওমর খানকে জাফর খানের বাগানে বন্দী করে রাখা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলাকে হত্যা করার পর এই বীরদের সবাই মুক্তি পান। একমাত্র ওমর খান জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে

---

১৭. এ গ্রন্থের রচয়িতা করম আলি খান ছিলেন ঘোড়াঘাটের ফৌজদার। সওলত জঙের মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি আলিবর্দির অনুমতি না নিয়ে পূর্ণিয়া চলে যান। সওলত জং তাঁকে রাঙামাটির ফৌজদার নিযুক্ত করেন ('আলিবর্দির চরিত্র শীর্ষক' পরিচ্ছেদের বর্ণনা দ্র.)। আলোচ্য যুদ্ধের কারণে খুব সম্ভব করম আলি সেই সম্পর্কে আর ঘোড়াঘাটে ফিরে যাননি, যদিও সরকারিভাবে এবং তাঁর নিজের বর্ণনা মতে তখনো তিনি ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন।

১৮. এখানে গ্রন্থকারের বর্ণনা অত্যন্ত বিভ্রান্তিপূর্ণ। 'নবাবের মাতা ও কন্যার সুপারিশে তাঁকে মুক্ত করা হয়'—এ পাঠ দেখে বলা কঠিন কোন নবাবের কথা বলা হয়েছে। আলিবর্দির মাতা তখন জীবিত ছিলেন না। সিরাজের মাতা জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যার বয়স তখন মাত্র তিন কি চার বছর।

কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। ইংরেজদের হয়ে কাজ করার অপরাধে গোলাম হোসেন আরজ বেগিকে চাকরি হারিয়ে নিজ গৃহে অলস জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কলকাতা অভিযান থেকে সিরাজের ফিরে আসার পর যথেষ্ট অপমানের সঙ্গে তাঁকে বন্দী করা হয়। পরে তাঁর কাছ থেকে ৩ লাখ টাকা আদায় করে বেগমদের সুপারিশে তাঁকে নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। শওকত জঙের ভ্রাতাদের[১৯] ও স্ত্রীদের ঢাকায় পাঠিয়ে বন্দী করে রাখা হয়।

এই সব ঘটনার পর দুই মাস যেতে না যেতেই ইংরেজ সাহেবদের [পুন] আগমনবার্তা পাওয়া গেল।[২০]

---

১৯. শওকত জঙের দুই ভাইয়ের নাম এ গ্রন্থে (য. না., পৃ. ৬৯) পাওয়া যাচ্ছে এবং তাঁরা ছিলেন ১. জসরত খান ও ২. মিরজাই সাহেব।

২০. যতটুকু জানা যায়, গ্রন্থকারের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক ভালোই ছিল এবং তাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকার কোনো কঠিন কথা বলেননি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইংরেজদের বিজয়

ইংরেজদের পুনরাগমন, কলকাতা অধিকার ও সিরাজের প্রথম পরাজয় : এর কয়েক বছর আগে ইংরেজ ও ফরাসিরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছিল। ফরাসিরা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে 'হ্যাট পরিধানকারী' ইংরেজদের মাদ্রাজ কুঠি এবং তাদের অনেক বাণিজ্য তরি দখল করে নেয়। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর সৈন্যসহ কয়েকটি বড় যুদ্ধজাহাজ ইংল্যান্ড থেকে পণ্ডিচেরির উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়। ফরাসিদের গভর্নর [জেনারেল], কর্নেল ও ফরাসি কাউন্সিলের মধ্যে [আত্ম]কলহের কারণে ইংরেজরা জয়লাভ করে। ধূলিসাৎ করে দেয় তারা ফরাসিদের নির্মিত পণ্ডিচেরি কুঠি।

১১৭০ [হিজরি, ১৭৫৬ খ্রি.] সনে কলকাতা অধিকার ও [সেখানে] ইংরেজ সাহেবদের হত্যার সংবাদ মাদ্রাজে পৌছালে অ্যাডমিরাল [ওয়াটসন] একটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এবং কর্নেল ক্লাইভ সাবিত জং[১] একদল সেপাই ও গোরা সৈন্য নিয়ে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁদের প্রতিহত করতে অসমর্থ হয়ে রাজা মানিক চাঁদ পলায়ন করেন। বিনা যুদ্ধে অ্যাডমিরাল [ওয়াটসন] কলকাতায় প্রবেশ করে সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে শান্তির প্রস্তাব প্রেরণ করেন।[২] রাজা মানিক চাঁদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে নবাব এবার সজাগ হয়ে ধারণা করেন যে,

---

১. কর্নেল ক্লাইভের উপাধি ছিল 'সাবিত জং' (অর্থ : Steady and Tried in War)।

২. এখানে করম আলির বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ সম্পর্কে *তারিখ*-এর বর্ণনা (*তারিখ-ই*, পৃ. ১২৬) বেশি বিস্তারিত। ইংরেজদের পুনরাগমনের সংবাদ পেয়ে সিরাজ যে জিয়া উল্লাহ খান নামের একজন সেনাপতিকে আরও কয়েকজন সেনাপতিসহ মানিক চাঁদের সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন, সে বর্ণনাও *তারিখ*-এ আছে। এখানে *সিয়ার*-এর বর্ণনাও (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২১) বেশি বিস্তারিত।

এবারও আগের মতোই অবস্থা হবে। ফলে অনতিবিলম্বে যুদ্ধ করার জন্য তিনি অগ্রসর হন। তাঁর সঙ্গের লোকজনের সবাই ছিল খাদ্যদ্রব্যাদি চেখে আস্বাদকারী প্রকৃতির, অতএব উত্তরাধিকার প্রাপকের চেয়ে নিকৃষ্টতর।[৩] আর এসব লোক নিয়েই তিনি কলকাতা পৌঁছে [ইংরেজদের] কুঠির কাছে একটি বাগানে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু সে স্থান তাঁর আবাসস্থলের যোগ্য ছিল না। সেনাপতিদের প্রথম কর্তব্য শিবিরের স্থান সম্বন্ধে [পূর্বাহ্নেই] অনুসন্ধান করা। কিন্তু তা করা হয়নি। তাঁর প্রধান সেনাপতিগণ, বিশেষ করে মির মোহাম্মদ জাফর খান[৪] নবাবকে বলেছিলেন যে, এ স্থান শিবির স্থাপনের যোগ্য নয়। কারণ এ স্থান ছিল রাস্তার ওপরে। ইউরোপীয়রা ছিল রাত্রিকালে আক্রমণের জন্য বিখ্যাত (কুখ্যাত?)। কিন্তু নবাব তাদের কথায় কর্ণপাত না করে সেখানেই থেকে যান।

ইংরেজ সাহেবরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা তাদের সমুদয় সৈন্য জাহাজের ভেতরে রেখে মাত্র কয়েকজন লোককে দূতিয়ালি কাজের অজুহাতে [নবাবের] শিবিরে পাঠিয়ে শিবিরের অবস্থান এবং সেখানে আসা-যাওয়ার পথ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে। এক রাতে অতর্কিত আক্রমণের জন্য তারা জাহাজ থেকে অবতরণ করে। নবাবের অযোগ্যতার কারণে তাঁর সমুদয় সৈন্য যখন অলসভাবে নিদ্রামগ্ন, তখন তারা শিবিরে প্রবেশ করে আক্রমণের ধ্বনি তোলে। নবাবের সমগ্র সেনাবাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই দেখে অর্ধেকের বেশি লোক সে রাতের মধ্যেই পালিয়ে যায়।[৫]

দোস্ত মোহাম্মদ খান তাঁর নিজের তাঁবুতে ও খেয়াজা আবদুল হাদি খান নবাবের কাছে যাওয়ার পথে আহত হন। মোহাম্মদ ইরিজ খান বাহাদুরকে ইংরেজ সৈন্যরা আক্রমণ করে। তিনি মাথার পাগড়ি ও [পায়ের] পাদুকা ছাড়াই নবাবের কাছে এসে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে পরামর্শে

---

৩. এখানে মূল ফারসি পাঠ খুব পরিষ্কার নয় বলে অনুবাদক স্যার যদুনাথ বলেছেন এবং তিনি যে পাঠ দিয়েছেন—'With men who were food taster and therefore worse than heritage-holder [sic in orig.] he reached Calcutta'. তা-ও খুব পরিষ্কার ও অর্থবোধক নয়। তবে এ বাক্যের মাধ্যমে গ্রন্থকার খুব সম্ভব বলতে চেয়েছেন, বিনা পরিশ্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভকারীর মতো অপদার্থ ছিলেন সিরাজের সঙ্গীরা।

৪. মির জাফর খানের মুখ দিয়ে সত্যিই এ কথা বের হয়েছিল কি না, তাতে সন্দেহ আছে। কারণ, তখন তিনি ইংরেজদের সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সিরাজের ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর। *সিয়ার*-এ এ সম্পর্কে সাক্ষ্য আছে।

৫. *সিয়ার*-এ এই বর্ণনা (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১-২১) বেশি বিস্তারিত ও অর্থবোধক। *তারিখ*-এর বর্ণনাও যথেষ্ট বিশদ। পরের বাক্যে উল্লেখিত ইরিজ বা ইরাজ খান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার শ্বশুর।

বসেন। তখন ছিল শীতকাল। এক প্রহর বেলা পর্যন্ত চারদিক ধূলিকণা ও কুয়াশার আবরণে এমনভাবে আচ্ছন্ন ছিল যে, কেউ তার প্রতিবেশী কাছের লোককেও দেখতে পাচ্ছিল না। অনুচরগণ নিজেদের দুর্দশার কারণে তাদের মনিবদের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর নিতে পারেনি।[৬] ইংরেজ সাহেবরা তাদের মনের প্রশান্তি নিয়ে সমগ্র শিবির পরিভ্রমণ করে। আবহাওয়া পরিষ্কার হলে রাজা মানিক চাঁদ [ইংরেজদের] কুঠিতে গমন করেন। সেখানে তিনি কাউকে দেখতে না পেয়ে কোনো উদ্দেশ্য সাধন না করেই ফিরে আসেন। সেনাপতিগণ সমবেত হয়ে অজুহাত সৃষ্টি করে নবাবকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে বলেই তাঁরা তাঁকে এখানে শিবির স্থাপনে বারণ করেছিলেন।

সিরাজ ও তাঁর সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়েন। আরও উন্নততর ব্যবস্থার মাধ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তাঁর সেনাপতিগণ তাঁকে উপদেশ দিলেও তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে তিনি শান্তি স্থাপন করতে চান। ইংরেজ পক্ষের দূতকে ডাকিয়ে এনে তিনি তাদের সব দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি করেন। কলকাতা লুণ্ঠনের জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হন এবং ইংরেজ সাহেবদের সম্মানী বস্ত্র (খিলাত) উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। সেদিনই তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। অতি দ্রুতগতিতে তিনি মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে প্রবেশ করে হোলি উৎসবে যোগদান করেন।[৭]

ফরাসিদের অনুরোধে নবাব বালকৃষ্ণ হাজারিকে একটি সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজা দুর্লভরাম ও মির মোহাম্মদ জাফর খানকে তিনি শক্তিশালী সেনাদল দিয়ে অগ্রদ্বীপে মোতায়েন করেন।[৮] নবাব মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের চারদিকে পরিখা ও গর্ত খননের আদেশ দেন। সুতি পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করার আদেশও তিনি প্রদান করেন। কিশোয়ার খানকে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি পাহাড়ের মতো উঁচু একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। রহম খানের মতো [যোগ্য]

---

৬. প্রায় অনুরূপ বর্ণনা *তারিখ* ও *সিয়ার*-এও আছে। কিন্তু ইংরেজদের এই প্রতারণার বিরুদ্ধে সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিকই তেমন কোনো জোরালো ভাষায় এর নিন্দা করেননি। তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই ইংরেজদের অধীনে চাকরিরত ছিলেন বলে দেখা যায়।

৭. করম আলির বর্ণনা এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ১২৮-২৯) ও *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২-২৫) এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

৮. মির মোহাম্মদ জাফর খান ও রাজা দুর্লভরাম যে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, সে বর্ণনা সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থে থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থে নেই। সিরাজ এ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

কোনো সেনাপতি সে সময়ে ছিল না। কয়েকজন আহাম্মকের[৯] পরামর্শে তিনি তাঁকে পাটনা প্রেরণ করেন।

অগ্রদ্বীপে অবস্থানকালে মির মোহাম্মদ জাফর খান ও রাজা দুর্লভরাম জানতে পারেন যে, সিরাজ-উদ-দৌলা আনন্দসায়রে নিমগ্ন। আপন কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বেখেয়ালি হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে ইংরেজদের শৌর্যের খ্যাতি চারদিকে পরিব্যাপ্ত। তাঁরা দুজন এ সুযোগ গ্রহণের জন্য অতি গোপনে একজন দূত প্রেরণ করে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করেন। নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও তাঁরা [দুজন] ইংরেজদের প্ররোচিত করেন। সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর কর্মকর্তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে মির মোহাম্মদ জাফর খানকে তাঁর কাছে তলব করেন এবং খাদেম হোসেন খানের পাশাপাশি তাঁকেও পদচ্যুত করেন। তিনি রাজা দুর্লভরামের প্রতি আস্থা আগের চেয়ে আরও কমিয়ে দেন।[১০]

এ সময়ে ইংরেজদের হাতে ফরাসিদের পরাজয়ের সংবাদ [নবাবের কাছে] এসে পৌঁছায়। আমি আগেই বলেছি, এই দুই জাতির মধ্যে শত্রুতা ছিল। সিরাজের ব্যাপারে মানসিক স্বস্তি লাভ ও তাদের আস্তানা পুনরাধিকার করে ইংরেজরা ফরাসিদের ঘিরিটির বাগানের নিকটবর্তী স্থান থেকে সমূলে বিতাড়ন করার কাজে লেগে যায়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ফরাসিরা ইংরেজদের দুটি জাহাজ নদীতে ডুবিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে বন্ধ করে দেয় তাদের জাহাজ আগমনের পথও। ফরাসিরা নদীতে ইংরেজদের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের স্থলভাগের পরিখা থেকে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে—এ সংবাদ শুনে [ইংরেজ] অ্যাডমিরাল বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে একজন ফরাসির পথপ্রদর্শনের কল্যাণে—সে নিজে এ পথের হদিস জানত—একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পথে তিনি (অ্যাডমিরাল) ফরাসি কুঠির বিপরীত দিকে একটি রণতরি এনে হাজির করেন এবং জল ও স্থল থেকে এমন প্রচণ্ডভাবে গুলি বর্ষণ করতে থাকেন যে, আকাশ ও মাটি আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ফরাসিরা পরাজিত হবে—আল্লাহর এমন ইচ্ছা ছিল বলে ইংরেজদের জাহাজের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত একটি আগুনের গোলা প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে একটি ফরাসি

---

৯ এই আহাম্মকেরা ('the fools') কারা ছিলেন, সে কথা পরিষ্কার নয়।

১০. মির জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ সিরাজ এত বিলম্বে পেয়েছিলেন—গ্রন্থকারের এ বর্ণনা খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। যদি এ বর্ণনা সত্য হয়ে থাকে, সিরাজ তাঁর প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংবাদই রাখতেন না বলে ধরা যায়। প্রকৃতপক্ষে সিরাজের প্রতি অন্যান্য গ্রন্থকারের মতো করম আলি খানও বিরূপ ছিলেন বলে মনে হয়। তার ওপর গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার ছিলেন ইংরেজদের প্রায় আশ্রিত।

জাহাজের ওপরে পড়ে। জাহাজটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। সুতরাং ফরাসিরা তাদের নৌবাহিনীর সব আশা পরিত্যাগ করে তাদের কুঠির সর্বোচ্চ স্থানে উঠে যায়। সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মরিয়া হয়ে লড়াই করতে থাকে। এই লড়াইয়ে তাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। সিরাজ-উদ-দৌলার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তারা নিরাপত্তার আশায় কুঠির ওপরে ইংরেজ পতাকা উত্তোলন করে এবং কুঠির চাবি ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়।

এ যুদ্ধের সময় ইংরেজরা [ইচ্ছা করেই] হুগলী দুর্গের ওপর কয়েকটি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। তাতে ভয় পেয়ে দুর্গরক্ষক মির্জা মোহাম্মদ আলি মুর্শিদাবাদে পলায়ন করেন।[১১] নবাব বালকৃষ্ণ হাজারিকে ফরাসিদের সাহায্যে আগেই সেখানে পাঠানো হয়েছিল। ইংরেজদের কাছে বন্দী হওয়া অনভিপ্রেত মনে করে প্রায় ২০০ ফরাসি তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে চলে আসে। তারা সেখানে ফরাসি কুঠিতে মঁসিয় লার কাছে উপস্থিত হয়। ইংরেজরা ফরাসডাঙ্গার ফরাসি কুঠি [প্রকৃতপক্ষে ডি'অরলিয়েন্স দুর্গ] ধূলিসাৎ করে ফেলে। সেখানে তারা যা পায় তা লুট করে কলকাতায় ফিরে আসে।[১২] অবস্থাদৃষ্টে নবাবকে দুর্বল, অপদার্থ ও বুদ্ধিহীন মনে হওয়ায় মঁসিয় লা কিছুসংখ্যক ফরাসি সৈন্য ও কয়েকটি যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে স্থলপথে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করেন। এ [সংকটের] সময় কেউ কেউ ফরাসিদের তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে রাখার প্রস্তাব দিলে সিরাজ এই উত্তর দেন যে, তাতে ইংরেজরা তাঁর চরম শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। তিনি মঁসিয় লাকে পাটনায় অবস্থান করতে অনুরোধ করেন, যাতে নবাবের প্রয়োজনে তাঁকে সেখান থেকে আনা যেতে পারে। সেদিনই রাতের আক্রমণের সময় দোস্ত মোহাম্মদ আঘাত পেয়েছিলেন বলে [নবাবের] অনুমতি নিয়ে তিনি নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে [পাটনা] পৌঁছার পর তিনি প্রাণত্যাগ করেন। অত্যন্ত সাহসী, অদম্য ও অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন তিনি। পাঁচজন সৈন্যের রিসালদার থেকে তিনি পাঁচ শ অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি হয়েছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি দৃষ্টান্তসূচক কর্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।[১৩]

ফরাসিদের এই পরাজয়ের পর সিরাজ-উদ-দৌলা মির মোহাম্মদ জাফর খানের প্রতি আগের চেয়ে আরও বেশি সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে পড়েন। তিনি খোয়াজা

১১. এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা *রিয়াজ*-এও (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৮৮) আছে।

১২. ইংরেজ ও ফরাসিদের এ যুদ্ধের বর্ণনা *তারিখ*-এও (*তারিখ-ই*, পৃ. ১৩০) আছে। *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৬) এই ঘটনার মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

১৩. সেনাপতি দোস্ত মোহাম্মদের মৃত্যুর কথা *তারিখ*-এ নেই। নেই *সিয়ার*-এও।

আবদুল হাদিকে বখশি পদে নিযুক্ত করে সাঈদ মির্জাকে মির মোহাম্মদ জাফর খান ও খাদেম হোসেন খানের অধীন সেনাবাহিনীর তালিকা প্রস্তুত করার আদেশ দেন।

এসব কিছু করার পরও তৃপ্তি লাভ না করে নবাব এ দুজন সেনাপতিকে বহিষ্কার করার জন্য একজন রূঢ় প্রকৃতির নাজির প্রেরণ করেন। অন্যান্য সেনাপতির চেয়ে এ দুজন ছিলেন অধিক শক্তিশালী। তাঁরা তাঁদের গৃহে তাঁদের অধীন সৈন্য মোতায়েন করে নবাবকে এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, 'আমাদের সৈনিকদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করুন, যাতে আমরা নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারি এবং আপনার কাছ থেকে চলে যেতে পারি।'[১৪] জগৎশেঠ ও রাজা দুর্লভরামকে মিত্র হিসেবে পেয়ে মির্জা আমির বেগের মাধ্যমে তাঁরা ইংরেজদের কাছে এই মর্মে পুনঃপুন সংবাদ দিতে থাকেন যে, 'আমরা সমস্ত সৈন্যকে নিজেদের দলে আনতে সমর্থ হয়েছি। তারা যাতে নবাবকে পরিত্যাগ করে সে চেষ্টাও করছি। তাঁর দুষ্কর্মের কারণে সব সৈন্য এখন নবাবের বিপক্ষে। তারা চায় যে, দেশের শাসনভার তাঁদের নবাবের বংশের হাত থেকে অন্যত্র যাক। এটাই সবচেয়ে অনুকূল সময়!'

ইংরেজ সাহেবগণ এ সংবাদ পাওয়ার পর এসব লোকের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ দেশ অধিকারের মানসে দৃঢ়চিত্তে রসদাদি সংগ্রহ করতে থাকে।

শত্রুদের প্রস্তুতি গ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও নবাব তা উপেক্ষা করে প্রমোদে আমগ্ন ডুবে থাকেন। তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ, বিশেষ করে মির মদন ও খোয়াজা আবদুল হাদি খান তাঁর আলস্যের কারণে মনে খুবই দুঃখ পেয়ে তাঁকে বলেন, 'ইংরেজদের প্রাবল্য পরিমিতি বোধের সীমা লঙ্ঘন করেছে। তারা এ দেশ অধিকারে দৃঢ়সংকল্প। বন্যার পানি মাথার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর তা থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টাতে কোনো নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না। প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কোনো বিলম্ব করবেন না। কারণ, রাজ্যের স্থিতিশীলতা, প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজাদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি তীক্ষ্ণধার তরবারি, সঠিক পরিকল্পনা, অত্যধিক সতর্কতা ও প্রচুর প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুতেই

---

১৪. মির জাফর ও তাঁর তথাকথিত ভাগনে খাদেম হোসেনের সঙ্গে যে সিরাজের সম্পর্ক চরম অবস্থায় পৌছেছিল, এ কথা সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থ, যেমন—*তারিখ*, *সিয়ার*, *রিয়াজ* প্রভৃতিতে যেমন আছে, তেমনি মির জাফরের বিশ্বাসঘাতকতাও যে চরম অবস্থায় পৌছেছিল, সেই বর্ণনাও আলোচ্য গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে আছে। তবু তাঁরা (গ্রন্থকারগণ) সবাই সিরাজের দোষের কথাই বেশি করে বলেছেন, মির জাফর, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, উমিচাঁদের দোষ তাঁরা এতটা দেখেননি।

সম্ভব হতে পারে না। মির মোহাম্মদ জাফর খান বিশ্বাসঘাতকতা করে এই রাজপরিবারের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর। প্রথমে তাঁকে শেষ করা আবশ্যক। তারপর ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া সহজ হবে।'[১৫]

কিন্তু কিছু কিছু প্রতারক নবাবকে এ উপদেশ দেন যে, 'এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করা ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভাব্যতার সীমানার বাইরে। মির মোহাম্মদ জাফর খান ও অন্যরা মনে আঘাত পেয়েছেন। আপনি যদি তাঁদের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করে ফেলেন, তাহলে ইংরেজ সৈন্য আমাদের বীর সেনানীদের বিরুদ্ধে কোনো দিন অগ্রসর হওয়ার সাহস পাবে না। যদি স্ত্রীলোক ও শিশুরা প্রতিরক্ষার জন্য গৃহের ছাদের ওপর থেকে ইট ও পাথর নিক্ষেপ করে, তাহলে মহল্লার সরু গলিতে তারা তাদের পরাভূত করতে পারবে।'[১৬]

ইদানীংকালে তোষামোদকারীরা হিন্দুস্থানের শাসনকর্তাদের ওপর পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বলে সিরাজ সব চেষ্টা থেকে নিষ্ক্রিয় থাকেন। খ্রিষ্টান সৈন্যদলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা থেকেও বিরত থাকেন।[১৭]

মির মোহাম্মদ জাফর খানের বহু বছর আগে বপন করা বীজ এখন প্রতিহিংসার ভূমিতে অঙ্কুরিত হচ্ছিল। একদল লোক, যাদের তিনি বন্ধু বলে মনে করতেন, তাদের সঙ্গে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার পতন সম্বন্ধে সর্বক্ষণ পরিকল্পনা করতে থাকেন। এ সময় হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে, কর্নেল ক্লাইভ সাবিত জং একদল ইংরেজ সৈন্য নিয়ে বাঙলার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। বিজলি চমকও তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিহীন এবং রাজকীয় বাহিনীও নিষ্প্রভ। সিরাজ-উদ-দৌলা মির মোহাম্মদ জাফর খান ও খাদেম হোসেন খানকে তাঁদের পূর্বেকার পদে বহাল করেন। সেই সঙ্গে শেখ খয়ের উল্লাহ খিদমতগারকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। নবাব ও তাঁদের সামনে কোরআন রেখে এই মর্মে শান্তি স্থাপিত হয় যে, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের পর মির মোহাম্মদ জাফর খান ও খাদেম হোসেন খান 'রিসালা'কে হৃষ্টচিত্তে বিদায় দেওয়া হবে। এই মর্মে একটি দলিলও প্রস্তুত করা হয়। এ দুজন সেনাপতির দস্তখতের পর তা নবাবের সামনে

---

১৫. সমসাময়িক অন্য কোনো ইতিহাস গ্রন্থে এ বর্ণনা নেই।

১৬. আলোচ্য গ্রন্থকারসহ সমসাময়িক প্রায় সব ইতিহাস রচয়িতাই যেকোনো কারণেই হোক সিরাজের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এ কারণেই বোধ হয় কেউ তাঁর সম্বন্ধে খুব সামান্য একটি ভালো কথাও বলেননি। অথচ দেশপ্রেমসহ সিরাজের যে কিছু গুণ ছিল, সেসব কথা তাঁদের বর্ণনাসূত্রে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

১৭. গ্রন্থকারের এ বর্ণনা পক্ষপাতদুষ্ট বলেই মনে হয়। *তারিখ, রিয়াজ* ও *সিয়ার*-এর বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায় না।

পেশ করা হয়।[১৮] এই সময় মির মদন বলেন, 'তার প্রাণঘাতী শত্রু সম্পর্কে মানুষের অতিশয় সতর্ক থাকা আবশ্যক। এ সেনাপতিদের কাছ থেকে এ সময় কোনো ধরনের ভালো কাজ আশা করা অনুচিত। প্রথম তাদের বিনাশ করা আমাদের কর্তব্য এবং এ সংবাদ অবগত হয়ে ইংরেজরা নিজেরাই পালিয়ে যাবে। আমাদের শিবিরে এ দুজনের অবস্থান আমার অনুগত সেনাপতিদের কাছে চিত্তবিক্ষেপ ও মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারা যে প্রতারণার আশ্রয় নেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'[১৯]

কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন।

---

১৮. মির জাফরের সঙ্গে মিটমাট করার কথা *তারিখ* (*তারিখ-ই*, পৃ. ১৩২) এবং *রিয়াজ*-এও (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৮৯) আছে। *রিয়াজ*-এর মতে, 'তখন হঠকারিতা ত্যাগ করে তিনি ওই খানের (মির জাফরের) তোষামোদ করতে থাকেন এবং মহাবত জঙের বেগমকে পাঠিয়ে অতীতের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতিশ্রুতি ও কর্মকাণ্ডের ওপর আস্থা না থাকায় মির জাফর তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি।'

এই বর্ণনা *সিয়ার*-এ নেই। তবে মির জাফর, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, উমিচাঁদ ও ইংরেজদের মধ্যে যে একটি চুক্তি হয়েছিল এবং সেই চুক্তিমতে সিরাজের পরাজয়ের পর তাঁর সম্পত্তি থেকে ইংরেজদের যে ৩ কোটি টাকা প্রদান করা হবে, সেই কথার উল্লেখ আছে এবং সেসব কথা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত আছে (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮-৩০)।

১৯. এ ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় *রিয়াজ*-এ। সেখানে (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৮৯-৯০) আছে: 'গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মির মদন এই সময় সিরাজ-উদ-দৌলাকে বলেন যে, ইংরেজরা মির মোহাম্মদ জাফরের প্ররোচনায় চলছে। সুতরাং মির মোহাম্মদ জাফরকে প্রথমে শেষ করে ফেলা উচিত। তাঁকে হত্যা করার সংবাদ পেলে ইংরেজরা আর অগ্রসর হওয়ার সাহস করবে না।'

ঊনবিংশ অধ্যায়

পলাশী

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের যুদ্ধ, তাঁর পূর্ণ পরাজয় ও মৃত্যু : ১১৭০ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের ২ তারিখ (২০ জুন ১৭৫৭ খ্রি.) মির মোহাম্মদ জাফর খানের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করে ইংরেজদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সিরাজ-উদ-দৌলা মনসুরগঞ্জ [রাজপ্রাসাদ] থেকে অগ্রসর হন। দুই কি তিন দিন পর পরস্পরবিরোধী দুই সেনাবাহিনী একে অন্যের দর্শন লাভ করে। ইংরেজরা পলাশীর উদ্যানে শিবির স্থাপন করে তাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। সিরাজ-উদ-দৌলা রাজা মোহনলাল ও মির মদনকে তাঁর সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে প্রেরণ করে তাঁদের সমর্থন জোগাতে নিজে পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করেন। জিনসি গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা বাহাদুর আলি খান নবাবের কাছ থেকে কোনো আদেশ না পাওয়া সত্ত্বেও নিজের বিশ্বস্ততার কারণেই গোলা নিক্ষেপ করতে থাকেন। মির মোহাম্মদ জাফর খান ও খাদেম হোসেন খান নবাবের কাছ থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ও তাঁর বাম দিকে অবস্থান নিয়ে দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। মহারাজা দুর্লভরাম আমাদের সেনাবাহিনী থেকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে ও ইংরেজ বাহিনীর ডান দিকে অবস্থান নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তাদের দলপতি কোনো কাজে (সংগ্রামে) অংশগ্রহণ করছেন না দেখে বন্দুকধারীরা বেদনাভরা মনে রণক্ষেত্রের এক কোণে দাঁড়িয়ে থেকে শত্রুদের গোলার আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে থাকে। গোলাবারুদের গন্ধ সহ্য করতে পারে না এমন একদল লোক (সৈন্য) একদিকে পালিয়ে যায়। মঁসিয় লার সঙ্গ পরিত্যাগ করে একদল ফরাসি সৈন্য নবাবের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। তারা তাদের কামান-বন্দুক ইংরেজদের পরিখার কাছে নিয়ে যায়। তারা সৈন্য ও প্রয়োজনীয় রসদ ইত্যাদি দিয়ে শক্তিবৃদ্ধির আবেদন জানালেও

কেউ তাদের কথায় সাড়া দেয়নি। কারণ, এ দেশের লোকের চোখ ও অন্তর থেকে ধৈর্য অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়েছিল।[১]

অবশ্য মির মদন যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখভাগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর পেটে কামানের গোলা আঘাত করলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা মির মোহাম্মদ জাফর খানকে কাছে ডেকে আনেন এবং তাঁর কাছে মিনতির পর মিনতি জানাতে থাকেন। নবাব তাঁর মাথার পাগড়ি খুলে তা মির জাফরের পায়ের কাছে রেখে[২] তাঁর সম্মান রক্ষার আবেদন জানান। মির মোহাম্মদ জাফর খান প্রতারণাপূর্ণ অভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে বলেন, 'এখন দিনের মাত্র চার ঘড়ি সময় অবশিষ্ট আছে। ইংরেজ সৈন্যরা এখন খুবই প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী। আমাদের সৈন্যদের মধ্যে দুর্বলতা ও পরাজয়ের লক্ষণ বিদ্যমান। সারা দিনের পরিশ্রমের কারণে আমাদের সৈন্যরা এখন এমন কোনো অবস্থায় নেই যে, তাদের ওপর ভরসা করে আমরা ইংরেজদের মতো শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করতে পারি।

---

১. সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে পলাশীতে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের বর্ণনায় আলোচ্য গ্রন্থকার মোটামুটি সত্য কথা বলেছেন বলে দেখা যাচ্ছে। সেখানে মির জাফর, খাদেম হোসেন ও দুর্লভরাম যে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে বর্ণনা প্রায় সব সমসাময়িক ঐতিহাসিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিবরণী থেকে পাওয়া যায়। প্রধানত এ কারণেই যে সিরাজের পরাজয় ঘটেছিল, সে তথ্যও পাওয়া যায়। তবে প্রায় সব গ্রন্থকার সিরাজের দোষ ধরার ব্যাপারে অনেক আগ্রহী হলেও তাঁরা মির জাফরদের দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মোটেই তৎপর ছিলেন বলে দেখা যায় না। ইংরেজ আমলে রচিত এসব ইতিহাসে ইংরেজদের দোষেরও তেমন উল্লেখ নেই। বরং অমানুষ সিরাজের অমার্জনীয় অপরাধই যে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল, সে ইঙ্গিত সর্বত্রই দেখা যায়।

২. এ সম্পর্কে *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২) আছে, 'Seradj-ed-doulah spoke to him in the humblest strain, and at last descended to the lowest supplications; he even took his turban off his head (at least this was the report) and placed it before the General to whom he addressed these very words : "I now repent of what I have done; and availing myself of those ties of consanguinity which subsist between us, as well as on those rights which my grandfather, Aaly-verdy-khan has doubtless acquired upon your gratitude, I look up to you, as to the only representative of that venerable personage; and hope therefore that, forgetting my past trespasses, you shall henceforward behave as becomes a Se'yd, a man united in blood with me, and a man of sentiments, who conserves a grateful remembrance of all the benefits he has received from my family I recommend myself to you. Take care of the conservation of my honour and life."'

এই মর্মস্পর্শী বক্তৃতা যে মির জাফরের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, সে বর্ণনা বিরল নয়।

'অতএব এটাই যুক্তিসংগত ও আমাদের চূড়ান্ত নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় যে, আমাদের কামানগুলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে পরিখার ভেতরে নিয়ে রাখার জন্য আপনি আদেশ দিন, যাতে আমাদের সৈন্যরা আরামে রাত্রিযাপন করতে পারেন। তারপর কাল কী করা যেতে পারে, তা আমরা দেখব।'[৩]

আমি [এ-ও] শুনেছি যে, মির মোহাম্মদ জাফর খান সে সময়ই নবাবকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবাবের অসংখ্য সৈন্য সেখানে উপস্থিত থাকার কারণে তিনি সে অভিসন্ধি থেকে বিরত থাকেন। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত অভিজ্ঞ সেনাপতিদের মধ্যে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং যুদ্ধের কামান-বন্দুক পরিখায় ফিরিয়ে আনার জন্য বাহাদুর আলি খানকে আদেশ দেন।

নবাবের সৈন্যদের রণক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ও তাঁরা কামান-বন্দুক সেখান থেকে সরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা নতুন মনোবল লাভ করে। তাদের কামানগুলো তারা সামনে এনে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। নিজের সেনাবাহিনীর মধ্যে দুর্বলতা ও পরাজয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়ে সিরাজ উঁচু-নিচু সব স্তরের সৈন্যকে উদ্দেশ করে আলিবর্দির গুণাবলির কথা উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে বলেন, 'বাঙলাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ হবে বিনাশ ও ধ্বংস। এখন সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করুন, যাতে আপনাদের কেউ কাপুরুষের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারে।'

কিন্তু সৈন্যদের পেছন দিকে চলে যাওয়ার আদেশ তাদের শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে কেউ সিরাজ-উদ-দৌলার কথায় কর্ণপাত করেনি। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদয় সেনাবাহিনী রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে।[৪]

---

৩. *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২-৩৩) আরও আছে :

'This affecting speech had no effect on Mir-djaafer-qhan, who finding that the occasion for which he had been looking out this long while, was now at hand, thought only of availing himself of it;... Treason having already taken possession of his heart, he coldly answered, that the "day was drawing to its end; and there remained no time for an attack. Send a counter order to the troops that are advancing," said he: "re-call those engaged; and tomorrow, with the blessings of God, with all the troops together and will provide for the engagement."'

সেখানে আরও বর্ণিত আছে, মির জাফরের এ কথা অনুসারে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। এরপর তিনি ইংরেজদের আক্রমণে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

৪. সিরাজের তরফ থেকে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার এ আদেশই যে তাঁর শোচনীয় পরাজয়ের কারণ ছিল, সে কথা সমসাময়িক সব ঐতিহাসিকই বলে গেছেন।

নবাব কয়েকজন 'খওয়াসি'কে নিয়ে ঘণ্টা খানেক সময় অপেক্ষা করেন। কিন্তু ইংরেজদের শক্তি দেখতে পেয়ে অনিবার্য কারণে মুর্শিদাবাদের দিকে পলায়ন করেন। তিনি মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে এসে জগৎশেঠকে ডাকিয়ে আনেন। অবনত মস্তকে তাঁকে বলেন, 'ইংরেজরা যত টাকা চায়, তা দিয়ে আপনি তাদের বিদায় করে দিন। শান্তি স্থাপনে তাদের সম্মত করান।'[৫]

সিরাজ সম্বন্ধে জগৎশেঠের মনে স্বস্তি ছিল না। মির মোহাম্মদ জাফর খানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কারণে নবাব ছিলেন তাঁর শত্রু।[৬] জগৎশেঠ নবাবের সামনে তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং নবাবের কারাগারে বন্দী তাঁর উকিল রণজিৎ রায়কে মুক্ত করিয়ে নেন। নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কুন্দামন মুনশিকে দূত হিসেবে মির মোহাম্মদ জাফর খানের কাছে এই বলে পাঠান যে, 'রাজধানীতে ফিরে আসতে আপনি এত বিলম্ব করছেন কেন?'

যেদিন শত্রুরা বিজয় লাভ করে সে রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। সে কারণে সেনাপতিগণ সিরাজ-উদ-দৌলার সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারেননি অথবা তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর গৃহে যে পাঁচ শ রমণী ছিল, সিরাজ-উদ-দৌলা পরদিন তাদের কাছে যে আহার্য ও বস্ত্রাদি ছিল, তা দিয়ে তাদের বিদায় করে দেন।[৭] সেদিন রাত পর্যন্ত তিনি মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে থাকেন। তারপর পাটনা গমনের জন্য মনস্থির করেন।

রাতদুপুরে তিনি তাঁর স্ত্রী লুৎফ-উন-নিসা বেগম, তিন বছরের কন্যা ও একজন খোয়াজাসহ শিবিকায় চড়ে নৌকাযোগে যাবেন বলে ভগবানগোলার দিকে অগ্রসর হন। রাতের গভীর অন্ধকার, পথকষ্ট ও [পথে] কাদার কারণে বেগমের শিবিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে নবাব একাই ভগবানগোলায় পৌঁছান। সেখানে 'ভাউলিয়া' নামে পরিচিত একটি নৌকায় চড়ে তিনি তাঁর খোয়াজার সঙ্গে মালদহ অভিমুখে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেন। কারণ, অন্যপথে রাজমহলে মির মোহাম্মদ জাফর খানের ভ্রাতা অবস্থান করছিলেন। মালদহ পৌঁছে আম সরবরাহকারী দারোগার কাছে তিনি তাঁর খোয়াজাকে পাঠিয়ে বলেন যে, তিনি যেন তাঁর অধীন পদাতিক সৈন্যদের নবাবের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর কাফের খোয়াজাকে বন্দী করার পর নবাবকে গ্রেপ্তার করার অভিসন্ধি করেন এবং এত বড় উপহার নিয়ে জাফর খানের কাছে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত

---

৫. এ ঘটনার কথা *তারিখ*-এও উল্লেখ আছে।

৬. প্রকৃতপক্ষে জগৎশেঠের বন্ধুত্ব ছিল স্বার্থের কারণে। তিনি নবাব 'সুজা' খানের বন্ধু হলেও স্বার্থের খাতিরে আলিবর্দির পক্ষ গ্রহণ করে সরফরাজ খানকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

৭. গ্রন্থকার অন্তত সিরাজের এই মানবিক গুণটির কথা স্বীকার করে গেছেন।

গ্রহণ করেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। খোয়াজাটি [কোনো প্রকারে] পালিয়ে আসতে সমর্থ হন এবং তাঁর প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।[৮]

চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেখে আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে নবাব চিত্তবিক্ষেপে রাজমহলে যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে বসেন। রাজমহলের পার্শ্ববর্তী এক জায়গায় নৌকা থেকে অবতরণ করে সেখানে বসবাসকারী এক ফকিরের কাছে তিনি উপস্থিত হন। ফকির আল্লাহর বান্দা—এ কথা মনে করে তিনি তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দেন। কিন্তু সেই কালো মনের মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে মির মোহাম্মদ জাফর খানের ভ্রাতা মির দাউদের কাছে[৯] সেই বার্তা পৌঁছে দেন। মির দাউদ কয়েকজন লোকসহ নিজে এসে সিরাজকে বন্দী করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে মির মোহাম্মদ জাফর খানের পুত্র মির মোহাম্মদ সাদেক খান (মিরন) দ্রুতগতিতে সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন।[১০] নবাবকে একটি গরুর গাড়িতে চড়িয়ে সব ধরনের অবমাননাকর আচরণের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান এবং সেদিনই নবাবকে খতম করার জন্য মোহাম্মদী বেগকে আদেশ দেন।

কিন্তু সিরাজের দেহে ২০টি আঘাত করেও কাজ শেষ করতে না পেরে মোহাম্মদী বেগ[১১] তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন মোগলকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেন। সেই ব্যক্তি ছোরার এক আঘাতেই সিরাজের জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। তাঁর দেহ একটি হাতির পিঠে স্থাপন করে সীমাহীন অমর্যাদার সঙ্গে সমগ্র নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। সেই হাতি সিরাজের জননীর বাসভবনের সামনে এলে তিনি খালি পায়ে ও খালি মাথায় দৌড়ে এসে হাতির পায়ের কাছে নিজেকে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু খাদেম হোসেন খানের লোকজন তাঁকে বলপ্রয়োগ করে

---

৮. আম সরবরাহকারী দারোগার এই ঘটনার কথা অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে নেই, তবে সিরাজের মালদহ যাওয়ার কথা কোনো কোনো গ্রন্থে আছে।

৯. এই ফকিরের নাম ছিল শাহ দান বা দান শাহ। তাঁর আচরণের কাহিনি *সিয়ার*, *তারিখ*, *রিয়াজ* প্রভৃতি সমসাময়িক গ্রন্থেই আছে এবং সব বর্ণনা প্রায় একই ধরনের।

১০. *তারিখ*-এ মির জাফর-পুত্র মিরনের কথা নেই, আছে মির জাফরের জামাতা মির কাশিমের কথা। *রিয়াজ*-এও (*রিয়াজ-বা*, পৃ. ২৯১) মির কাশিমের কথাই আছে।
সিরাজের অন্তিমকালের কথা *সিয়ার*-এ (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে এবং সে ইতিহাস বড়ই করুণ।

১১. এই মোহাম্মদী বেগই প্রথম সিরাজ-উদ-দৌলার পিতার গৃহে, পরে আলিবর্দির বেগমের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিল এবং একজন অনাথা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল। অন্যরা সিরাজকে হত্যা করার কাজ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেও সে আগ্রহসহকারে তাতে সম্মত হয়েছিল (*সিয়ার-ই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২)।

সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। সিরাজের মৃতদেহ নিয়ে খাদেম হোসেন খানের বালাখানার সামনে উপস্থিত হলে তিনি নির্লজ্জের মতো মৃতদেহকে সমাহিত করার জন্য একখণ্ড বস্ত্র মৃতদেহের ওপর নিক্ষেপ করেন।[১২]

অবশেষে সিরাজের মৃতদেহ বাজারের চত্বরে নিক্ষেপ করা হলে কেউ তা দাফন করতে সম্মত হয়নি। এই পরিবারের ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে এবং নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে মির্জা জয়নুল আবেদিন বাকাওয়াল মৃতদেহকে গোসল করান। তারপর একটি কফিনে তা ভরে আলিবর্দির কবরের পাশে সমাধিস্থ করেন।[১৩] সিরাজের রাজত্বকাল ১৫ মাস স্থায়ী হয়েছিল।

মির মোহাম্মদ জাফর খান [নতুন] শাসনকর্তা হন এবং ইংরেজরা বাঙলায় তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে [সিরাজের] রাজ্য ও সম্পদ বিতরণ করার পর মির জাফর ও মিরন পরলোকগত নবাবের স্ত্রী ও রক্ষিতাদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। পিতা ও পুত্র (মির জাফর ও মিরন) উভয়েই প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার মহিয়সী স্ত্রী বেগম লুৎফ-উন-নিসার হস্ত কামনা করলে তিনি তা [ঘৃণাভরে] প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'আগে যে আমি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করেছি, সেই আমি এখন গর্দভের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হতে সম্মত হতে পারি না।'[১৪]

---

১২. এসব ঘটনার কথা অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থে আছে।

১৩. এ তথ্য অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে নেই। তবে এ ঘটনা সত্য হতে পারে।

১৪. এ তথ্যও অন্যত্র পাওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনাও সত্য হতে পারে। সিরাজের এই মহীয়সী স্ত্রী কোনো অভিজাত পরিবারের না হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বামীর প্রতি অনুরাগ ছিল অসাধারণ।

নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি

আজাদ-আল-হোসায়নি

অনুবাদকের ভূমিকা

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে স্যার যদুনাথ সরকার কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে *বেঙ্গল নওয়াবস* (*Bengal Nawabs*) গ্রন্থ প্রকাশের আগে এ সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেরই জানা ছিল। স্যার যদুনাথ এই গ্রন্থকার ও তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে যা বলেছেন, তার বাইরে আজও আমাদের বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। অতএব *বেঙ্গল নওয়াবস* গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি যা বলেছেন, তার বাংলা অনুবাদ নিচে তুলে ধরা হলো :

উপক্রমণিকা

'বাঙলার সুবিখ্যাত সুবাদার জাফর খান নাসিরি (জনসমাজে তিনি তাঁর প্রথম উপাধি মুর্শিদ কুলি খান নামে অধিক পরিচিত) ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জামাতা সুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান সাম্রাজ্যের সুবাদার হিসেবে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি (সুজা খান) দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান রুস্তম জং উপাধিতে ভূষিত তাঁর জামাতা মির্জা লুৎফ-উল্লাহকে বাঙলা সুবার পূর্বার্ধে তাঁর নায়েব নাজিম হিসেবে ঢাকায় প্রেরণ করেন। নতুন নায়েব নাজিম ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল ঈদের দিনে ঢাকায় আগমন করেন। পরের বছর ইরান থেকে আসা আজাদ-আল-হোসায়নি নামের একজন পণ্ডিত, অথচ দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর রচিত *নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি* শীর্ষক একখানা গ্রন্থ উপহার হিসেবে তাঁকে প্রদান করেন। গ্রন্থটিতে মূল্যবান উপদেশ, কিছু কাহিনি, তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রভূত প্রশংসা, সেই সঙ্গে গ্রন্থকারের অনাহারের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাহিত্য-অনুদানের প্রার্থনা ছিল।

'পাণ্ডুলিপিটি ছিল ক্ষুদ্র। তাতে ছিল ৬৫ পৃষ্ঠা। প্রতি পৃষ্ঠার আয়তন ছিল ৬.৫ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ছিল ২.৫ ইঞ্চি করে দীর্ঘ ৯ পঙ্‌ক্তি। স্পষ্টত এটিই ছিল গ্রন্থকারের স্বাক্ষরসমন্বিত আদি পাণ্ডুলিপি। এর আর কোনো প্রতিলিপি ছিল

বলে জানা যায়নি। এই পাণ্ডুলিপিটির দেশান্তরিত হওয়ার ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক রুস্তম জং ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে নায়েব নাজিম হিসেবে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত হন। ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু আলিবর্দি খান (নবাব) সুজা-উদ-দীন খানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী (নবাব) সরফরাজ খানকে (১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল) হত্যা করে বাঙলার নবাবি (মসনদ) অধিকার করলে রুস্তম জঙের স্ত্রী দুর্দানা বেগম ও তাঁর জামাতা মির্জা বাকেরের প্ররোচনায় অনধিকার প্রবেশকারীর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[১] বালেশ্বরের কাছে (১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ) যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রুস্তম জং তাঁর পরিবারের সমুদয় সদস্যসহ আগে থেকেই ব্যবস্থা করা একটি জাহাজে চড়ে মসলিপত্তমে পালিয়ে যান। উড়িষ্যা অধিকারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেও অকৃতকার্য হয়ে তিনি প্রথম নিজাম আল ফজাহর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

'এই নির্বাসিত বা পলাতক ব্যক্তিদের আগমন সম্পর্কে আসফ জাহর দরবারের ইতিহাসে (*হাদিকাত-উল-আলম*, ২,১৭৩) এই ধরনের বর্ণনা আছে: '১১৫৫ হিজরি (১৭৪২-৪৩ খ্রি.) সনে আসফ জাহ হায়দরাবাদে আগমন করেন... এবং কিছুদিন প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি পরিচালনার পর তিনি আওরঙ্গাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের জামাতা বাকের আলি খান...তাঁর সান্নিধ্য লাভের সম্মান লাভ করেন। কিছুদিন পর মুর্শিদ কুলি খান (দ্বিতীয়) নিজেই সেখানে উপস্থিত হন এবং নিজামের অনুগ্রহ লাভ করেন। বাঙালি বেগম নামে পরিচিত মুর্শিদ কুলি খানের বেগম ও সুজা-উদ-দৌলার কন্যা "মেহমান বেগম" উপাধিতে ভূষিত হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

'কালক্রমে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে পরিবারটি চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই পাণ্ডুলিপিসহ তাঁদের (সমুদয়) সম্পদ বিক্রয় হয়ে যায়। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বোরহানপুর ছিল ফারসি (ভাষার) চর্চা ও সুফি সাধন তত্ত্ব গবেষণার বিশেষ কেন্দ্র। খুব সম্ভব সেখানেই এই পাণ্ডুলিপিটি বিক্রয় হয়েছিল। পুনার জায়গিরদার পরাসনিস (Parasnis) এটি ক্রয় করেন। তিনি ছিলেন বংশানুক্রমে পেশোয়ার সচিব ও ফারসি পত্রালাপে অতিশয় দক্ষ। (১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে) পেশোয়াদের পতনের পর এই পাণ্ডুলিপিসহ ফারসি ভাষায় রচিত

---

১. নিরপেক্ষ বিচারে স্যার যদুনাথের এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য আলিবর্দিই তাঁর সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করেন এবং মুর্শিদ কুলি খান ও তাঁর জামাতা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করেন। কিন্তু আলিবর্দির চাতুর্যের কারণে তাঁদের দলে ভাঙনের পরিণতিতে মুর্শিদ কুলি খানেরা পরাজিত হন। সমসাময়িক সব ইতিহাস গ্রন্থে এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

অনেক উৎকৃষ্ট রচনা (ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও) জাগিরদার পরাসনিসের "পুনা হাউস" নামের গৃহে স্থান লাভ করে। পেশোয়াদের ফারসি-সচিব ও সংবাদ সরবরাহকারী হিসেবে এই সব দলিল তাঁদের বংশধরদের কাছে ১৩০ বছর ধরে অনাদরে ও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এগুলো বোম্বাই সরকার ৭০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করে। আমাদের অতীব সৌভাগ্য যে, সেই সব কাগজপত্রের মধ্যে ৪০টি উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপি ছিল। এই সংগ্রহ পরীক্ষা করে অভিমত দেওয়ার জন্য বোম্বাই সরকার আমন্ত্রণ জানালে বাঙলার ইতিহাস-সংক্রান্ত অতি অসাধারণ মূল্যবান এই ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করি।

'এই গ্রন্থে উল্লেখিত বাঙলার মোগল সুবাদারদের কিছু কিছু (ব্যক্তিগত) কাহিনি (anecdotes) নিচে প্রদত্ত হলো।'

নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি গ্রন্থের মূল্যায়ন

এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়ও অতিশয় সীমাবদ্ধ। এটিকে স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ বললেই বোধ হয় এর ওপর সুবিচার করা হবে। কারণ, কিছু কিছু স্থানীয় ঘটনার ইতিহাসই এই গ্রন্থে বেশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই সব স্থানীয় ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে এবং তা হচ্ছে নবাব সুজা-উদ-দীন খানের আমলে ত্রিপুরা বিজয়ের বিস্তারিত কাহিনি। এর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুলতানি আমলেই। কিন্তু মোগলদের ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে নতুন করে ত্রিপুরা রাজ্য জয় করতে হয়েছিল এবং সেই রাজ্যের উদয়পুর নামে অভিহিত সরকারে একজন মোগল ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়েছিল।

তবে সরকারিভাবে ত্রিপুরা মোগলদের করদ রাজ্য হলেও নবাব সুজা-উদ-দীনের সময় সেই রাজ্য আবারও কেন নতুন করে জয় করতে হয়েছিল, সেই ইতিহাস খুব পরিষ্কার নয়, যদিও সেই অভিযানের বিশদ বর্ণনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আছে। এই (বিশদ) বর্ণনার জন্যই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

তখন দিল্লির মোগলশক্তি অপরাহ্নের সূর্যের মতো অস্তমিত প্রায়। কিন্তু সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল বাঙলায় নবাবের শক্তি তখনো অটুট। নবাব সুজা-উদ-দীন খানের (১৭২৭-৩৯ খ্রি.) জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান রুস্তম জং তখন ঢাকার নায়েব নাজিম। তাঁর সেনাপতি ছিলেন মির হাবিব উল্লাহ খান নামের একজন ভাগ্যান্বেষী, অথচ অতি দক্ষ আফগান কর্মকর্তা। আগা বা আকা সাদেক

নামের একজন রইস মুসলমান তিনি। তখন বলদাখাল নামক এক বিরাট পরগনাসহ আরও কয়েকটি পরগনার তিনি জমিদার। এই আগা সাদেকের সহায়তায় ও মির হাবিবের সেনাপতিত্বে ত্রিপুরা রাজ্য নতুন করে বিজিত হয়। এই রাজ্যের নতুন নামকরণ করা হয় 'রওশনাবাদ', অর্থাৎ আলোকের দেশ। আগা সাদেককে সেই রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেই বছরই। এ ঘটনার বিবরণ প্রথম এই গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছিল। এই ঘটনার ৩৫ বছর পর (১৭৬৪ খ্রি.) মুনশি সলিম উল্লাহ রচিত *তারিখ-ই-বঙ্গালা* গ্রন্থে এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এ ছাড়া এই ঘটনার বর্ণনা অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে নেই।

প্রথম অধ্যায়

মির জুমলার[১] কঠোর বিচারের দৃষ্টান্ত (১৬৬০-৬২ খ্রি.)

মির জুমলা আলমগীরির ঢাকার খিজিরপুরে বসবাস করার সময় তাঁর একজন নফর এক নারী দধি বিক্রেতাকে তার গৃহে ডেকে এনে বিনা মূল্যে দধি নিয়ে অন্যান্য আহার্যের সঙ্গে তা ভক্ষণ করে। দধির মালিক এরপর অনতিবিলম্বে নবাবের কাছে অভিযোগ করে। নবাবের রীতি ছিল, নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর দুর্গে[২] বসে উঁচু-নিচুনির্বিশেষে সমুদয় নিরস্ত্র অভিযোগকারীর অভিযোগ তিনি

---

১. দিল্লির সিংহাসনের অধিকার নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের জীবিতকালেই তাঁর চার পুত্রের মধ্যে যে কলহ হয়, তাতে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ও বাঙলার সুবাদার (১৬৩৯-৬০ খ্রি.) সুলতান সুজা সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের (পরে সম্রাট আলমগীর) প্রধান সেনাপতি মির জুমলার কাছে পরাজিত হয়ে সপরিবারে আরাকানে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে পালিয়ে যান এবং এরপর তাঁর সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায়নি।

আওরঙ্গজেবের বিজয়ী সেনাপতি মির জুমলা ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন ঢাকা নগরে উপস্থিত হন। সম্রাট তাঁকে সাত হাজারি মনসবদারের পদে উন্নীত করে বাঙলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁর পদমর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে তাঁকে খান-ই-খানান ও সিপাহসালার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মে থেকে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর ধরে বাঙলার সুবাদার ছিলেন।

বাঙলার সুবাদার থাকার সময় মির জুমলা কোচবিহার ও আসাম অভিযানে যান এবং ওই দুটি রাজ্য অধিকার করেন। তাঁর সফল অভিযানকালেই ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। আসাম থেকে নৌকাযোগে তিনি ঢাকা আসার সময় খিজিরপুরের কাছে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ প্রাণত্যাগ করেন।

খুব সম্ভব বাঙলায় সুবাদার থাকাকালে মির জুমলা খিজিরপুর অঞ্চলে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন।

২. নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং বিবি মরিয়মের মসজিদ ও মাজার থেকে সামান্য উত্তরে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে হাজিগঞ্জ দুর্গ নামে মোগল

শ্রবণ করতেন এবং বিনা বাধায় তারা সেখানে এসে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারত।

[গোয়ালিনীর অভিযোগ শুনে] সুবাদার আসামিকে তলব করলে সে সেই অভিযোগ অস্বীকার করে। তাকে তখন বমন করার ওষুধ খেতে দেওয়া হলে বমির সঙ্গে দধি বের হয়ে আসে। নবাব তখন সেই আসামির পেট চেরার আদেশ দিয়ে বলেন, তার (মৃত) দেহ যেন খিজিরপুরের ময়দানে (ঝুলিয়ে) রাখা হয়, যাতে তা অন্যের জন্য সতর্কতার দৃষ্টান্ত হতে পারে। এই বিচারের দৃষ্টান্ত এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে, কেউ আর এক গাছি খড় চুরি করতেও সাহস পায়নি।

আমলের একটি দুর্গ আছে। মির্জা নাথান রচিত *বাহারিস্থান-ই-গায়েবি* গ্রন্থে খিজিরপুরের যে দুর্গের উল্লেখ আছে, খুব সম্ভব এটিই সেই দুর্গ। প্রায় আড়াই একর ভূমিতে পঞ্চকোনাকারে নির্মিত এই দুর্গ খুব সম্ভব মোগল আমলের প্রথম দিকেই নির্মিত হয়েছিল। এর কিয়দংশ অনধিকার প্রবেশকারীদের হাতে অধিকৃত হলেও বাকি দুর্গটি এখনো প্রায় অটুট অবস্থায় আছে। দুর্গের তিন দিকে ছিল সুগভীর ও সুপ্রশস্ত পরিখা এবং এক দিকে (পূর্ব-দক্ষিণ) ছিল লক্ষ্যা নদী। নদী এখন বেশ দূরে সরে গেছে। পরিখার অধিকাংশ ভূমি এখন অনধিকার প্রবেশকারীদের দখলে।

খুব সম্ভব আলোচ্য খিজিরপুর দুর্গই এই হাজিগঞ্জ দুর্গ। এ ছাড়া এই অঞ্চলে নদীর পশ্চিম তীরে আর কোনো দুর্গ বা কোনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলমগীর-তনয় মোহাম্মদ আজম শাহর[১] কাহিনি (১৬৭৮-৭৯ খ্রি.)

এই শাহজাদা জীবনযাত্রার ব্যাপারে অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। একদিন অশ্বারোহণে যাওয়ার সময় তিনি পথের পাশে একদল লোককে দেখতে পান। তারা তাদের নিজেদের মতো করে বিয়ের খুবই সাধারণ সাজসজ্জায় ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করেন, 'এই লোকগুলো কি আরও কিছু সাজসজ্জার ব্যবস্থা করতে পারে না?'

তাঁরা উত্তর দিলেন, 'অত্যন্ত দরিদ্র বলে তারা এর বেশি কিছু করতে পারেনি।'

---

১. সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্রের সংখ্যা ছিল পাঁচ। তাঁরা ছিলেন: ১. শাহজাদা মোহাম্মদ সুলতান, ২. শাহজাদা মোয়াজ্জম, ৩. শাহজাদা মোহাম্মদ আজম, ৪. শাহজাদা আকবর ও ৫. শাহজাদা কামবখশ। শাহজাদা সুলতানকে সম্রাট আওরঙ্গজেব গোয়ালিয়র দুর্গে সারা জীবনের জন্য বন্দী করেন সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধে তিনি তাঁর ভাবী শ্বশুর শাহ সুজাকে সমর্থন করার জন্য। সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগরে তাঁর মৃত্যুর সময় আওরঙ্গজেবের তিন পুত্র শাহজাদা মোয়াজ্জম, শাহজাদা আজম ও শাহজাদা কামবখশ জীবিত ছিলেন। শাহজাদা আজম খুবই যোগ্য হলেও অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর এই তিন ভাইয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, তাতে প্রথমে শাহজাদা আজম ও পরে শাহজাদা কামবখশ নিহত হন। শাহজাদা মোয়াজ্জম সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন এবং ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এই গ্রন্থের *মোজাফ্ফরনামা*র উপক্রমণিকাতে সম্রাট আলমগীরের উত্তরসূরিদের বংশলতিকা তুলে ধরা হয়েছে।

শাহজাদা বললেন, 'এই লোকগুলো দুঃখ করে বলবে, সম্রাটের পুত্র আমাদের বিয়ের আয়োজন দেখে গেলেন, অথচ আমরা তাঁর কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ পেলাম না।'

অতএব তিনি তাদের এক তোড়া অর্থ প্রদানের আদেশ দিলেন।

ভ্রমণকালে শাহজাদা হাতির পিঠে করে সোনালি ও রুপালি মাছে পূর্ণ পানিভর্তি কাঠের বাক্স নিয়ে যেতেন। গন্তব্যস্থলে অবতরণ করার পর তাঁর তাঁবুর সামনে সমতল বাগান সৃষ্টি করে তিনি সেখানে তাম্রনির্মিত জলাধার স্থাপন করতেন এবং সেগুলোকে জলপূর্ণ করে ফোয়ারা সৃষ্টি করার পর তিনি মাছগুলোকে স্বাধীনভাবে খেলা করার জন্য তাতে ছেড়ে দিতেন।

বাঙলায় সুবাদারি করার সময় তিনি এক বছর ঢাকায় অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি কতগুলো অধ্যাদেশ জারি করেন। সেগুলোর কার্যকারিতা এখন পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই রকম: প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় ঢাকা (রাস্তা) প্রচুর পরিমাণে কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ, ঘোড়া ও হাতির পক্ষে (রাস্তায়) চলাচল করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ত। আজম শাহ ইট বিছানো একটি রাস্তা তৈরি করার আদেশ দেন। তাঁর সময়ে রাস্তাটি এমন শক্তভাবে নির্মিত হয়েছিল যে, বর্ষাকালে অতি সহজেই মানুষ সেই রাস্তার ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারত। বাঙালিরা এর আগে কোনো পাকা সড়ক দেখেনি[২] বলে তারা এই সড়ক দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। (ঢাকাতে) পাকা সড়ক নির্মাণের এই ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। অনেক সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তি পাকা পথ তৈরি করে থাকেন।

ঢাকার বাদশাহি দুর্গের[৩] কাছে একটি ঝিল ছিল। লোকজন সেখানে ফাঁদ পেতে জলচর পাখি ধরত। দুর্গের ভেতরে রংমহল ও আমির-উল-উমারা শায়েস্তা খান নির্মিত 'চিহিল সিতান' কক্ষ ছাড়া জনগণের অভিযোগ শোনার অন্য কোনো

---

২. শাহজাদা আজমের (বাঙলার সুবাদার ১৭৭৮-৭৯ খ্রি.) আগে ঢাকাতে পাকা রাস্তা ছিল না, এমনকি এ দেশেও ছিল না—গ্রন্থকারের এই মন্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন। মোগল আমলের বহু আগে থেকেই এই দেশে বহু পাকা রাস্তা ছিল বলে দেখা যায়। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খানের সুবাদারের সময় তিনি ইসলামপুর রাস্তা নির্মাণ করেন। অন্য সড়কের কথা বাদ দিলেও অন্তত এই সড়কটি পাকা ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

৩. বর্তমানে (১৯৯৮ খ্রি.) যেখানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত, সেখানেই ছিল বাদশাহি দুর্গ। এখানেই নবাব শায়েস্তা খানসহ ঢাকার সুবাদারগণ বাস করতেন। লালবাগ দুর্গ নির্মিত হলেও সেখানে সুবাদারগণ বাস করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার বর্ণিত ঝিলের স্থান নির্ণয় করা খুবই দুষ্কর। ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানার ক্রমাগত সংস্কার ও পরিবর্ধনের ফলে এই ঝিল যে কোথায় ছিল, তা বলা কঠিন। তবে এটি জেলখানার উত্তরাংশে ছিল বলে মনে হয়।

কক্ষ ছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আজম শাহ সেই ঝিলটিকে ভরাট করে ফেলেন। জনগণের অভিযোগ শোনার জন্য সেই জায়গায় বিশাল মেঝের আয়তনসহ চার দেয়ালবিশিষ্ট একটি কক্ষ ও বাদ্যযন্ত্রের জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ করেন। এসব ইমারত কালক্রমে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান সেগুলোর সংস্কার করেন।

ঢাকার চক (বাজার চত্বর) আজম শাহর সময় নির্মিত হয়নি। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান এখন (১৭২৯ খ্রি.) চকবাজারকে এমন সৌন্দর্যশালী করে তুলেছেন যে, তা দেখলে হৃদয়ে আনন্দ হয়। আজম শাহ ঢাকা থেকে নগর শুল্ক তুলে দিয়ে নগরে পণ্যের মূল্য অনেক সস্তা করার পথ সুগম করে দেন। পান ও তামাকের মূল্য ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তিনি সেগুলোর মূল্য কমিয়ে দেন। সেই মূল্য এখনো বহাল আছে। খাদ্যশস্যের মূল্য এত কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এক জিতলের[৪] অষ্টমাংশ দিয়ে পাকা এক সের চাল ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা যেত। কিন্তু কালক্রমে ও শাসনকর্তার পরিবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মুর্শিদ কুলি খান এখন মূল্য কমিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক স্যার যদুনাথের পাদটীকা :
'Our author a recent emigre from Persia, has clearly made a mistake about the Indian currency. As 25 *Jitals* make one *dam* and 40 dams a rupee. His words would give 200 maunds of paddy for a rupee an incredible statement. I read *dam*, for *jital* in the text, which would give eight maunds to the rupee, an admitted rate at Dacca in Shaista Khan's time i.e. 1680-88.'

তৃতীয় অধ্যায়

চট্টগ্রাম ফাঁড়ি পুনরাধিকৃত[1]

অসংখ্য জাহাজযোগে আরাকানিদের আক্রমণের ফলে মোহাম্মদ বাকেরের[2] শাসনামলে ইসলামাবাদ থানা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়। কয়েক হাজার

---

১. ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খানের আমলে আরাকানি ও পর্তুগিজদের হাত থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের পর মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত এই স্থান তাদের অধিকারের বাইরে চলে গিয়েছিল, এমন কোনো উল্লেখ সমসাময়িক ইতিহাসে আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে আলোচ্য গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ দেখে মনে হয় যে অত্যন্ত সাময়িকভাবে হলেও এমন একটি ঘটনা হয়তো ঘটেছিল।

২. সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলায় অন্তত তিনজন আগা, আকা বা মির্জা বাকেরের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে *জ্যেষ্ঠ* ছিলেন পুরোনো কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার অন্তর্গত থোল্লার জমিদার আগা বাকের। এই স্থানের পোশাকি নাম বাকেরনগর। খুব সম্ভব কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার অন্তর্গত ও গ্যাসক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত বাখরাবাদ (বাকেরাবাদ) নাম তাঁরই নামানুসারে রাখা হয়েছে। *ত্রিপুরা জেলার গেজেটিয়ার* (১৯১০) রচয়িতা মি. ওয়েবস্টার ওই গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আগা সাদেকের (পরে আগা সাদেক সম্পর্কে পাদটীকা দ্র.) পারিবারিক সূত্রে জেনেছিলেন যে, আগা বা আকা সাদেক আগা বাকেরের পৌত্র বা প্রপৌত্র ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহ *রাজমালা* গ্রন্থে অবশ্য আগা বাকের ও আগা সাদেকের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের কথাই বলেছেন। এখন প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, আগা সাদেক এই বাকেরের প্রপৌত্র ছিলেন এবং তাঁদের বংশলতিকা নিম্নরূপ :

আগা বাকের কেলান
পুত্র (নাম পাওয়া যায়নি)
আহসান উল্লাহ খান (হুগলীর ফৌজদার)
আগা সাদেক (বলদাখাল ও অন্যান্য পরগনার জমিদার)
১. মির্জা ইবরাহিম বেগ (মির্জা ভেলা), ২. মির্জা আবুল হোসেন, ৩. মির্জা মো. (আগানবী)

ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে তারা ফিরিঙ্গি রাজ্যে বিক্রি করে। মুর্শিদ কুলি খান কী করে ইসলামাবাদ পুনরায় অধিকার করেন, সেই বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো :

দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান মোহাম্মদ সাদেকসহ মির মোহাম্মদ হাদিকে থানা রক্ষার জন্য একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। বন্যা হওয়ার সময়, অর্থাৎ বর্ষাকালেই শত্রুরা সাধারণত আক্রমণ করত। সেই সময় তিনি জুলফিকার খান, মোহাম্মদ হাশিম ও (জান মোহাম্মদের পুত্র) তরুণ সিরাজ-উদ-দীনসহ মির হাবিব উল্লাহকে সেখানে প্রেরণ করেন। উল্লেখিত থানার (চট্টগ্রাম) পেছনের ঘাঁটি ফেনী থানাকে রক্ষা করার জন্য তিনি (মুর্শিদ কুলি খান) মির সৈয়দ আলিকে সেখানে প্রেরণ করেন। লোকেরা বলে যে, এত বড় সৈন্যদল সেখানে কেউ দেখেনি। চট্টগ্রাম পৌঁছে সেনাপতি দৃঢ়তার সাথে থানা অধিকার করেন। শত্রুপক্ষ এতে ভয় পেয়ে তাদের নিজ ভূমিতে লুকিয়ে থাকে। নবাবের বিজ্ঞ কার্যাবলি আল্লাহর বান্দাদের রক্ষা করে।

দ্বিতীয় আগা বাকের হচ্ছেন নবাবি আমলের বুজুর্গ-উমেদপুরের বিখ্যাত জমিদার এবং তাঁর নামেই পরবর্তীকালে বাখরগঞ্জ (বাকেরগঞ্জ) থানা ও জেলার (বর্তমান বরিশাল) নামকরণ করা হয়েছিল। তাঁর পুত্রই ছিলেন কুখ্যাত আগা সাদেক। পিতা ও পুত্র মিলে ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ঢাকার কিল্লাদার নিরপরাধ আহসান-উদ-দীন খানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। দুই দিন পর ঢাকার অধিবাসীরা এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ঢাকা দুর্গ অবরোধ করলে আগা সাদেক দরবেশের পোশাক পরে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। ক্রুদ্ধ জনতা তাঁকে না পেয়ে তাঁর বৃদ্ধ পিতা আগা বাকের ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিরজাইকে হত্যা করে। আগা সাদেককে পরে নবাব মির জাফরের রাজত্বকালে নবাবের আদেশে হত্যা করা হয়। এই আগা বাকেরের আরেক পুত্র ছিলেন আগা মেহদি। তিনি পরে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। আগা বাকেরের একমাত্র কন্যা কাতিসা বেগমের বংশধরেরা এখনো বরিশালের চাখার মজুমদার পরিবারে আছেন। আগা সাদেকের পুত্র আগা সালেহ ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের আগেই মারা যান। এই নামের তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন মির্জা বাকের খান। তিনি ছিলেন ইরানের সাফাভি রাজবংশের একজন অধস্তন পুরুষ। তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। উড়িষ্যার স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি আলিবর্দির বিরুদ্ধে দুবার যুদ্ধ করে পরাজিত হন এবং হায়দরাবাদের নিজামের দরবারে আশ্রয় নিয়ে শেষ জীবন অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটান।

গ্রন্থে উল্লেখিত বাকের ছিলেন খুব সম্ভব দ্বিতীয় আগা বাকের। তিনি একসময় চট্টগ্রামের ফৌজদার ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি খুব সম্ভব ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে চট্টগ্রামের ফৌজদার ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের ত্রিপুরা বিজয়[১]

অসংখ্য বৃক্ষ, উঁচু পর্বত ও দূরতিক্রম্য পথের কারণে ত্রিপুরা শক্তিশালী রাজ্য। তাঁর শক্তির জন্য [ত্রিপুরার] অধিপতি খুবই গর্বিত। সেখানে শাঁখ বাজানো ও প্রতিমা পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। সুলতান সুজা তাঁর সুবাদারিকালে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়েন-উদ-দীন মোহাম্মদকে রাজমহলে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে ঢাকায় আগমন করেন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী জান বেগ খানকে প্রেরণ করেন ত্রিপুরা অভিমুখে।[২] কিন্তু এক বছর পরিশ্রম করেও জান বেগের লোকেরা ত্রিপুরার

---

১. আলোচ্য গ্রন্থের এই বর্ণনাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং এই সম্বন্ধে এত বিস্তারিত বর্ণনা আর কোথাও নেই। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *রাজমালা*তে এই ঘটনা ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে আমরাও (*কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৪৬) গ্রন্থে সেই তারিখই দিয়েছিলাম। কিন্তু গ্রন্থকার এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই ঘটনা ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে ঘটেছিল এবং তা-ই ঠিক। গ্রন্থকার কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে এই ঘটনার পরপরই। অতএব এই ঘটনা ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ঘটতে পারে না।

২. বাঙলার সুবাদার (১৬৩৯-৬০ খ্রি.) শাহ সুজাও ত্রিপুরা অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য অসমর্থিত ও অনির্ভরযোগ্য কোনো কোনো বর্ণনায় এ ধরনের মন্তব্য দেখা যায়। শাহ সুজার সময়ে কাছাড় অভিযান ও বিজয়ের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরা অভিযানের বর্ণনায় নেই।

১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার, সেই রাজ্যকে উদয়পুর সরকার নামে অভিহিত করা এবং উদয়পুরে নুর উল্লাহ বেগকে ফৌজদার নিযুক্ত করার পর সেই রাজ্যে মোগল অধিকারে ছেদ পড়েনি। তখন থেকেই সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য উদয়পুর সরকার নামে পরিচিত ছিল (গ্রন্থকার রচিত *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১৩৮-৪৯ দ্র.)। অবশ্য ১৬২৫-২৬

কোনো দুর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে মির্জাপুর[৩] জেলা অধিকার এবং সেই স্থানকে সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশ করেই তিনি (প্রধানমন্ত্রী) তৃপ্তি লাভ করেন। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য তাঁর অনেক সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে। এই ঘটনার কথা জানানো হলে সুলতান সুজা এই অভিযান বন্ধ করে দেন। অতএব মির জুমলা ও শায়েস্তা খানের মতো মহান আমিরও ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করার আশা মনে স্থান দেননি। ইবরাহিম খান সেই রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেও সন্ধি করার পর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার এবং সেখানে প্রতিমা পূজা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪] চট্টগ্রাম অভিযানে নিয়োজিত (তাঁর প্রধান

খ্রিষ্টাব্দের দিকে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য মোগল ফৌজদার সেনাবাহিনীসহ মেহেরকুলে চলে আসেন এবং এ সম্পর্কে *রাজমালা* কাব্যে আছে (*রাজমালা*, ৩য় নম্বর, পৃ. ৭০) :

'দৈবের বিচিত্রগতি বুঝান না যায়।
সেইকালে দৈব চক্র হইল উপায় ॥
উদয়পুর রাজ্যে যত মগলের সেনা।
দিনে দিনে মরে সৈন্য নাহিক গণনা ॥
সেই কালে মগল সৈন্য চিন্তয়ে বিস্তর।
কি মতে বাঁচিবে প্রাণে যাইয়া স্থানান্তর ॥
উদয়পুর ছাড়িয়া মগল গেল সেইক্ষণ।
মেহার কুলেতে যাইয়া রহে সর্বজন ॥

৩. মির্জাপুর কোথায় তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। খুব সম্ভব এই স্থান ছিল বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানার কিছু পূর্বে এবং উদয়পুরের উত্তর-পশ্চিমে। কসবার কিছু পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে মির্জাপুর বলে একটি গ্রাম এখনো আছে। সেটিই যে আলোচ্য মির্জাপুর ছিল অনুসন্ধানে তা জানা গেছে।

৪. এই সম্পর্কে *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, HB II, Dacca University, P. 426-তে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আছে এবং তা নিম্নরূপ :

'Mir Habib also led an incursion into the Kingdom of Tipperah in alliance with Aga Sadiq, Zamindar of Patapsar. Fortunately for himself he was also able to secure the friendship of the discontent nephew of the Rajah of Tipperah, who had been expelled by his uncle outside the Kingdom. Prompted by feelings of revenge, the youth guided Mr. Habib's troops by the proper route...'

এই যুদ্ধ সম্পর্কে গ্রন্থকার রচিত *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস* (পৃ. ১৪৬-৪৭)-এ বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তা নিম্নরূপ : 'নবাবের অনুমতিক্রমে, জমিদার আগা সাদেকের সহায়তায় ও পরলোকগত মহারাজা ছত্রমাণিক্যের (নক্ষত্র রায়) প্রপৌত্র জগৎ রায় বা জগৎ রায় ঠাকুরের প্ররোচনায় মির হাবিব এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করে রাজধানী উদয়পুর অধিকার করলে মহারাজ ধর্ম মাণিক্য পলায়ন করেন। মির হাবিব ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে এর নাম রাখেন 'রওশনবাদ' বা আলোকের দেশ।...

সেনাপতি) সৈয়দ হাবিব উল্লাহ, মোহাম্মদ সাদেক, মির হাকিম শেখ সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ ও মেহদি বেগকে তিনি এই মর্মে পত্র লেখেন যে, এখন বর্ষাকাল শেষ হওয়ায় তাঁরা যেন তাঁদের সেনাবাহিনীসহ সাবধানে ত্রিপুরা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং সেই রাজ্য অধিকার করে নেন।

সৈয়দ ফতেহ রফিক, শেখ মোবারক মুহি-উদ-দীন, ওয়ালি বেগ ও অন্যান্য বীরপুরুষসহ জান মোহাম্মদ খানকে ঢাকা থেকে ত্রিপুরা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। পরে সৈন্য ও সামরিক সরবরাহ নিয়ে সেই কুকি রাজ্যের সীমানায় অগ্রসর হওয়া ও জয়ন্তিয়ার কাছে অগ্রসর হয়ে সেই পথ দিয়ে যাতে সেই সব কৌমের কোনো সাহায্য ত্রিপুরার জমিদারের কাছে পৌঁছাতে না পারে, সে জন্য জোয়ান মর্দান আলি খানকে নিয়োগ করা হয়। পরে তিনি শেখ আজিজ উল্লাহকে প্রেরণ করেন...(পাঠে ভুল থাকার কারণে ইংরেজি অনুবাদ নেই)।

নবাবের পত্র পাঠের পর প্রধান সেনাপতি [মির হাবিব উল্লাহ] বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ত্রিপুরা অভিমুখে অগ্রসর হন। দিনের পর দিন অগ্রসর হয়ে তিনি শত্রুসৈন্যপূর্ণ একটি গ্রামের কাছে এসে উপস্থিত হন। গাছপালা কেটে তিনি সেখানে যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাথর কাটার অভিজ্ঞ শ্রমিক, সূত্রধর, সুড়ঙ্গ প্রস্তুতকারীর দল, কামান বসানোর লোক, অগ্নিসংযোগের কাজে অভিজ্ঞ লোক, পানি বহনকারী, (গৃহ) নির্মাণকারী ও ঘাট পারাপারকারী শ্রমিক, চিকিৎসক, নাপিত, দর্জি প্রভৃতিসহ একদল দক্ষ কর্মী এবং খাদ্যদ্রব্য, ভেড়া, ছাগল, ঘি, ময়দার তৈরি রুটি, পনির ইত্যাদি নিয়ে নবাবের আদেশে ঢাকার কোতোয়াল শেখ মুহিব উল্লাহ সেখানে আগমন করেন। এই সরবরাহ সৈন্যদের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

মাস্কেট বন্দুক, বন্দুক, ক্ষেপণাস্ত্র, গোলন্দাজ বাহিনীসহ মোহাম্মদ সাদেক একটি পথের সন্ধানে অগ্রসর হন। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর প্রধান বাহিনী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আসলে তিনি কোথায় যাচ্ছেন, তা জানতে পারেননি। অসংখ্য পাহাড়ের টিলা ও নিচু ভূমির (hollows) অস্তিত্বের কারণে অশ্বারোহণে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন ছিল। আমাদের সৈন্যরা পদব্রজে গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ২০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে তারা এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হয়, যেখানে পথচলা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সেখানে তারা

'আগা সাদেক এই রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত হলেন এবং জগৎ রায়কে জগৎ মাণিক্য উপাধিতে ভূষিত করে রাজ্যের সিংহাসনে বসালেন...। 'দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য নবাব সুজা-উদ-দীনের দরবারে সমুদয় অবস্থা বর্ণনা করে আবেদন পেশ করলে নবাব জগৎ মাণিক্যকে পদচ্যুত করে ধর্ম মাণিক্যকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন।'

কয়েকটি ভগ্ন গৃহাদি দেখতে পায়। অনুসন্ধান করার পর তারা সেখানে কিছু চালও পায়। পানি ও ভোজ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ায় সৈন্যদের সেখানে গাছের পাতা খেয়ে বাঁচতে হয়। দ্রুতগামী পত্রবাহকের মাধ্যমে তাদের অবস্থা এবং তারা যে কঠিন পরিস্থিতি ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি, মোহাম্মদ সাদেক তা জানিয়ে দেন। মির হাবিব সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা ও রন্ধন করা আহার্য দ্রব্য ও চামড়ার থলেভর্তি পানি তাদের কাছে পাঠান।

এই সব খাদ্যদ্রব্য সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে মোহাম্মদ সাদেক তাদের উৎসাহিত করেন। তিনি অগ্রসর হয়ে নিচু ভূমির পেছনে একটি টিলা দেখতে পান। সেখানে ত্রিপুরার সৈন্যরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। নবাবের সৈন্যদের প্রতি তারা গুলি বর্ষণ করতে শুরু করে। আচ্ছাদনবিশিষ্ট একটি পরিখা খননের জন্য মোহাম্মদ সাদেক তাঁর সুড়ঙ্গ নির্মাণকারী বাহিনীকে (sappers) আদেশ দেন। এর সাহায্যে তিনি [শত্রুদের] দুর্গপ্রাকারের পাদদেশে এসে উপস্থিত হন এবং দড়ির সঙ্গে লোহার আংটা পরিয়ে দুর্গের ভেতরে নিক্ষেপ করেন। সেই সব আংটা ওজনের কারণে গাছের সঙ্গে আটকে গেলে দড়ি ধরে মোহাম্মদ সাদেক ও তাঁর সৈন্যরা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ত্রিপুরার সৈন্যদের হত্যা করে দুর্গ অধিকার করেন। যুদ্ধে আমাদের কিছু সৈন্য নিহত হয় এবং করিম বেগ অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। সাদেক সেখানে তাঁর শিবির স্থাপন করেন এবং দুর্গের অধিকার গ্রহণ করার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। নবাবের জন্য এটিই ছিল প্রথম বিজয়। মির হাবিব সেখানে আসেন এবং বিজয়ের সংবাদ তাঁর প্রভুর কাছে প্রেরণ করেন।

মির হাবিবকে সেখানে রেখে মোহাম্মদ সাদেক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। হঠাৎ একজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাকে ধরে মোহাম্মদ সাদেক অনেক প্রশ্ন করেন। সেই লোকটি জানায় যে, অরণ্যাঞ্চল দিয়ে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি দুর্গ পাওয়া যাবে। সেই দুর্গ ত্রিপুরার ঘাঁটি। সেখানে অনেক অস্ত্রশস্ত্র মজুত আছে। সেই লোকটিকে আশ্বস্ত করে মোহাম্মদ সাদেক তাঁকে পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেন। তাঁর নির্দেশমতো অরণ্য পথ অতিক্রম করে দুর্গের কাছে এসে তিনি তাঁবু গাড়েন। এক রাতের মধ্যেই সুদৃঢ় পরিখা ও উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করা হয়।

পরদিন প্রভাতে তিনি দুর্গ আক্রমণ করেন। প্রথমে উভয় পক্ষ প্রচুর গুলি ও ক্ষেপণাস্ত্র বিনিময় করে। এই অবস্থায় ত্রিপুরার সৈন্যরা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যুদ্ধ করা থেকে পিছিয়ে থাকেনি। মোহাম্মদ সাদেক তাঁর পরিখার আশ্রয় থেকে বের হয়ে আসেন। আমাদের বীরেরা এই সুদৃঢ় ঘাঁটির প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। একদল হরিণের ওপর বাঘের আক্রমণের মতো দুর্গটির ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে তারা। দুর্গ রক্ষাকারীরা ব্যূহ সৃষ্টি করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তারা নিহত হয়।

মোহাম্মদ সাদেক দুর্গের বিধ্বস্ত অংশগুলো সংস্কার করে সৈয়দ হাবিব উল্লাহর কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁর ঘাঁটিতে একজন প্রতিনিধি রেখে একে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করার আদেশ দিয়ে সৈয়দ হাবিব উল্লাহ মোহাম্মদ সাদেকের সঙ্গে যোগদান করেন। একটি মন্ত্রণাসভা বসার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পেছন থেকে প্রেরিত নবাবের সৈন্যরা মির্জাপুরে আগমন করবে। সেখানকার নায়েব ফৌজদার হাজি মোহাম্মদ তকির সেনাবাহিনী, সেই সঙ্গে কুকি ও জয়ন্তিয়ার উপজাতিদের প্রতিহত করার কাজে নিযুক্ত জোয়ান মর্দান আলি খানকেও শক্তিশালী করার জন্য সেই সব সৈন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আসার পরই সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যাবে।

সুতরাং জান মোহাম্মদ খান অসংখ্য সৈন্য নিয়ে সদর রাস্তা ধরে শত্রুর দুর্গগুলোর সম্মুখে উপস্থিত হন। জোয়ান মর্দান আলি খান তাঁর সেনাদলসহ মৃত্যুবায়ুর মতো অগ্রসর হয়ে মির হাবিব উল্লাহ যেখানে অবস্থান করছিলেন, সেখানে তাঁরা আসেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কুকি ও জয়ন্তিয়া সীমান্তে চলে যান এবং আলেকজান্ডারের প্রাচীরের মতো সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই জান মোহাম্মদ খান দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধেও বীরত্ব প্রদর্শন করে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

জান মোহাম্মদ খান ও তাঁর সেনাবাহিনীর মির্জাপুরে আগমনের সংবাদ পাওয়া গেলে [মির হাবিবের ঘাঁটির] সৈন্যদের মনে [পশ্চাদ্দেশের অবস্থা সম্বন্ধে] স্বস্তি আসে এবং অন্য সৈন্যদলের হাতে তাঁদের ঘাঁটি রক্ষার ভার দিয়ে তাঁরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কোনো সময়ে অশ্বারোহণে এবং অন্য সময়ে পদব্রজে তাঁরা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। তরুরাজি ও পর্বতের আধিক্যের কারণে তাঁরা যে কষ্ট ভোগ করেন, কলম তা প্রকাশে অক্ষম। ১৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে তাঁরা একটি নদীর তীরে উপস্থিত হন। নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন করে, বন্দুক-কামান স্থাপন করে সেখানে তাঁরা কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর মির হাবিব উল্লাহ, মোহাম্মদ সাদেক ও অন্যান্য বীর নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁদের বীরত্ব দেখে তাঁদের সৈন্যরাও তাঁদের অনুসরণ করে নদী অতিক্রম করেন। নদীর অপর তীরে উপস্থিত হয়ে তাঁরা সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পানিতে (অর্থাৎ নদী অতিক্রম করার সময়) সৈন্যদের যে অপরিসীম কষ্ট হয়েছিল, কলম তা প্রকাশে অক্ষম। তাঁরা তখন নদীর [অপর] তীরে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতির রাজধানী ছিল উদয়পুরে। সমুদয় যুদ্ধোপকরণসহ মুসলিম বাহিনীর নদী অতিক্রম

ও নদীর তীরে শিবির স্থাপনের সংবাদ পেয়ে উদয়পুর দুর্গের অধিবাসীরা হতাশ পয়ে পড়েন। তাঁদের অনেকেই পালিয়ে যান। রাজা তাঁদের ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করলেও সবই বিফলে যায়।

ইতিমধ্যে জান মোহাম্মদ খানের অধীন সেনাবাহিনী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর সর্ববৃহৎ ঘাঁটি চণ্ডীগড় দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কামান ও বন্দুকের সাহায্যে দুর্গ আক্রমণ করে। দুর্গবাসীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করতে থাকে, কিন্তু তাদের সেনাপতি আমাদের সৈন্যদের হাতে নিহত হন। তাঁর মস্তক ঢাকায় প্রেরণ করা হলে নবাব তা চকবাজার তোরণে ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দেন। তাদের সেনাপতির অবস্থার কথা শুনে দুর্গবাসীরা হতাশ হয়ে দুর্গ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে চণ্ডীগড় দুর্গ অধিকৃত হলে ত্রিপুরার সৈন্যরা ভয়ে আরও দুটি দুর্গ পরিত্যাগ করে গাজিগড় নামের দুর্গে আস্তানা গাড়ে। জান মোহাম্মদ খান ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলে [একদিন] সৈয়দ হাবিব উল্লাহ, মোহাম্মদ সাদেক, মোহাম্মদ হাকিম ও সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ তাঁদের গোলন্দাজ বাহিনী সম্মুখে রেখে অন্যান্য বীরের সঙ্গে অশ্বারোহণে উদয়পুর নগরে প্রবেশ করেন এবং দুর্গের মধ্যে অবস্থিত প্রশাসকের আবাসস্থল লক্ষ্য করে সব রকমের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গোলাবর্ষণ করতে থাকেন।

মৃত্যুকে পরোয়া না করে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে থাকে। মুসলিম বাহিনী চারদিক থেকে দুর্গ আক্রমণ করলে সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। জমিদারের [রাজার] সৈন্যদের মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়ে থাকে। বিজয়ীরা দুর্গে প্রবেশ করে। সেখানকার জমিদার ধর্মমাণিক্য আতঙ্কিত হয়ে তাঁর নারীদের পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য পলায়ন করেন। তাঁর পিছু ধাওয়া করে মাঝপথে তাঁকে ধরে ফেলা হয় এবং মির হাবিব উল্লাহর কাছে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় জান মোহাম্মদ খান ও তাঁর সঙ্গীরাও সেখানে উপস্থিত হন। এই সব ঘটনার কথা শুনে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী চণ্ডীগড় পরিত্যাগ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উদয়পুর দুর্গচূড়ায় মুর্শিদ কুলি খানের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়। মুসলিম বাহিনী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকে। সেই সঙ্গে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের বাণী [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ] উচ্চারণ করতে করতে জমিদারের বহুকালের পুরোনো মূর্তি সজ্জিত মন্দিরটি ধ্বংস করে ফেলে। মন্দিরের পাশে একটি সমতল আঙিনা স্থাপন করে তারা সেখানে সম্রাটের নামে খুতবা পাঠ করে। যুগের খলিফার নামে সেখানকার টাঁকশাল থেকে তারা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত দিনার ও দিরহামের প্রচলন করে। বিশ্ব উজ্জ্বলকারী মোহাম্মদীয় ধর্মের সূর্যপ্রতিমা পূজার অন্ধকারকে দূরীভূত করে এবং ইসলামের উজ্জ্বল প্রভাতের সূচনা হয়।

এই বিজয়ের সংবাদপ্রাপ্তির পর নবাব তাঁর প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ ইসহাককে ত্রিপুরাতে প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে মির হাবিব উল্লাহ ও অন্যান্য বীরকে তিনি অভিনন্দন জানান। এই স্থানটিকে মোহাম্মদ সাদেক ও মোহাম্মদ মেহদির অধীনে রেখে সেখানকার জমিদারকে (রাজা) সসম্মানে ঢাকায় আনয়ন করার জন্য তিনি মির হাবিবকে নির্দেশ দেন। মোহাম্মদ ইসহাক ও দণ্ড বহনকারী আতা বেগ ত্রিপুরা গিয়ে বীরদের কাছে নবাবের অভিনন্দন পৌঁছে দেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

সম্রাটের রাজত্বের একাদশ বর্ষে [১১৪১ হিজরি, ১৮ এপ্রিল ১৭২৯ খ্রি.] ত্রিপুরার জমিদারকে [রাজা] সঙ্গে করে মির হাবিব উল্লাহ নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সরদুবরাজ[৫] জমিদার [ত্রিপুরার শেষ রাজার পুত্র] জোয়ান মর্দান আলি খানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনিও (জোয়ান মর্দান) নবাবের প্রাসাদের চৌকাঠ (threshold) চুম্বন করার গৌরব লাভ করেন। এই বিজয়ের কারণে নবাব দ্বিগুণ উৎসাহে ঈদ পালন করেন এবং দরিদ্রদের ১ হাজার টাকা বিতরণ করার জন্য মির সাঈদ আলি ও মির মোহাম্মদ জামানকে আদেশ দেন। ঈদের দিন কিলা থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত এক ক্রোশ পথে প্রচুর মুদ্রা বিতরণ করা হয় (১৯ এপ্রিল ১৭২৯ খ্রি)। ত্রিপুরার জমিদারকে ঢাকা দুর্গে অন্তরীণ করে রাখার জন্য নবাব মহানুভবতার সঙ্গে নিজেই আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য আহার্য ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেন। তিবুরা মফতুহ (طبره مفتوه, ১১৪১ হিজরি, ১৭২৯ খ্রি.) শব্দ দ্বারা এই বিজয়ের তারিখ নির্ণয় করা হয়।

পাতপসারের জমিদার আগা সাদেকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তিনি ত্রিপুরা অভিযানে অগ্রসর হন।...ত্রিপুরার সাবেক রাজার পুত্রকে তাঁর পিতৃব্য তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কার করলে তিনি আগা সাদেকের সঙ্গে যোগদান করেন এবং মির হাবিব সেই জমিদারি লাভ করার আশ্বাস তাঁকে প্রদান করেন। তিনি গিরিপথ ও অতিক্রমসাধ্য নদীর ওপর দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হন। প্রতিরোধের ব্যাপারে নিজেকে অসমর্থ মনে করে রাজা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে মির হাবিবকে শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য অধিকার করার সুযোগ করে দেন। মির হাবিব রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে অর্পণ করেন জমিদারি পরিচালনার ভার। আগা সাদেককে রাজ্যের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। এরপর প্রচুর ধন-দৌলত, লুণ্ঠিত দ্রব্য ও

---

৫. গ্রন্থকার ত্রিপুরার এই রাজকুমারের ভুল নাম দিয়েছেন। প্রামাণ্য ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তাঁর নাম ছিল জগৎ রায় বা জগৎ রায় ঠাকুর। তিনি ছিলেন নক্ষত্র রায়ের বংশধর। সরদুবরাজ নাম অন্য কোথাও দেখা যায় না।

বহুসংখ্যক হস্তী নিয়ে জাহাঙ্গীরনগরে প্রত্যাবর্তন করেন।...সুজা খান ত্রিপুরা রাজ্যকে 'রওশনাবাদ' বা 'আলোকের নগর' বলে অভিহিত করেন।[৬]

(গোলাম হোসেন সলিম রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের ২৯৯-৩০১ পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাই তুলে ধরা হয় এবং 'ত্রিপুরার রাজাদের বাসস্থান চণ্ডীগড় দুর্গ যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত হয়েছিল'—শুধু এই কথাগুলো তিনি সংযোজন করেন।)

---

৬. উল্লিখিত ত্রিপুরা অভিযানের এই বর্ণনা অভিযানের বছর ১৭২৯ সালেই আজাদ-আল-হোসায়নি প্রদত্ত বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি তা ঢাকাতে বসেই রচনা করেন। এর ৩৪ বছর পর গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের অনুরোধ ও অনুপ্রেরণায় রচিত মুনশি সলিমউল্লাহর *তারিখ-ই-বঙ্গালা* গ্রন্থে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। ওই গ্রন্থের মূল ফারসি পাঠ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

اقا صادق زبات پسارا که بفنون و تدابیر همتای او بود رفیق خود ساخته در مهم تپره تعین (کرد) برادرزا ده راجه تپره که عمش اخراج کرده بود، و از ملك اواره شده، بسر حد ملك بادشاهی سیده قابوی وقت می جست، رفاقت اقامذ کور غنیمت دانسته با او پیوست–میر حبیب اورا امیدوار زمینداری تپرهکرده، فوجی همراه او داده راهبر ساخت–وبرهنمائی او از راه (ها) و گذهای کوه و دره و بندهای اب گذشته، لشکر در ملك تپره کشید–راجه انجا که از در امد فوج بادشاهی غافل و بیخبر بود، تاب جنك نیاوردة بالای حصار کوه گرخت–و ملك در تصرف میر حبیب امدو بجنب و بجنگ وجدل بسیار و ترد دیشمار قلعه چندی گدهه و جنتیه که مسکن راجه و حصن حصین بود، مفتوح شد–و غنیمت بسیار بدست امد و تپره داخل ممالك محرو سه گشت–

میر حبیب بندوبست ان ملك کرد، تمانجات محلم نشانده و اقا صادق را بفوجداری و برادر زاده راجه را که رفقتش گرده بود، براجگی مقرر ساخت–

অনুবাদ : পাতসাগরের জমিদার আগা সাদেক কৌশল ও চাতুর্যে তাঁর [মির হাবিবের] তুল্য ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন মির হাবিব। ত্রিপুরার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র নিজ রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাদশাহি রাজ্যে আগমন করেন এবং আগা সাদেকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তিনি এ ব্যাপারটিকে সৌভাগ্যজনক বলে মনে করেন। তাঁকে ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাধিকারী করবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মির হাবিব তাঁকে অভিযানের পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রদর্শনের ফলেই তাঁরা পথ, পাহাড়ি সব পথ, গিরিপথ ও নদী অতিক্রমের পথের সন্ধান পান। বাদশাহি ফৌজের আগমনের ব্যাপারে ত্রিপুরার রাজা অসতর্ক ও অনবহিত ছিলেন। বাদশাহি ফৌজের আগ্রাসন সহ্য করতে না পেরে তিনি পাহাড়ের চূড়ার দিকে পলায়ন করেন। ফলে রাজ্য মির হাবিবের অধিকারে চলে আসে। যুদ্ধে অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্য তাঁর হস্তগত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য বাদশাহি রাজ্যের অধিকারে আসে। মির হাবিব এ রাজ্য শাসনের বন্দোবস্ত করেন। সেখানে একটি থানা সৃষ্টি করে আগা সাদেককে সেখানকার ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। সাহায্যকারী রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি রাজার গদিতে বসান।

পঞ্চম অধ্যায়

রুস্তম জঙের ডাকাত দমনের বর্ণনা

একদল দস্যু ও খুনিদের অধিনায়ক গনি নামে এক ব্যক্তি ঢাকার আশপাশে বাস করত। সে (ঢাকার) অধিবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রুস্তম জং তাঁর সৈন্যদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে ছদ্মবেশে তার সন্ধানে তাদের প্রেরণ করেন। তারা গোপনে তার সন্ধান করতে থাকে। (সেনাবাহিনীর) এই লোকগুলো এবং তাদের উদ্দেশ্য কী, সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে পারেনি। তারা এই অপরাধীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বন্দী করে নবাবের কাছে নিয়ে আসে। নবাব তাকে ঢাকা চকবাজারের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। পরে গুপ্তচরগণ তার (গনি) ভাই শাকুরের সন্ধান লাভ করে তাকেও ধরে ফেলে। এভাবেই ডাকাতদল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

নির্ঘণ্ট

বাংলার নবাবি আমল সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে *মোজাফ্‌ফরনামা* এক অমূল্য তথ্যের আকর। নবাব আলিবর্দি খান, মির জাফর ও রাজা মোহনলালের পাশাপাশি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার দৈনন্দিন জীবন ও তাঁদের শাসনকালের অনুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছেন ইতিহাসবিদ করম আলি খান। তাঁর বর্ণনা অতীতকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই বইয়ের শেষে সংযোজিত আজাদ-আল-হোসায়নির 'নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খানি' রচনাটি নবাব সুজা-উদ-দীন খানের আমলে ত্রিপুরা অভিযানের বর্ণনার জন্য বিখ্যাত।

Prothoma

201510000001

TK. 350.00